উৎকর্ণ

‘জীবনের যাত্রাপথে যারা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, সাহিত্য রচনায়দিয়েছে প্রেরণা, অভিষিক্ত করেছে আনন্দ-রসধারায়, অথচ দাবি করেনি কিছু—তাদেরই কথা আজ স্মরণ করলাম।’

আজ এই ডায়েরিটা প্রথম আরম্ভ করলুম, জানিনে কতদিনে শেষ হবে, কিন্তু এইজন্যে আরম্ভকরলুম যে সবদিক থেকে আজকার দিনটি আমার জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। দুঃখের বিষয় এইযে এরকম দিন বেশি আসে না জীবনে। আমি এই ডায়েরিটা লিখব এমন ভাবে যে আমারমনের সকল গোপনীয় কথাই এতে থাকবে, কিছু চেপে রাখব না। কাজেই কথাগুলো সবলিখতে হবেই।

অনেককাল আগে, আজ প্রায় আঠারো বছর আগে এই দিনটিতে পুজোর ছুটি উপলক্ষে গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে বাড়ি গিয়েছিলুম, তখন নতুন বিয়ে হয়েচে, তার আগে কতকাল দেখা হয়নি। গিয়েছিলুম অবিশ্যি আগের দিন, কিন্তু দেখা হয়নি, বেশি রাত হয়ে গিয়েছিলবলে। আজই রাত্রে প্রথম দেখা হয়। সেই পুজোর সময়েই তার বাপের বাড়ি থেকে নিতে এলতাকে, আমরা পাঠিয়ে দিলুম, কিন্তু মাসখানেক পরে বাপের বাড়িতে সে মারা গেল।

সেই জন্যেই আজকার দিনটি আমার এত মনে আছে, থাকবে চিরকাল।

আর একটা ব্যাপার, যে জন্যে আজকাল দিনটি স্মরণীয়, সে হচ্ছে আজ বহুকাল পরে আমাদের দেশে বন্যার জলে নৌকো করে বেড়িয়ে এসেচি। আমার জ্ঞানে এমন বন্যা কখনোদেখিনি। কুঠির মাঠে সাঁতার-জল, সেখানকার বন-ঝোপের মাথাগুলো মাত্র জেগে আছে, যেখানে আর-বছর ব্যায়াম করতুম বিকেলে, যেখানে বসে কেলেকোঁড়ার ফুলের সুবাস উপভোগ করতুম, সে-সব জায়গা দিয়ে বড় বড় নৌকো চলেছে। আমি এমন কখনো দেখিনি, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতুম না হয়তো! ওবেলা আজ আমিন-দি, রামপদ, পিসিমা, জগো সবাই মিলে গাবতলার কাছে নৌকোতেও উঠে কুঠির মাঠ দিয়ে, বেলেডাঙানতিডাঙা হয়ে আবার বাঁশতলার ঘাটে ফিরে এলুম। ওরা চলে গেল ঘাটে নেমে বাড়িতে।আমি চালকীর জোলের মধ্যে ঢুকে জোলের ঘাটে নৌকো থেকে নামলুম।

গাবতলা! যেখান থেকে নৌকোয় উঠবার কল্পনা স্বপ্নেও কখনো করতে পারা যেত না।

তারপর বৈকালে খুকুর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম আজ চার মাস পরে। সে কি আনন্দযাবার সময়ে! কত গল্প এই চার মাসে জমা হয়ে রয়েচে, ওকে সেসব গল্প করতে হবে।প্রথমে খুড়িমা এলেন, তারপরখুকুএল। তাকে বই কাপড়সুপুরিগুলো দিলুম, পেয়ে খুব খুশি।শ্রাবণ মাস থেকে সুপুরিগুলো ওর জন্যে রেখে দিয়েচি বাক্সের মধ্যে, দিল্লির বেশ ভাল মশলামাখানো সুগন্ধী সুপুরি-কুচোনো। অনেক গল্প-গুজব হল সন্ধ্যা পর্যন্ত। ওরা বারাকপুর যাবেপুজোর পরেই।

আমাদের বাসায় ঢুকবার জো নেই। ভেলা করে গিয়ে খোকা বাসার চাবি খুলে মশারি বার করে নিয়ে এল। কারণ পুজোতে বাইরে বেড়াতে গেলেই মশারি লাগবে।

তারাভরা অন্ধকার আকাশের নীচে রাত্রের Non-stop ট্রেনটা ছুটে এল। আমি বসে বসেআজ সারাদিনের কথাটা ভাবছিলুম। সকালে সেই কানু মোড়লের তামাক খাওয়ানো ডেকে, দারিঘাটার পুলের নীচে বন্যার জলের স্রোত, হরিপদদার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদপ্রাপ্তি গ্রামে ঢুকেই, জলে বেড়াতে যাওয়া চালকী, খুকুর সঙ্গে দেখা—এই সব।

এখন রাত ১২টা। বসে ডায়েরিটা লিখচি। শিলং বেড়াতে যাব বলে গোছগাছ করতেবড় ব্যস্ত আছি। ক'মাস ধরে কি ছুটোছুটিটাই করে বেড়াচ্চি কলকাতায়। এখানে মিটিং, ওখানেengagement, এখানে পার্টি, হয়তো আসলে দেখচি যে টাকাকড়ি নিতান্ত মন্দ আসচে না, কিন্তু অনুভূতির বৈচিত্র্য ও গভীরতা ওখানে কৈ? উত্তেজনা থাকে বটে কিন্তু সত্যিকার আনন্দ নেই। এই যে শেষ শরতের অপূর্ব রূপ এবার—এমন রূপ দেখতেই পেলুম না, গাছপালার নবীন সরসতা উপভোগ করতেই পেলুম না কলকাতায় এই হৈ-চৈ গণ্ডগোলপূর্ণ জীবনেরজন্যে। তাই কাল সারাদিন এখানে ওখানে শত কাজ ও ব্যস্ততার পরে ফিরে এসে রাত্রে শুয়েভাবছিলুম এ হৈ-চৈ-এর সার্থকতা কি? আমার মনের একটা ব্যাপার আছে বরাবর লক্ষ্য করেদেখে এসেচি—সেটা মাটি ও গাছপালার সাহচর্যে বড় ভাল থাকে। সেখানে মন অন্য একরকমই থাকে, শহরে শত কর্মব্যস্ততার মধ্যে তা হয় না। আনন্দ পাইনে, আমোদ পাই। শান্তঅনুভূতি নেই, উত্তেজনার প্রাচুর্য আছে। অনেকে বলে—এই তো জীবন! পুতুপুতুমিন্‌মিনেজীবন আবার জীবন নাকি? এই রকমই তো চাই।

অভিজ্ঞতার দিক থেকে এ শহরের জীবনে অনেক কিছু পাবার ও নেবার আছে বটেস্বীকার করি, কিন্তু মনন ও ধ্যানের অবকাশ নেই। প্রকৃতির সঙ্গে যোগ না রাখলে হয়তো অপরের চলতে পারে, কিন্তু আমার তো একেবারেই চলে না।

কি করচি এসব করে? কার কি উপকার করচি? কারোরই না। আমার আগে কত লোকেএরকম হৈ-চৈ করে বেড়িয়ে গিয়েচে, কত মিটিং-এ সভাপতিত্ব করেচে, কতসাহিত্যসম্মেলনের পাণ্ডা হয়েচে, কত ব্যাঙ্কে কত চেক্ কেটেছে—কোথায় তারা আজ? কেচেনে আজ তাদের?

গভীর অনুভূতির আনন্দ জীবনে সার্থকতা আনে—অন্তত আমার। অপরের কথাজানিনে, কিন্তু আমি ওর চেয়ে বেশি আনন্দ কিছুতেই পাইনে। এত কোলাহলের মধ্যে থেকেবড় কোলাহল-প্রিয় হয়ে উঠেচি বটে, কিন্তু এ আমি সত্যিই ভালবাসিনে। আমার মন ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠচে একটুখানি নীল আকাশের জন্যে। শরতের বনভূমির, মটর লতার ফুল ওবনসিমের ঝোপের জন্যে, কার্তিকের প্রথমে গাছপালার, বনতারা ফুলের সে অপূর্ব সুগন্ধেরজন্যে।

কাল যখন আসাম মেলে বেরুতে যাব, তখন কলকাতায় এল ভয়ানক বৃষ্টি। একটা বুড়োরিক্‌শাওয়ালাকে বললুম, আমায় মীর্জাপুর স্ট্রীটে নিয়ে চল্। সে কালা ও বোবা। তাকে ধমকদিতে দিতে মেস পর্যন্ত নিয়ে এলুম, তারপর মালপত্র নিয়ে স্টেশনে আসতে আসতে তাররিক্‌শার চাকা গেল ভেঙে। তাকে দিলুম মাত্র দু'আনা। সে প্রতিবাদ না করে নীরবে চলে গেল। তার প্রতি এই নিষ্ঠুর ব্যবহার করে যে কতটা অন্যায় করলুম, তা বুঝলুম পরে। যত ভাল দৃশ্যদেখি ততই সকলের আগে আমার মনে পড়ে রিক্‌শাওয়ালার সেই করুণ মুখটা।

আসাম মেলে আসবার সময় দেখলুম আড়ংঘাটা ছাড়িয়ে রেলের দু'ধার বহুদূর পর্যন্তবন্যার জলে ডুবে আছে। ঠিক আমাদের দেশের মতো বন্যা এসেচে এখানেও, সর্বত্রই এবারবন্যা, এ পথে ১৯২২ সালের পরে আর কখনো আসিনি, এবং হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পার হইনি ১৯২১ সালের পরে। তিস্তা ব্রিজ পার হইনি ১৯০৬ সালের পরে আর কখনো। সেই এসেছিলুম বাবার সঙ্গে রংপুরে, তখন আমি আট-ন' বছরের বালক। কত জল তার পরে গঙ্গা দিয়ে বয়ে চলে গিয়েচে! (ইংরিজি ইডিয়মটি বড় লাগসই, ব্যবহার করবার প্রলোভন সংবরণ করতে পারলুমনা।)

লালমণির হাটে এলুম রাত তখন ১১টা। এখানে খুকুর খুড়তুতো ভাই থাকে, কিন্তু এতরাত্রে কে তার খোঁজ করে? বেজায় ভিড় ট্রেনে, তবুও শোবার একটু জায়গা পাওয়া গেল। গোপোঁকগঞ্জ স্টেশন, বাংলার সীমানা পার হয়ে আসামে পৌঁছুলাম। ভোর হল রঙ্গিয়া জংশনে।

নিম্ন আসামের ভূমি জলমগ্ন, নলখাগড়ার বনে পরিপূর্ণ। আমিনগাঁওতে কামাখ্যা দেবীরমন্দিরের পাণ্ডারা এসে জুটল। কোনো রকমে তাদের হাত এড়িয়ে পাণ্ডুঘাটে উঠলুম স্টিমারে।।তারপর মোটরে গৌহাটি হয়ে শিলং রওনা হলুম।

এ পথের বন-বনানী ও খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়ের দৃশ্য ভারি সুন্দর। এ পথের উপযুক্তবর্ণনা কেউ করেনি। শুধু মাইলের পর মাইল দু'ধারে উজ্জ্বল শৈলমালা, মধ্যে মধ্যে ঝরনা বা পার্বত্য নদী, নদীখাতে ঘন বন, কত বনফুল, কত বিচিত্র গাছপালা, মোটা মোটা লতা গাছে গাছে ঝুলছে, শেওলা জমেচে বড় বড় গাছের গায়ে, নিবিড় অন্ধকার বনানীর তলদেশেসত্যিকার ট্রপিক্যাল জঙ্গল। ছোটনাগপুর অঞ্চলের পাহাড় এর তুলনায়উচ্চতায় বা বনশোভায়কিছুই নয়। এরকম নিবিড় ট্রপিক্যাল বন সেখানে নেই, সম্ভবও নয়। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার, আমাদের কুঠীর মাঠের সেই ছোট এড়াঞ্চির বন এখানে পাহাড়ের সর্বত্র—অন্তত তিন হাজারফুট উঁচুতেও আমি ওই গাছের বন দেখেচি। আসামের পাহাড়েই কি ছোট এড়াঞ্চি গাছের আদিবাসস্থান?

বৈকালে সুপ্রভার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম লাবানে। পথে দেখি অবিকল সুপ্রভার মতোএকটি মেয়ে যাচ্ছে। ভাবলুম কে না কে! একটু পরে দেখি মেয়েটি পিছন ফিরে আমার দিকেবার বার চাইচে। তারপর সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, বলে উঠল—আপনি!

চেয়ে দেখি সুপ্রভা। সে বললে—ওবেলা মোটর নিয়ে স্টেশনে লোক পাঠিয়েছিলুমআপনার জন্যে—সে ফিরে এসে বল্লে, আপনি আসেননি। আসুন।

'সনৎ কুটিরে' ও থাকে। সেখানে বীণাও এল দেখা করতে। চা খেয়ে ওর সঙ্গে বেড়াতেবেরুই। সঙ্গে রইল তার ভাইপো। প্রথমে ক্রিনোলাইন ফলস্ দেখে ও বল্লে, চলুন Spread Eagle falls দেখিয়ে আনি। তাই দেখাতে গিয়ে ও পথ হারিয়ে ফেললে। কতদূর শহরেরবাইরে নিবিড় পাইনবনের দিকে বিজনপথে চলে গেল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেচে। পথে খাসিয়াদস্যুর ভয়। ওর মুখ দেখি শুকিয়ে গিয়েচে, যখন দেখা গেল সত্যিই ষন্ডামার্কা গোছের দুজনলোক অন্ধকারে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ও বল্লে—আমার ভয় করছে। কি বিপদ, ছেলেমানুষের কাণ্ড ! তবে বলেছিল কেন যে আমি জানি Spread Eagle falls এর পথ ?

যাই হোক, অবশেষে নিরাপদে শহরে পৌঁছে ট্যাক্সি করে ওকে লাবানে পৌঁছে দিয়েআমি হেঁটে হোটেলে ফিরি। কারণ ও ছেলেমানুষ, আর হাঁটতে পারবে না দেখলুম। শুধু আমায় দৃশ্যাবলী দেখাবার উৎসাহেই ও অতটা গিয়েছিল।

বড় ভাল লাগল এই বেড়ানো আজকার। জীবনে এ একটা স্মরণীয় দিন। যেন অন্য জগতে এসে গিয়েচি। শিলং-এর শোভা তো অদ্ভুত বটেই—তা ছাড়া সুপ্রভার মতো মমতাময়ীমেয়ের সাহচর্য ও সহানুভূতি ক'জন পায়?

হোটেলে এসেই কালকের সেই গরিব রিক্‌শাওয়ালার কথা মনে এসে দুঃখে চোখে জলএল। যদি আবার তার দেখা পাই, আমার নিষ্ঠুরতার প্রায়শ্চিত্ত করব। বাস্তবিকই অন্যায় হয়েগিয়েচে।

কিন্তু কী ভালই লেগেছে আজ সন্ধ্যায় বনফুল-ফোটা পাইনবনের পথে সুপ্রভার সঙ্গেবেড়ানোটা! আর কি সুন্দর দৃশ্য চারিধারে! এমন ঢেউখেলানো ঘন সবুজ শৈলশীর্ষ অন্য কোনো জায়গায় দেখিনি। ছোটনাগপুরের পাহাড়ের চেয়ে শিলং-এর পাহাড়রাজি অনেক বেশি সুন্দর। অনেকদিন আগে একবার ডায়েরিতে লিখেছিলুম যে, ছোটনাগপুরের পাহাড় আর বাংলাদেশের বনানী এই দুটোর একত্র সমাবেশ হয়েছে এমন কোনো জায়গা যদি থাকে, তবে তার সৌন্দর্যেরতুলনা হবে না। আমার একটি স্বপ্ন ছিল, ওই দুইয়ের একত্র সমাবেশ আছে এমন

একটা জায়গাদেখব। কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে পেছনের মেঘস্তূপগুলোকে পাহাড় কল্পনা করে কতবারনিজের সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এখানকার বনানী দেখে বুঝলুমস্বপ্নলোকের সন্ধান পেয়েচি। লতা, ঝোপ, জঙ্গল, নিবিড় undergrowth, পরগাছা, চঞ্চল উচ্ছল ঝরনাধারা, শিলাখণ্ড, বিরাট বনস্পতির দল, বড় বড় নদীখাত—সব রয়েচে এখানে, অনেক বেশি রয়েচে—আর কী বাঁশবন, পাহাড়ের সর্বত্র শুধুই বাঁশ—আর নতুন কোঁড়বেরুচ্ছে সোনার সড়কির মতো হেমন্তের প্রথমে—কি শোভা সে নবোদ্‌গত তরুণ বেণুদণ্ডের, কি তার ছায়া, কি তার শন্‌শন্‌ মর্মর ধ্বনি, বাংলার গাছগুলোর মতোই সেই স্নিগ্ধ হৈমন্তীসুঘ্রাণটি পথে পথে! অবিশ্যি তিন হাজার ফুটের ওপরে আর ও-প্রকৃতির ট্রপিক্যাল অরণ্য নেই, শুধুই পাইন আর পাইন।

সকালে উঠেচি, এমন খুব কিছু শীত নয়। বাংলাদেশের পৌষ মাসের শীত এর চেয়েও বেশি হয়। সুপ্রভাদের ওখানে যাব বলে বেরিয়েচি, দেখি সুপ্রভা ও আরো দুটি মেয়ে আসচে, পথে দেখা হল। একটি মেয়ে আসামী, নাম উষা ভট্টাচার্য, ফিলজফিতে এম-এ পাস করেছে।সে প্রথমে বললে—আসামী ভাষা ছাড়া সে জানে না। তার খানিকটা পরে বেশ বাংলা বলতেলাগল। পাইন মাউন্ট স্কুলের পথে আমরা উঠলুম একটা পাহাড়ের মাথায়—সেখানে একটাচমৎকার পাইনবন, ঘন, নির্জন। তারপর নেমে Kench-strasse দিয়ে সরীতলা বেড়াতেগেলুম। নির্জন পাইনবনে আমরা বসে রইলুম বহুক্ষণ। বিকেলে ওরা মোটর নিয়ে এল, সবাই মিলে Elephant falls-এ বেড়াতে গেলুম। নির্জন পাইনবনের মধ্যে দিয়ে পথ—gorge-টার ওপর একটা কাঠের পুল আছে। আমরা তার পাশের পাথরে কাটা সিঁড়ি ধরে ধাপে ধাপে নেমেগিয়ে একেবারে নীচে দাঁড়ালুম। কত বিচিত্র ফার্ন ও বন্যপুষ্প পাহাড়ের গায়ে দুধারে। খুব বৃষ্টিএল, আমি একটা পাথরের ছাদের তলায় দাঁড়ালুম। সুপ্রভারা কাঠের পুলটায় দাঁড়িয়েছিল, নেমে দেখতে এল আমি উঠছি না কেন? সবাই বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে মোটরে উঠলুম, তখন আবার বেশ রৌদ্র। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশের নীল ফুটে বেরিয়েচে। সনৎ কুটিরে এসে চা খেয়েআমি বেরুলুম লেক দেখতে। তারপর চেরাপুঞ্জি যাবার জন্যে মোটর-স্টেশনে গেলুম। আসবার পথে ইউনিভার্সিটি থেকে যে ছাত্রদের দল এসেচে, তাদের ওখানে গিয়ে গল্প করলুম।

আপার-শিলং-এর যে পথে আজ এলিফ্যান্ট ফল্‌স-এ গেলুম—সেটি বড় সুন্দর জায়গা।মাঝে মাঝে খুব নীচে পাইনবনে আচ্ছন্ন অধিত্যকা—দূরে দূরে লাবান ও শিলং পাহাড়চূড়ায় ঘনকালো মেঘের কুণ্ডলী—এই রোদ, এই মেঘ, আবার এই রোদ। ছোটনাগপুরের পাহাড়ের মতোছোটখাটো ব্যাপার তো নয় এ, খাসিয়া ও জয়ন্তী শৈলমালার কূলকিনারা পাওয়া যায় না একটাছোট জায়গা থেকে। এর কতদিকে যে কতদেখবার জিনিস আছে, যা তিন দিনের মধ্যে শেষ করা অসম্ভব। তবে জায়গাটা বড় মেঘলা, বৃষ্টি লেগেই আছে, রোদের মুখ ক্বচিৎ দেখা যায়।এত ভিজে জায়গা আমার পছন্দ হয় না। শুকনো খটখটে, নীরস জায়গা আমি বেশি পছন্দ করি, শিলং একটা ভিজে স্যাঁতসেঁতে ব্যাপার। একঘেয়ে পাইনবনও আমার ভাল লাগে না। এইজন্যে গৌহাটি থেকে শিলং-এর পথে আড়াই হাজার ফুট নীচেকার নিবিড় বনানীর সৌন্দর্য যেমন অদ্ভুত মনে হয়েছিল, এখানকার rolling downs-এর মরকত-শ্যামরূপ তত ভাল লাগে না।আর সব জায়গাতেইমাটি আর কাদা, কোথাও বসা যায় না, ভিজে—একখানা বসবার পাথরনেই কোথাও। ছোটনাগপুর অঞ্চলের মতো যেখানে-সেখানে শিলাখণ্ড ছড়ানো নেই, অনাবৃতপ্রস্তরময় শৈলগাত্র ক্বচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। তবে এত ঝরনা, এত বন্যপুষ্প সেখানেকোথায় ? শিলং শহর অতি সুন্দর, ছবির মতো সাদা সাদা বাড়িগুলো পাহাড়ের গায়ে ধাপেধাপে সাজানো। Kench-strasse-এ ধনী ও শৌখিন বাঙালিদের বাস—বেশ চমৎকারসাজানো বাগান সেদিকে। প্রায় সকলের বাড়িতেই ফুলবাগান। গোলাপ, ডালিয়া, কসমস, ফর্গেট-মি-নট এসময়ে প্রচুর। বন্যজঙ্গলের মধ্যে এক ধরনের Compositae প্রায় পাইনবনেরনীচে সর্বত্র। আর এক রকমের lichen-আমি তার নাম দিয়েছি bird's feather lichen—গাছের ডাল থেকে টুপটুপ করে ঝরে পড়চে। এলিফ্যান্ট ফল্‌স যাবার পথে সুপ্রভা একরকমবনের ফল তুলে খাচ্ছিল, আমাকেও খেতে দিলে—রাঙা, ছোট ছোট, যেন কুঁচফলেরমতো—খেতে টক। ও ফল আবার খাসিয়া মেয়েরা বাজারে বিক্রি করছে। ও বাজে ফল

যে কে পয়সা দিয়ে কিনে খায়! খাসিয়া মেয়েরা দেখতে বেশ, এক-একটা এত সুন্দর ও এমন চমৎকারতাদের মুখশ্রী! ওবেলা 'সনৎ কুটির' যাওয়ার পথে একটি মেয়ে দেখেছিলুম, সে একেবারেপরীর মতো সুন্দরী।

এত ব্যাপার সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে যে শিলং শহর আমার ভাল লাগেনি। সে প্রাণনাচানোসৌন্দর্য, বিরাট রুক্ষ রূপ নেই এখানকার প্রকৃতির—যা দেখেচি নাগপুরের রামটেক পাহাড়ে, Highland drive-এ বা নীলঝরনার ছোট্ট পাহাড়ে বা সিদ্ধেশ্বর ডুংরীতে। এ বড় বেশিসাজানো—বেশি পুতুপুতু, সাজগোজ পরানো আহ্লাদী পুতুল। দেখতে চমৎকার কিন্তু মনে কোনো বড় ভাব জাগায় না।

একথা কিন্তু খাসিয়া পাহাড়ের lower elevation-এর পক্ষে খাটে না—সেখানে যা দেখে এসেচি, তার তুলনা নেই—আমি এখন বলচি শুধু শিলং শহর ও আপার শিলং-এরকথা। আমি যা ভালবাসি, প্রকৃতির সে বর্বর বন্যরূপ এখানে নেই—ওই যে বললুম, বেশসাজানো-গোজানো আহ্লাদী পুতুলটি! পাইনবন অবিশ্যি খুব চমৎকার বটে, কিন্তু রোমান্টিকবৈচিত্র্য নেই ট্রপিক্যাল বনের মতো। কিন্তু lower elevation-এ এক জায়গা থেকে স্যারজোসেফ হুকার দু'হাজার নানা শ্রেণীর গাছপালা সংগ্রহ করেছিলেন। শিলংকে রেলওয়ে বিজ্ঞাপনীতে 'প্রাচ্যদেশের স্কটল্যান্ড' বলে কেন জানিনে—এই যদি স্কটল্যান্ড হয়, তবেস্কটল্যান্ডের ওপরে আমার শ্রদ্ধা কমে গেল।

অথচ যে কেউ শিলং আসবে, সবাই বলবে—উঃ, কি চমৎকার জায়গা মশাই শিলং!একজন যা বলে, সবাই তার ধুয়ো ধরে। এগুলোর চোখ নেই নাকি? এই ভিজে স্যাঁতসেঁতেএকঘেয়ে পাইনবন তাদের ভাল লাগে? কি ভিজে, 'rain, rain, go to spain'—নীচে নেমেচল মন, শিলং মাথায় থাকুক, বাংলার সমতল জমিতে নেমে রোদের মুখ দেখে বাঁচি।

একটা পাহাড়ের মাথায় প্রস্তরখণ্ডে বসে লিখচি। চারিধারে সোনালী কী ফুল ফুটে আছে, দূরে সমুদ্রের মতো সিলেটের সমতলভূমি দেখা যাচ্ছে। কি সুন্দর পথ! শিলংটা যেমন বাজে, চেরাপুঞ্জি একেবারে স্বর্গ। শিলং থেকে চেরাপুঞ্জির পথের তুলনা দেব আমার পক্ষে তা সম্ভবনয়, কারণ আমি এ ধরনের ল্যান্ডস্কেপ কখনো দেখিনি। যাঁরা বিলেত বা আয়র্লন্ডের ঢেউখেলানো সবুজ ঘাসের মাঠ দেখেচেন, তাঁরা হয়তো বলবেন এর দৃশ্য surrey downs-এরমতো, আয়র্লন্ডের পল্লী অঞ্চলের মতো। গৌহাটি থেকে শিলং রোডে যা দেখে এসেচি, তাথেকে এর দৃশ্য সম্পূর্ণ পৃথক। বড় বড় চুনাপাথরের শিলাখণ্ড সর্বত্র ছড়ানো—উঁচু-নিচুশৈলমালা সর্বত্র। যেদিকে চোখ যায়—কত ধরনের বিচিত্র বন্যপুষ্প মাঠের মধ্যে। শিলাস্তূপের ধারে ধারে দূরে দু-চারটে সঙ্গীহারা গাছ হয়তো ধূ-ধূ প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়িয়ে। শিলং-এর সেইলাল ফুলটা compositae, বন্যমল্লিকা জাতীয় একরকম ফুল। করবীফুলের মতো কিফুল—আরো কত কি ধরনের ফুল। চেরাপুঞ্জি থেকে মুশমাই-এর পথে যে জঙ্গল আছে, দেখায় ঠিক যেন লিচুগাছের বাগানের মতো—অথচ তাদের ডালে ডালে পরগাছা ও অর্কিডে ভরা—তলায় নিবিড় undergrowth-অদ্ভুত ধরনের বন। এক এক জায়গায় চুনা পাথরের শৈলসানু ও নদীখাতের বিশাল ঢালু সম্পূর্ণরূপে বন্যপুষ্পে ভরা—কত ধরনের যে ফুল, তাইগুনে সংখ্যা করা যায় না। পাইনবন এদিকে একেবারেই নেই। চেরাবাজারে গাড়িতে বসেলিখচি—সামনে নদীর বিরাট gorge-টা মেঘ ও কুয়াসায় ভরে গিয়েচে, তার ধারে নিবিড় বন।গাড়ি ছাড়ল—এত জোরেও গাড়ি চালায় খাসিয়া ড্রাইভারগুলো! উঁচু-নীচু শুকনো খটখটেরাস্তা দিয়ে তীরবেগে গাড়ি ছুটচে, একদিকে উজ্জ্বল পর্বতচূড়া, বনফুলে ভরা শৈলসানু, অন্যদিকে নদীর বিরাট খাত, কুয়াসা ও মেঘ আটকে রয়েছে। তাতে আবার রামধনুর সৃষ্টিকরেছে। এক এক জায়গায় ঘন বন, যেন লিচু বাগানের মতো দেখতে। অথচ মধ্যে ঘন অন্ধকার, শাখাপত্রে নিবিড়, ডালে ডালে অর্কিড, নীচে undergrowth ওয়ালা বন—এ অঞ্চলের কীএকটা গাছও চিনিনে! আসামের বন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, না ফার্ন, না compositae, না প্রাইমূলা, নামল্লিকা-করবীর মতো ফুলগুলো—কিছুই কি বাংলাদেশের মতো নয় ? ঊনবিংশ মাইল থেকে বড় নদীখাতটা শুরু হল, প্রায় ৮/১০ মাইল মোটর-রোডের

সমান্তরাল চলেচে, তবে কুয়াসায় আবৃত বলে ভাল দেখা গেল না। অপর পারের সানুদেশে নিবিড় Temperate forest, ফার্নআর শেওলা, থুজা আর প্রাইমূলা অজস্র। যার অভাবে শিলং ভাল লাগছিল না—তা পেলুমআজ চেরার পথে। এত বেশি পরিমাণে পেলুম যে আর আমার কোনো অভিযোগ নেই শিলং-এর বিরুদ্ধে। এ এক স্বপ্নলোক আবিষ্কার করেচি চেরার পথে, যে স্বপ্নলোক পাথরে, বনে, ফুলে, মেঘে, ধূ-ধূ নির্জনতায়, বিরাটত্বে, অভিনবত্বে বিচিত্র। যেখানে আজ মুশমাই গ্রামেচেরা মালভূমির প্রান্তে শিলাখণ্ডে বসে লিখছিলুম, সে সৌন্দর্যের তুলনা আছে? ওই তো আমারচিরকালের স্বপ্নের সার্থকতা!

শিলং ফিরে দেখি সুপ্রভা নেই মোটর-স্টেশনে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলুম, তারপর লাবান চলে গেলুম। একটা কথা লিখতে ভুলেচি। বড়বাজারের কাছে যখন বাস থেমেছে, দুটিসাহেবের ছেলে এসে মোটরে উঠল, কি চমৎকার চেহারা দুটির। বড়টির সঙ্গে আলাপ হল, বেশ লাজুক, কোনো ইংরেজ বালকদের মতো উগ্র নয়। বললে তার মা খাসিয়া মেয়ে।মোটর-স্টেশনে সুপ্রভাদের জন্যে অপেক্ষা করে লাবানে গেলুম। ওরা মোটর যোগাড় করতেপারেনি বলে আসতে পারেনি। সেখানে চা খেয়ে বীণা ও সুপ্রভার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। বীণা একটা ফুলের তোড়া দিলে, চমৎকার সাদা গোলাপ ফুলের তোড়াটি। কাল যাওয়ার কথাবার্তা হল, সাড়ে আড়টার সময় গাড়ি আসবে আমার হোটেলে। একখানা ট্যাক্সিপাওয়া গিয়েচে, তিনজনে যাব আমরা। ও বল্লে, কমলা নেব অনেক করে সঙ্গে, গাড়িতে বড়মাথা ঘোরে।

বৃষ্টি নামল সামান্য। আমি হোটেলে ফিরলুম। রাত সাড়ে সাতটা।

কাল সকালে শিলংয়ের ওয়ার্ড লেকে বেড়াতে গেলুম, চারিধারে পাইনবনের সারি, দূরেলাবান হিলের চূড়া, লেকের ধারে শিশির-সিক্ত নানা গাছপালা—বেশ ভাল লাগল শিলংশহরটিকে। কিন্তু সময় নেই, তাড়াতাড়ি করে নিতে হবে—সাড়ে আটটাতে সুপ্রভাদের গাড়িআসবে, কাজেই রেণুর চিঠিখানা ডাকে ফেলে দিয়েই হোটেলে এসে স্নানাহার করে নিয়ে তৈরি হয়ে বসে রইলুম। খানিক পরে সুপ্রভার ভাই শান্তি এসে বললে—এ কি, আপনি রয়েচেন যে! আমি তো অবাক, রয়েচেন মানে কি? গাড়ি কোথায়? শান্তি বল্লে—গাড়ি তো আপনার এখানেএসেচিল, আপনাকে না পেয়ে চলে গেল! শুনলুম হোটেলের ম্যানেজার ভুল করে বলেদিয়েচে যে, আমি ট্যাক্সি আসার দেরি দেখে বাসে সিলেট রওনা হয়েচি, কাজেই ওরা চলেগিয়েচে।

কি বিশ্রী ব্যাপার! রাগে-দুঃখে তো আমার চোখে জল এল। আমি হাঁ করে বসে আছিসকাল থেকে সেজেগুজে গাড়ির জন্যে—আর হোটেলের ম্যানেজারটা না জেনেশুনে বলেদিলে আমি সিলেট চলে গিয়েচি?...

তখনি একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে প্রথম টোল গেটে রওনা হলুম—মাত্র ৩২ মিনিট সময়হাতে আছে, এই ৩২ মিনিটের মধ্যে ১৪ মাইল গিয়ে নঙ্‌মাল্‌কি গেটে ওদের গাড়ি ধরিয়েদিতে হবে। গাড়ি ছুটল তীরবেগে—Upper Shillong-এর রাস্তা দিয়ে। মোড়ের মাথায় আমি থামতে দিইনে। ডাইভার বলে, গাড়ি উল্টে যাবে বাবু। বাঁকের মুখে দশ মাইলের বেশি চালাবার উপায় নেই, তাতে খালি গাড়ি! এলিফ্যান্টা ফল্‌স-এর কাছে যখন এলুম, তখন ড্রাইভার বল্লে, ভরসা করছি বাবু, ধরিয়ে দিতে পারব।

চালাও চালাও, আরো জোর দাও! ত্রিশ কেন, চল্লিশ করো না! আর কতটা? শুধুইউঁচু-নীচ, বাঁকা আর বাঁকা, খাদের মতো রাস্তা চলেছে পাহাড়ের গায়ে। জোর দেয় বা কি করে? নঙ্‌মাল্‌কি গেট দূর থেকে দেখা গেল। দু'খানা বাস আর একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরাপৌঁছুতে না পৌঁছুতেই ট্যাক্সিখানা ছেড়ে ঠিক সিলেটের পথে গিয়ে উঠল বাঁদিকে। আমি ছুটে গিয়ে ট্যাক্সি থামালুম, দেখি তাতে এক সাহেব আর মেম। খবর নিয়ে জানলুম আর একখানাসাদা ট্যাক্সিতে দুটি বাঙালি মহিলা ও এক ভদ্রলোক কিছু আগে চলে গেলেন।

কি আর করি, নিরাশ হয়ে ফিরলুম। শিলং পোস্টঅফিসের কাছে দেখি কান্তি দাঁড়িয়ে পথে, তাকে গাড়িতে উঠিয়ে নিলুম। সে বল্লে—একটায় সিলেটের ডাক-ভ্যান ছাড়ে, তাতেলোকও নেয়। আমার মন বেজায় খারাপ,

শিলং-এ থাকতে একটুও ইচ্ছে নেই, কান্তিকে সঙ্গেনিয়ে মেল-ভ্যানে টিকিট বুক করে এলুম। পথে সুপ্রভার সেই দাদা মোটরে যাচ্ছিলেন, আমায় দেখে বল্লেন—কি, আপনি যাননি ? এখানে যে?

আমি সব বল্লুম। সুপ্রভার বুদ্ধির নিন্দাও করলুম। তিনি বল্লেন—তার কোনো দোষ নেই।আমিও ছিলুম তখন, আপনার হোটেলে গিয়ে দশ মিনিট আমরা গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে।হোটেলের ম্যানেজার বল্লে—গাড়ি না আসাতে আপনি মোটরবাসেই সিলেট চলে গিয়েছেন। পুঁটুর মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল তাই শুনে। সে খুব দুঃখিত হয়েছে মনে হল।

কি আর করব, যা হবার তা হয়েচে। এতদিন থেকে ঠিক করে আসচি যে সিলেটের পথ দিয়ে সুপ্রভার সঙ্গে যাব, তা উভয় পক্ষের সামান্য বুদ্ধির দোষে ঘটল না।

একটার সময় বাস ছাড়ল। নঙ্‌মাল্‌কি গেটে আমি টাইমকিপারের কাছে জিজ্ঞেস করে জানলুম ওবেলা সুপ্রভাদের ট্যাক্সিখানা ৮-৪২ মিনিটে গেট পার হয়েচে, আর আমি এসেচি ৮-৫২ মিনিটে। ঠিক দশ মিনিট আগে গিয়েচে ওরা।

সিলেটের পথ অপূর্ব। বেশ বিপজ্জনকও বটে, ডাইনে বাঁয়ে বিরাট বিরাট gorge —তায় ঢালু নিবিড় বনে চাপা। ট্রিফার্ন আর কত ধরনের গাছ, কত কি ফুল!চেরাপুঞ্জির পথেরসে gorgeটা এদের তুলনায় কিছু না। কুয়াসা করে আছে gorge-এর মধ্যে, যেন ওর মধ্যে কেউ কাঠখড়ে আগুন দিয়েচে, সাদা ধোঁয়া উঠচে। ডাইনে খাড়া উত্তুঙ্গ পাহাড়ের দেওয়াল, মধ্যেসরু পথ, বাঁয়ে গভীর খাদ। খাদের দিকে জানলা দিয়ে চাইলে মাথা ঘুরে ওঠে, নীচু পর্যন্ত দেখাযায় না। ঢালুতে কত রকমের গাছপালার নিবিড় বন। চেরাপুঞ্জির সেই সব ফুল, আরো সংখ্যায়বেশি। খাসিয়া ড্রাইভার প্রাণের মায়া রাখে না। সেই পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় বেজায় আঁকা-বাঁকাউঁচু-নীচু সংকীর্ণ পথে তীরবেগে গাড়ি ছুটিয়েচে—যদি স্টিয়ারিং একটু বেগড়ায়, কি গাড়ি স্কিডকরে—তবে একেবারে ২০০০ ফুট নীচে পড়ে গাড়িসুদ্ধ চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে।

পাইউম্‌শ্লে গেটে দু'দিকের গাড়ি একত্র না হলে মোটর ছাড়ে না। এদিক থেকেশিলং-এর, ওদিক থেকে সিলেটের বহু বাস ও প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে। নেমে বেড়ালুম, দূরেসিলেটের সমতলভূমি মেঘের মতো দেখা যাচ্ছে। আমি কেবলই ভাবচি—কয়েক ঘণ্টা মাত্র আগে সুপ্রভা এইখান দিয়ে চলে গিয়েচে—এখন যদি সে থাকত, দুজনে কত গল্প করতুম। সত্যি, সারা পথটাতে যখনই সৌন্দর্যের অপূর্বতায় বিস্মিত, মুগ্ধ হয়েচি, তখনই ওর কথাআমার মনে হয়েছে। হর্ষবিষাদে ছুটেছে আজকের গোটা অপরাহ্ণটির এ বিচিত্র যাত্রাপথ।পাইউম্‌শ্লে ছাড়িয়েও কত gorge—নংটু বলে একটা জায়গা, কয়েক মাইল মাত্র আগে একটাসুগভীর নদীখাত, তার মধ্যে কি নিবিড় অরণ্যানী, চেয়ে দেখলুম, অত নীচে তো নজর হয় না, তবুও যতটা দেখলুম, নিবিড় কালো অন্ধকার হয়ে রয়েচে ভেতরটা। শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে নদী বয়ে যাচ্চে সেই ট্রিফার্ন শোভিত নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে। নংটু থেকে পথ অনেক নেমেগেল, গাছপালার শোভা আরম্ভ হল, সত্যিকার বন যাকে বলে তা আরম্ভ হল। সে বনের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। আমি কখনো সে-ধরনের নিবিড় বন দেখিনি। সে বন অন্ধকারে নিবিড়, দুষ্প্রবেশ্য, আর্দ্র, কত কি বিচিত্র গাছপালায় ভরা। আসামের এদিকের একটা গাছও আমারপরিচিত নয়। জংলা কলা, সুপুরি, Cycades, বাঁশ, পাম্‌ এসব আছে। ফুলই বা কত রকমের!বড় বড় পার্বত্য ঝরনা শিখরদেশ থেকে নীচে সবেগে নামচে। আর এখন লিখব না, টেপাখোলাতে স্টিমার এল, এর পরেই গোয়ালন্দ, জিনিসপত্র গোছাতে হবে।)

কলকাতায় বসে সেই পথের কথাই মনে পড়চে।

সেই অপূর্ব পথের সৌন্দর্যের মধ্যে বসে সারাক্ষণ কেবল ভেবেচি—আহা সুপ্রভা যদিথাকত, তবেই এটা দেখাতুম, ওটা বলতুম, আহা সে নেই, কাকেই বা বলি? আমার পাশে যেকয়েকটি লোক বসে—সবাই লাট-দপ্তরের

কেরানী, ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছে—তারা বসে ঢুলচে, নয়তো গল্প করছে অবিশ্রান্ত, দুজনে বমি করতে শুরু করে দিলে, কেউ চেয়েও দেখচে না সেইবিরাট gorgeগুলোর সৌন্দর্য, তার উদ্ভিজ্জ-সংস্থানের বৈচিত্র্য, কত ট্রিফার্ন, কত কি বিচিত্রবনফুল, কত ঝরনা, মেঘ উঠছে gorge থেকে, গভীর খাতের নিম্নতল থেকে ওপর পাহাড় পর্যন্ত বহু zone-এ বিভক্ত উদ্ভিজ্জ-সংস্থানের বৈজ্ঞানিক রূপ, কি বিপজ্জনক সংকীর্ণ রাস্তাপাহাড়ের উপর; কি রূপ সারাপথের। নংটু থেকে ডাওকি পর্যন্ত সে কি নিবিড় ট্রপিক্যালঅরণ্যানী গভীর gorge-এর তলদেশ কালো অন্ধকারের মধ্যে, কত জংলী ফল, Cycawers, ফার্ন, আর ফুল, ফুল, ফুল—পাহাড়ের সানুদেশ আলো করে রেখেচে সেই লালফুলটাতে—সুপ্রভা বলেছিল যেটা সিলেটের সমতলভূমিতেও দেখা যায়—দশ-বারোটা বিভিন্নশ্রেণীর ফুল গুনেচি, বড় বড় লতা, পরগাছা, অনেক নীচে ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী বয়ে চলেচে শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে, সেই ট্রিফার্ন-শোভিত নিবিড় বনের মধ্যে। সত্যিকার ট্রপিক্যাল প্রকৃতিরঅরণ্যানী এই প্রথম দেখলাম ডাওকির পথে।

ডাওকিতে যখন মোটর পৌঁছল তখন অস্তদিগন্তের আভায় পর্বত ও অরণ্যানীর শীর্ষদেশরাঙা হয়ে উঠেচে—নিস্তব্ধ চারিদিক। মধ্যে নীচু উপত্যকায় ঘন ছায়া নেমেচে, গাছপালার সুগন্ধবেরুচ্চে, যেমন হেমন্তের অপরাহ্ণে আমাদের দেশে বেরোয়। সুন্দর জায়গাটা। দু-একটাডাকবাংলা আছে টিলার মাথায়। সম্ভবত অস্বাস্থ্যকর স্থান, পাহাড়ের নিম্নসানুতে সাধারণতযেমন হয়ে থাকে। এখানে চা খেয়ে নিলুম, তারপরে আবার মোটর ছুটল—শৈলমালা চলেচেমোটর রোডের সমান্তরাল ভাবে বাঁদিকে, অনেকগুলো ঝরনা নেমে আসচে পাহাড় থেকে নিম্ন বনানীর মাথার ওপর, দুধারে ছোটখাটো জঙ্গল আর জলাভূমি, বড় বড় নলখাগড়ার বন। মোটর ছুটেচে তীরবেগে, হু-হু হাওয়া বাধচে বুকে, তৃতীয়ার একফালি চাঁদ উঠেছে সামনেরআকাশে। সন্ধ্যার অন্ধকারেই জয়ন্তীপুর বলে একটা গ্রামের ডাকঘর থেকে ডাক তুলে নেওয়ার জন্যে গাড়ি সেখানে দাঁড়াল। সাড়ে সাতটায় সিলেট টাউনে এল। টাউনটা আমার ভাল লাগলনা —Reed huts আর টিনের ঘর, সিনেমা—বেতের ও বাঁশের আসবাব বিক্রি হচ্ছে দোকানে। সময় খুব অল্পই ছিল, সুরমা নদীতে খেয়া পার হয়ে স্টেশনে এসে গাড়িতে চড়লুম। কি ভিড় গাড়িতে, আজই সব আপিস-আদালত বন্ধ হয়েচে, সব লোক ছুটেচে বাড়ি, পা রাখবার জায়গা নেই। কুলাউড়াতে আসবার পর কুলাউড়া আর শ্রীমঙ্গলের মধ্যে অনেক ছোট ছোটপাহাড় আর ঘন জঙ্গল, চা-বাগানও নীচে আছে, কিন্তু অন্ধকারে কোন্‌টা চা-বাগান আরকোনটা জঙ্গল এ বোঝা বড়ই শক্ত। কুমিল্লাতে একদল ছেলে উঠল, তারা ময়নামতী সার্ভে স্কুলের ছাত্র, ছুটিতে বাড়ি চলেচে। ঘুম পেল না গাড়িতে, যদিও জায়গা যথেষ্ট ছিল। চাঁদপুরের স্টিমারে পানীয় জলের ট্যাঙ্কের ওপর বসে বেলা একটা পর্যন্ত কাটালুম। ডেকে পা রাখবারজায়গা নেই, সর্বত্র লোকে বিছানা পেতে শুয়ে বসে আছে। পদ্মাবক্ষে কাটল প্রায় এগারো ঘণ্টা। ভাগ্যকুলে কিছু খাবার কিনে খাই। গোয়ালন্দে থামবার আগে সে কি ভীষণ বৃষ্টি আরঝড়! তাতেই স্টিমার দেরি করে ফেললে আসতে। চাটগাঁ মেলে চড়ে বসে ভাবলুম এ তোবাড়ি এসেচি, আমাদের রাণাঘাট দিয়ে যে ট্রেন চলে সে তো বাড়িরই সামিল।

দীর্ঘ ভ্রমণ শেষ হল। খুব দীর্ঘ হয়তো নয়, কিন্তু দীর্ঘটা relative term আমার কাছে এই ভ্রমণই খুব দীর্ঘ বটে। তা ছাড়া সুপ্রভাকে কতদিন দেখিনি, ওর আদর-যত্নে এবারকার ভ্রমণের স্মৃতি মধুর হয়ে থাকবে চিরকাল।

ওখান থেকে ফিরে নলহাটি এসেচি কাল রাত্রে। রেল কোম্পানি জায়গাটা ভাল বলে যতই বিজ্ঞাপন দিক, আসলে জায়গাটা ভাল নয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে তো কিছুই না—শুধু ধানের ক্ষেত চারিধারে, একটু ভাঙা আছে, এখানকার লোকে বলে 'পাহাড়'—আমারমনে হয় সেটা একটা কাঁকর ও রাঙা মাটির ঢিবি। বৈকালের পড়ন্ত ছায়ায় দূর-প্রসারিত শ্যামলধানক্ষেত্রের শোভা দেখা গেল ডাঙাটার ওপর থেকে, কিন্তু এই পর্যন্ত, ওর বেশি আর কিছুনেই এখানে। জগধারী বলে একটা গ্রাম আছে দু'মাইল দূরে, ব্রাহ্মণী নদীর ধারে। সেখানেগুরুপদ সিংহের বাড়ি আমাদের নিমন্ত্রণ হল। বীরভূমের এ অঞ্চলের ঘর-বাড়ির গড়ন আমাদের চোখে ভাল লাগে না। গৃহ-নির্মাণের শ্রী-ছাঁদ নেই, সৌষ্ঠব নেই, চেরাপুঞ্জিতে খাসিয়াদের পাথরের বাড়িগুলোতেও যে রুচিজ্ঞানের পরিচয় পেয়েচি, এই সভ্য বাংলাদেশেতার নিতান্তই অভাব চোখে পড়ল। জগধারী গ্রামে এক ব্রাহ্মণবাড়ি দেখলুম পটে

দুর্গাপূজাহচ্চে। সেকালের একখানা মহিষমর্দিনী দুর্গাদেবীর পট টাঙানো, পেছনে রাঙাপাড় কাপড় পরাআগাগোড়া ঘেরাটোপে ঢাকা কলা-বউ, পূজার উপকরণ যথেষ্টই, মূর্তি নির্মাণ করলে যেমন হয়তেমনি। আমরা নদীতে স্নান করলুম, হাঁটু পর্যন্ত জল, কোনো রকমে শুয়ে স্নান করা গেল।কাছেই একটা মঠ আছে, সেখানে গিয়ে গুরুপূজার বিধি আছে দেখে এবং একটা মোটা লোকের ফটোগ্রাফের গলায় ফুলের মালা কৌশলে পরিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে পুজো হচ্ছে দেখে চটে গেলুম এবং তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করলুম। নর-পূজা আমার ভাল লাগে না, আমার ধাতে ও বরদাস্ত হয় না।

মুড়াগাছায় গিয়েছিলুম একটা লাইব্রেরির বার্ষিক উৎসবে। লোহারাম মুখুয্যে ওখানকারজমিদার, তাদের বাড়িতে থাকবার জায়গা দিলে। বেশ লোক ওরা, কি খাতির যত্নটাই করলে! ওদের বাড়ির একটা ছেলে বিলেত-ফেরত, হিসেব শিখতে গিয়েছিল, দেখতে বেশ সুশ্রী, বসেবসে অনেক রাত পর্যন্ত স্পেনের গল্প করলে। সকালে উঠে গ্রামের মধ্যে বেড়িয়ে এলুম—আমাদের দেশের কত গাছপালা, খুব বড় বড় বাড়ি গ্রামের মধ্যে, বড় বড় সেকেলেপুজোর দালান, যেন দিল্লির মতি মসজিদ কি দেওয়ান-ই-আমের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। পুজোর দালানের এই স্থাপত্যটা মুসলমান তথা মুঘল স্থাপত্যের অনুকরণ, ও বিষয়ে কোনো ভুল নেই।হিন্দু স্থাপত্য যে এটা নয়, ভুবনেশ্বরের মন্দিরের, কোনারকের সূর্য মন্দিরের গঠনরীতি দেখলেতা বোঝা যাবে। কাছেই ধর্মদহ গ্রামে বাবা ছেলেবেলায় কথকতা করতে এসেছিলেন, সে কথা মনে পড়ল স্কুলের মাঠে বেড়াতে গিয়ে। বৈকালে অল্পক্ষণই মিটিং-এ ছিলুম, তারপর পরিপূর্ণজ্যোৎস্না-রাত্রে ট্রেনে উঠলুম—দু'বার বন্যার জলে ভেসে গিয়েচে, এখানকারও অবস্থাআমাদের দেশের মতোই। ক'দিন কেবলই ট্রেনে বেড়াচ্ছি, ১৩ই অক্টোবর শুরু হয়েছে, আর আজ ২৮শে—এই ১৫ দিনের মধ্যে কত জায়গায় গেলুম—আর কতবার বেড়ালুম!

আজ ক'দিন এখানে এসেচি। এবার অতিরিক্ত বন্যা আসাতে কুঠীর মাঠের সে শোভানেই। আমার তেমন ভাল লাগে না—ছোট এড়াঞ্চির গাছগুলো তো জলে হেজেপচে গিয়েচে, যেখানে সেখানে কাদা ও পানা-শেওলার দাম ও কচুরীপানা।খুকুএখানে আছে, ও রোজসকালে স্নানের আগে ও দুপুরে আসে। আমি সকালে বাঁশবাগানের পথ দিয়ে ঘাটে যাই, বেশি বনের মধ্যে যাই, মাকড়সার জাল এবার চোখে পড়ছে না। তা হলেও খুব বড় বড় জাল দেখলুম, শিলং-এ একরকম বড় জাল দেখেছিলুম পোস্টাপিসের কাছে। আমাদের এখানে মাকড়সাদের জালের টানা খুব দূরে হয়। আবার খুব ছোট টানার জালও দেখিনি যে তা নয়, যেমন কুঠীরমাঠে একটা ঝোপে সেবার দেখেছিলুম। এই গাছপালা, লতাঝোপ, মাকড়সা, পাখি এদের একটাভিন্ন জগৎ—সহানুভূতির সঙ্গে ওদের না দেখলে কি ওদের বোঝা যাবে না চেনা যাবে?

বিকেলে রোজ মাছ ধরতে যাই। অনেককাল পরে আবার কেঁচোর টোপ গেঁথে মাছ ধরতে বসেছি। বোধ হয় বনগাঁ স্কুলে ভর্তি হবার পরে আর কখনো মাছ ধরিনি—দু'একদিনধরতে বসলেও এত তোড়জোড় করে যে ধরিনি তা ঠিক। এবার ইছামতীতে মাছও হয়েছে বিস্তর। আমার ছোট ছিপে কেবল পুঁটি আর ট্যাংরা ছাড়া পাইনে, কিন্তু ফণি চক্কত্তি ও হরিপদরোজ সাত-আটটাবড় বড়বান মাছ ধরে। বেলা যত পড়ে আসে, রোদ খুব রাঙা হয়ে ওঠে। ভারী সুন্দর শোভা গাঙের, বকের দল উড়ে যায় জলের ওপর দিয়ে, সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে নামে—আমি ফাতনার দিকে স্থির দৃষ্টি চেয়ে থাকব না সন্ধ্যার শোভা দেখব? চোখ ঠিকরে যায় ফাতনার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে। চোখে এত ব্যথা হয় যে মনে হয় যেন খুব বই পড়েছি।সন্ধ্যার সময়টা খুব lovely লাগে, কিন্তু বসে পাঁচীদের সঙ্গে গল্প করি।

আজ সর্বপ্রথম ভাল লাগল কুঠীর মাঠ। বন্যার দরুন এবার কুঠীর মাঠের সে সৌন্দর্য ছিলনা, ছোট এড়াঞ্চির গাছগুলো সব হেজেপচে গিয়েছে, সে শ্যামলতা আর কোনোদিকে চোখে পড়ে না। আজ দুপুরে খুকু এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে, তারপর আমার মনে পড়ল যে এবার এসে আইনদ্দির সঙ্গে দেখা করা হয়নি। নব্বই বছর

হয়েছে ওর বয়েস, কবে মরে যাবে, যাইএকবার দেখা করে আসি। মনে ছিল আনন্দ, কি জানি কেন জানিনে, সেই আনন্দভরা মন নিয়ে গেলুম পড়ন্ত বেলার হল্‌দে রোদমাখানো গাছপালার নীচে দিয়ে কাঁচিকাটা পুলের দিকে। বনেরদিক থেকে এক এক জায়গায় কি সুন্দর ফুলের সুবাস ভেসে আসচে, অথচ কি ফুলের যে অতসুঘ্রাণ তা দেখা যায় না। খুঁজে খুঁজে দেখি পথের ধারে এক জায়গায় ঝোপে নাটাকাঁটার ফুল ফুটেছে, তার গন্ধ ঠিক আতরের মত। কিন্তু সে গন্ধটা আগে পেয়েছিলুম, তা নাটা ফুলের গন্ধ নয়। সে গন্ধ অন্য ধরনের। শুধু ফুলের গন্ধ বলে নয়, বনভূমির পাশ দিয়ে যাবার সময়লতাপাতা, ফুল-ফলের গন্ধ জড়িয়ে মিশিয়ে যে অপূর্ব সুবাসের সৃষ্টি করে গাছপালারাই তার।স্রষ্টা, নীলাকাশের তলায় কোটি যোজন দূরের সূর্যের রৌদ্রের সঙ্গে পৃথিবীর মাটির রস, বায়ুমণ্ডলের অদৃশ্য বাষ্প, এদের সংযোগে ওরা যে রসায়ন প্রস্তুত করে, তাই আমাদেরপ্রাণীজগতের উপজীব্য। ভূতধাত্রী তরুলতা নির্মমভাবে ছেদন করবার সময় একথা সব সময় আমাদের মনে ওঠে না। তাই আজ সকালে যখন দেখলুম তেঁতুলতলার মাঠের ধারে খানিককরে জমির জঙ্গল কেটে দিয়েছে—তখন এত কষ্ট হল! ওখানে নাকি ওরা বেগুন করবে!আহা, কি চমৎকার সাঁইবাবলা ও কেঁয়োঝাঁকা গাছগুলো কেটেছে, আজ ত্রিশ বছর ধরে ওইবনভূমি কত বনের পাখির আহার্য যুগিয়েচে, আশ্রয় দিয়েচে। সৌন্দর্যে, ছায়ায়, ফুলের সুবাসেআমাদের তৃপ্তি দিয়েচে, তাদের ওভাবে উচ্ছেদ সাধন করে যে কোন্ প্রাণে তাও বুঝিনে। একটা গাছ কেউ কাটলে আমি তা সহ্য করতে পারিনে। কাগজের কলের জন্যে আমাদের দেশ থেকে গাড়ি গাড়ি বাঁশ চালান যাচ্চে, বাঁশবন দেশের একটা শোভা, এবার সর্বত্র দেখচি বাঁশবন। ধ্বংসের পথে চলেচে। দাম তো ভারী, পাঁচ টাকা করে একশো—আমার ঝাড়ের বাঁশ আমি বেচিনি। দুপুরে যখন রৌদ্রে মাঠের মধ্যে গামছা পেতে চুপ করে শুয়ে থাকি, দূর গ্রাম-সীমান্তে বাঁশের বনে নতুন বাঁশের দল সোনার সড়কির মতো উঁচু হয়ে থাকে, নীল আকাশের তলায়শিমুলের ডাল বাতাসে দোলায়, রঙিন-ডানা প্রজাপতিরা বনের ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়, একটাগাঙচিল ইছামতীর পারের বড় কদমগাছটা থেকে ডাকে—মনে আসে অপার ব্যোমের উদারইঙ্গিত, বনপুষ্পের বাণী, বনবিহঙ্গের কলতান—যে সৃষ্টিকে যে জগৎকে জানিনে, বুঝিনে, ভাল করে চিনিওনে, তার রহস্যে দেহমন সবল হয়ে ওঠে।

তারপর গেলুম আইনদ্দির বাড়ির পাশের পথটা দিয়ে মরগাঙের বড় বড় বটগাছের ছায়ায়ছায়ায় সুন্দরপুরের দিকে। আবার সেই বনঝোপের গন্ধ, সেই ছায়া, সেই পাখির ডাক।এবারকার বন্যায় অনেক গাছপালা নষ্ট হয়ে গিয়েচে, তবুও এ পথের সৌন্দর্য তেমনি অক্ষুণ্ণআছে। মনে হল সেই ডাওকি নদীর দোদুল্যমান সেতু ও সেই gorgeটার কথা।

ঠিক দুপুরবেলা। অপূর্ব পুজোর ছুটি ফুরিয়ে গেল। নৌকো বেয়ে চলেচি বনগাঁয়ে, মেঘলোক-শূন্য নীলাকাশের কোলে সাদা সাদা বকের দল উড়চে। মনে কেমন একটা বিষাদ গ্রামছেড়ে যেতে, ইছামতী নদী ছেড়ে যেতে, খুকুকে ছেড়ে যেতে। তার ওপর দেখে এলুম খুকুরজ্বর হয়েছে, আজ সকাল থেকে সে শুয়েই আচে। কিচমিচ পাখি ডাকচে চালতেপোতার বাঁকেঝোপে ঝোপে। মন উদাস হয়ে রয়েছে আমার, কিছু ভাল লাগছে না। কেন এমন হয়? যাদেরভালবাসি, কাছে রাখতে চাই, তাদের কেন কাছে পাইনে? কোথায় সুপ্রভা পড়ে রইল শিলং-এ, দেখবার ইচ্ছে হলেই কি তাকে দেখবার উপায় আছে? কোথায় পড়ে রইল খুকু! এই যে ওরঅসুখ দেখে এলুম, কিছুই করবার নেই আমার করতে গেলেই যত নিন্দা, যত কানাকানিহবে এই সব পাড়াগাঁয়ে।

খুব বেড়িয়েচি এবার ছুটিতে। সেই ডাওকি নদীর gorge, চেরার পথে সেই প্রাইমূলা ও Compositae-র বন মনে পড়ছে। চালতেপোতার বাঁকে এই গাছপালার সৌন্দর্যে, খুকুকেছেড়ে আসবার বিষাদে মনটা পূর্ণ হয়ে আছে। এ সময় শিলং, নংটু থেকে ডাওকি পর্যন্ত সেইবিরাট ট্রপিকাল অরণ্যানী যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়।

এইমাত্র বারাকপুর থেকে মোটরে ফিরে এলুম। আজ বেলা বারোটার সময় পশুপতিবাবু, বউঠাকরুণ, নীরদবাবু ও তাঁর স্ত্রী, বগলাবাবু ও আমি গিয়েছিলুম মোটরে বারাকপুরে বেড়াতে।পথে টায়ার খারাপ হয়ে যাওয়ার দরুন এক জায়গায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। তারপর যখন বনগাঁএলাম, তখন বেলা গিয়েচে। জিনিসপত্র কিনে নিতে কিছু

দেরি হয়ে গেল। ওখান থেকে বেলাপড়ে গেলে বারাকপুর গেলাম। পুঁটিদিদিদের বাড়ির সামনে মোটর গিয়ে দাঁড়াল। খুকুনিজের বাড়িকি করছিল, আমি গিয়ে তাকে বল্লুম। সে কাপড় পরে তখনি এল। পশুপতিবাবু খুড়োদের রোয়াকেবসিয়ে তার ফটো নিলেন। আমিও সেখানে পেছনদিকে দাঁড়াই। তারপর বগলাবাবু গানকরলেন—'চাঁদ ডুবে যায় ভোর গগনে।' আমি পশুপতিবাবুকে নিয়ে কুঠীর মাঠে বেড়িয়ে এলাম। এসে দেখি শিবুর মা নীরদবাবুর স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েচে। একটু পরে তিনি এসে খুকুদের বাড়িবেড়াতে গেলেন। আমিও দেখতে গেলুম। খুকু ডাকলে, আসুন না ? আমি ওদের ঘরে গেলুম।তক্তপোশের ওপর উনি আর খুকুবসে আছেন। তারপর খুকু দোরের কাছে এসে বসল। বগলাবাবুগান করলেন—আমিও সেই দোরেরই বাইরে বসে। গান খুব ভাল হল। তারপর সবাই খেতে বসে গেল। ওদিকেখুকু, বেলা ও পশুপতিবাবুর স্ত্রী খেতে বসলেন। খুড়িমা পরিবেশন করলেন।খাওয়া-দাওয়ার পরে খুকু একা এ ঘরের অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে আলাপকরলে বগলাবাবুর গানের বিষয়ে। সুপ্রভার পত্র দেখতে চাইলে, তা ওকে তো না দেখিয়ে পারপাবার জো নেই। বল্লে, আবার কবে আসবেন? বল্লাম, সেই বড়দিনের সময়। বল্লে, এসে বড়।খারাপ লাগছিল এ ক'দিন, আজ ভাগ্যিস আপনারা এলেন!

রাত ন'টার গাড়ি গেলে আমরা রওনা হলুম। খুকু রোয়াকে দাঁড়িয়ে ছিল, বল্লে – গুডবাই। পশুপতিবাবু বকুলতলায় দাঁড় করিয়ে ওর একটা ফটো তুলেছিলেন, আর একটা কোন্‌ঝোপের কাছে দাঁড় করিয়ে।

পথে জাহ্নবীর বাসায় খোকাকে নামিয়ে দিয়ে আমরা ওপারে গেলুম তেল কিনতে। বারাসতের কাছাকাছি এসে গাড়ির টায়ার আবার গেল। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করবার পরেএকখানা লরি পেয়ে তাতে করে কলকাতা পৌঁছুলাম।

এ বেড়ানো মনে থাকবে বহুদিন।

চন্দননগরে একটা সভায় আমায় সভাপতিত্ব করতে হবে বলে গিয়েছিলেন, কিন্তু শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের আজ বার্ষিক উৎসব। পশুপতিবাবু বিশেষ করে বলে গিয়েছিলেন।দুপুরে কিন্তু বাধ্য হয়ে চলে যেতে হল চন্দননগরেই। সুরেন মৈত্র, সুরেন গোস্বামী, বিজয়লালচাটুয্যে, আমি সকলে বেলা তিনটের সময় গিয়ে নৃত্যগোপালের পুস্তকাগারে উপস্থিত হলাম।ওরা লাইব্রেরিতে বসে কথাবার্তা বলছিল—আমি পেছনদিকের নির্জন ছাদের আলসের ধারেদাঁড়িয়ে শীতের অপরাহ্নের হলদে রোদ-মাখানো রাধালতাফুলের ঝোপ ও বাঁশগাছের দিকেচেয়ে রইলুম। কেবলই মনে হচ্ছে সুপ্রভা আরখুকুআজ এই অপরাহ্নেকি করচে? এক-একবারআমাদের গাঁয়ের বকুলতলাটি কল্পনা করবার চেষ্টা করলুম, খুকু এখন পড়ন্ত বেলার ছায়ায় তাদের শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে আছে, কিংবা পাঁচীর সঙ্গে গল্প করতে এসেচে এ-বাড়ি। সুপ্রভারআজ ছুটি, হয়তো পাইন মাউন্ট স্কুলের পাশের রাস্তা দিয়ে বেড়াতে বেরিয়েচে। ওর রুমালখানাসঙ্গে করেই নিয়ে গিয়েছিলুম। বড় ময়লা হয়ে গেচে। ওদের দুজনের কথা ভাবছি, এমন সময় সুরেনবাবু ডাক দিলেন লাইব্রেরিতে ব্রাউনিং শোনাবার জন্যে। সুপ্রভা এবার ব্রাউনিংয়ের'Rudel to the Prince of Tripoli'-র অনুবাদ করেছিল বিচিত্রায়। সুরেনবাবু তারঅন্যভাবে অনুবাদ করেচেন—আমার দুটিই ভাল লাগল—তবে সুপ্রভার অনুবাদ খুব literal না হলেও মিষ্টি বেশি। সুপ্রভা যে ছন্দটাকে অবলম্বন করেচে, তার ধ্বনি ও লয়ের অবকাশসুরেনবাবুর অবলম্বিত ছন্দের চেয়ে বেশি। ব্রাউনিং পড়া শেষ হয়ে গেলে আমাদের ফটোনেওয়া গেল। মনে পড়ল গোপীর সঙ্গে কুড়ি বছর আগে একবার এসেছিলুম চন্দননগরে, তারপর আর কখনো আসিনি। বিয়ে করব বলে মেয়ে দেখতে এসেছিলুম, তখন আমি কলেজে পড়ি, ১৮ বছর বয়স। অবিশ্যি সে মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হয়নি। মনে আছে, মেয়েটি ছিল খুব ছোট, বারো বছর বয়স, অত ছোট মেয়ে আমি পছন্দ করিনি। মেয়েটি বেশ ফর্সা, একহারা চেহারা, তা আজও মনে আছে। এখন গিন্নীবান্নী হয়ে নিশ্চয়ই কোথাও ঘরসংসার করছে—যদি বেঁচে থাকে।

চন্দননগরে সভার কাজ শেষ হবার আগেই সুরেনবাবুকে সভাপতির আসনে বসিয়েআমি আর বিজয়লাল চলে এলুম। হাওড়া থেকে বাসে দেশবন্ধু পার্কে এলাম। সেখানেশিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের থিয়েটার হচ্ছে পার্ক স্কুলের প্রাঙ্গণে। নীরদবাবু, বউঠাকরুণ, পশুপতিবাবু সবাই আছেন। জাস্টিস দ্বারিক মিত্রের সঙ্গে পরিচয় হল।

সেদিন রাজপুরে গিয়েছিলুম সন্ধ্যার কিছু আগে। ঢাকুরিয়া, কসবা প্রভৃতি স্থানেরেললাইনের ধারে ছোট ছোট গৃহস্থবাড়ি। সন্ধ্যার চাপা আলো পড়ে কেমন একটা শ্রী হয়েছে, যেন কত পুঞ্জীভূত শান্তি ও রহস্য, গৃহস্থালির কত স্নেহ ভালবাসা এখানে আশ্রয় নিয়ে আছে, নারীর মুখের মঙ্গলশঙ্খের ধ্বনিতে আর হাতের সন্ধ্যাপ্রদীপের আলোয় সে শান্তি ও মাধুর্যেরনিত্য আরতি চলছে। যেখানেই একটা মেয়ে এঁদো-পড়া পুকুরের ঘাটে বসে এই সন্ধ্যাবেলা বাসন মাজচে, সেখানেই তাকে ঘিরে যেন চারিপাশে গভীর রহস্য। মেয়েরা না থাকলে জগৎটাকি মরুভূমিই হত তাই ভাবি।

রাজপুরে পৌঁছে গল্প করলুম তেঁতুলদের বাড়ি বসে অনেকক্ষণ। ফুলি এল, তেঁতুলের মাবলছিলেন, তাঁকে বড়দিনের ছুটিতে হরিদ্বার নিয়ে যেতে। সেদিন কত রাত পর্যন্ত ভ্রমণ সম্বন্ধেপরামর্শ হল—কোথাদিয়ে যাওয়া যাবে, কোথায় নামা যাবে, কি কি সঙ্গে নেওয়া হবে—এইসব কথা।

কিন্তু আমি দেখলুম গৃহস্থালিতে যে খুব শান্তি আছে, যতটা দূর থেকে ভাবি, তা ঠিক নেই। এ সব বাড়িতে তো ছেলেমেয়েদের সর্বদা কান্নাকাটি লেগেই আছে—যখন ছোটছেলেমেয়েচিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে, তখন প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলে। আর এ করছে ওরসঙ্গে ঝগড়া, ও করছে এর সঙ্গে ঝগড়া। তেঁতুল তো আপিস থেকেফিরে মহা ঝগড়া বাধিয়েদিলে—তার বউকে সবাই কেন একলা ঘরে ফেলে রেখেচে! এ রকম শুধু এদের বাড়ি নয়, সব গেরস্ত বাড়িতেই দেখেচি এই রকম অশান্তি, চিৎকার—চিন্তা ও বিবেচনার সম্পূর্ণ অভাব।

মেয়েরা যদি ভাল হয় তবে সত্যিই সংসারে ওরা শান্তি আনতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের মেয়েরা অধিকাংশ অশিক্ষিত, বিশেষ কিছু জানে না, বোঝে না— তুচ্ছবিষয়ে বড় বেশি ঝোঁক, তুচ্ছ কথা নিয়ে দিনরাত আছে। মনে আনন্দ ও স্ফূর্তি কম মেয়েরই আছে। যে ধরনের সদাহাস্যময়ী মেয়ে সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাদের সংখ্যা খুবইকম। আমি হাসিখুশি বড় ভালবাসি, যে মন খুলে হাসতে পারে না, আনন্দ করতে পারে না, তাকে নিয়ে সংসারে চলা যায় কি?

অনেকদিন পরে খাঁ সাহেব আবদুল করিম খাঁর গান শুনলুম কাল ইউনিভার্সিটিইনস্টিটিউটে। ভাগলপুরে থাকতে হেমেন রায়ের মুখে আবদুল করিমের খুব প্রশংসা শুনি।তখন থেকে ইচ্ছা ছিল এঁর গান শুনব। আমি জানতুম না যে এবার All Bengal Music Conference-এ খাঁ সাহেব আসবেন। সেদিন কাগজে নাম দেখেই স্থির করলুম গান শুনতেইহবে। সত্যিই খুব বড়দরের শিল্পী, তা তার গান শুনে কাল বুঝে নিয়েচি। সত্তর বছরের বৃদ্ধের মুখে এমন চমৎকার মিষ্টি সুর আশা করিনি, যেন সারেঙ্গী বাজচে।

এবার বড়দিনের ছুটি দেশে বড় আনন্দে কাটিয়েচি। বৈকালে রোজ কুঠীর মাঠে ছোটএড়াঞ্চি ফুলের বনের মধ্যে একটা চাদর পেতে বসে বসে Jeans-এর Universe Around পড়তুম। একদিন চাঁদ উঠেছে ছোট একটা চটকা গাছের পেছনে, বোধ হয় ত্রয়োদশী, বিকেলবেলা, সে একটা অপূর্ব ছবি—কতকাল মনে থাকবে ছবিটা। পরের প্রতিপদেই হালিডাঙ্গার প্রজাবাড়ি থেকে খাজনা আদায় করে ফিরচি, দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে চাঁদ উঠল, কোনোদিকেকোনো মানুষ নেই, পশ্চিম আকাশে দপ্‌দপ্‌ করচে শুক্রতারা। একটা খেজুর গাছে রসের ভাঁড়পাতা ছিল, ভাঁড়টা নামিয়ে রস খেলাম, কিন্তু গাছে আর সেটা বাঁধতে পারলাম না। তখন আমার মনে হয়নি, তাহলে ভাঁড়টার মধ্যে দুটো পয়সা রেখে এলেই হত।

এবার কি জ্যোৎস্না পেয়েছিলুম দেশে! যেমন দিনে আকাশ সুনীল, মেঘমুক্ত—রাতেতেমনি ফুটফুটে জ্যোৎস্না—অবিশ্যি শীতও অতি ভয়ানক। খুকু ছিল দেশে, সে সর্বদাই এসেগল্প করত, বেশ লাগত তাই।

অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে উঠে গেলুম, চারিদিক নিস্তব্ধ, অন্ধকার। কেমনএকটা মনোভাব হল, খানিকটা বিষাদও তার মধ্যে যে না আছে এমন নয়। এই চারিপাশের বাড়ির কত লোককে জানতুম যখন প্রথম এ মেসে এসেছিলুম, তারা সবাই কোথায় গেল? কতকাল হল তাদের আর দেখিনে। তাদের কথাই মনে হল এ নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে। দুপুরেস্কুলের ছাদে একা বসে বসে যাদের কথা ভাবি, এরাও তাদের দলে আছে। সত্যি আমার মনের এ যে কি অদ্ভুত অবস্থা, কোনো পরিচিত বা অর্ধ-পরিচিত মানুষকে দূরে রাখতে ইচ্ছে হয় না, সকলকে কাছে টেনে রাখতে ইচ্ছে করে যে কেন!

'Space & time, I am learning are merely modes of appearance

Since a corner with thee darling, seems infinite now'-Goethe.

অনেকদিন পরে দেশে গিয়েছিলুম। দুপুরের পরে গিয়ে পৌঁছই। আমার ইচ্ছে, আমি যে গিয়েচি, কেউ যেন না টের পায়। কেননা তাহলে বড় লোকের ভিড় হয়, এপাড়ার ওপাড়ারমেয়েরা দেখা করতে আসে। আমি অত ভিড় পছন্দ করিনে। বিশেষ করে ইন্দুদের বাড়ি জানতেপারলে তো আর রক্ষেই নাই। কিন্তু শ্যামাচরণদাদাদের টিউবওয়েলের কাছে গোপাল দেখি কিকরচে, সে তো গিয়ে বাড়িতে খবর দেবে—সেই ভয়ে চুপিচুপিচলে যাচ্ছিলুম, তবু ও ঠিকটের পেয়েচে। তখন অগত্যা ওদের বাড়ি যেতে হল। তারপর খুকুদের বাড়িতেও গেলুম। খুকুদের বাড়িতে প্রথমটাতে যাইনি। পাঁচীদের বাড়ির উঠোনে আমাকে ঢুকতে দেখেই খুকুডাকলে, আসুন, আসুন। ওদের দাওয়াতে গিয়ে বসে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। ওবল্লে—আপনি শনিবার না আসাতে ভয়ানক রাগ করেছিলুম। খুকুদের বাড়ি থেকে যখন ফিরি, তখন বিকেল হয়েছে। সাজিতলার পূর্বে যেখানে ভাঙন ধরেচে নদীর পাড়ে, সেখানে একটা হেলেপড়া খেজুর গাছের গুঁড়ির ওপর বসে বসে নদীর দিকে কতক্ষণ চেয়ে রইলুম। বড়আনন্দ ছিল মনে, আরো বসতে চেয়েছিলুম, কিন্তু এদিকে আবার সন্ধ্যা হয়ে আসচে দেখেউঠতে হল। চালকীর মুসলমান পাড়ার মধ্যে দিয়ে আসা আমার বড় ভাল লাগে—শীতের সন্ধ্যায় ফুটন্ত ছোট এড়াঞ্চীর ফুলের বন, শুক্‌নো গাছপালার গায়ে রাঙা রোদ, গরিব লোকের কুঁড়েঘর, ওধারেই নদী, নদীর ধারে মাঠ— দেখতে দেখতে আমি আর উমা যে সাঁকোর ধারেবনের মধ্যে খেলা করতুম, সেখানে এসে উঠলুম।

পরদিন যখন কলকাতায় আসি, ট্রেনে সারাপথ কেবল মড্ কস্টেলোর একটা গানের লাইন মনে আসতে লাগল বার বার—আর কি সে আনন্দ মনে! জীবনটাকে এই এক মাসেরমধ্যে একটা নতুন চোখে যেন দেখেচি। জীবনের যেন নতুন অর্থ হয়। একটি নতুন উপন্যাসশুরু করব ভাবচি এই সম্পূর্ণ নতুন ধারায়।

তারপর আজ পাটনা এলুম বহুকাল পরে। ১৯২৭ সালের পরে আজ ৯/১০ বছর পাটনা আসিনি। আমি, নীরদ, ব্রজেনদা, সজনী সবাই একসঙ্গে এলুম, কাল রাত্রে একাদশীর পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় বর্ধমানের বড় বড় মাঠের দিকে চেয়ে আমার মনে আসছিল একটি প্রবহমানজীবনধারার কথা, যা চিরপুরাতন অথচ প্রতিদিন নিজেকে নতুন করে খুঁজে পায় সৃষ্টির মধ্যে, রসের মধ্যে যার সার্থকতা। কত সুপ্ত গ্রাম তো এই জ্যোৎস্নায় স্নাত হচ্ছে, কিন্তু বহুদূরে এক ক্ষুদ্র পল্লীনদীর তীরবর্তী এমন একটি গ্রামের ছবি বার বার মনে আসে কেন?

এ কথা আরো মনে এল যখন দুপুরে একাই পাটনাতে ওদের বাড়ির সামনের পার্কটাতেবসেছিলুম। ছোট্ট পার্কটা, বড় বড় ডালিয়া ফুটে আছে, আর ক্যালেন্ডুলা—সেও আধশুকনো। নীল আকাশের নীচে বসে দুপুরের রোদটি এই ভয়ানক শীতের দিনে কি মিষ্টিই লাগছিল। পাটনায় শীতও প্রচণ্ড।

আজ ন'বছর আগে পাটনা থেকে শেষ যখন চলে গিয়েছিলুম, আমার সে জীবনে এজীবনে অনেকখানি তফাত হয়ে গিয়েছে। তখন ছিল অন্য ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি, এখন হয়েছে অন্যধরনের। এখন যারা এসেচে জীবনে—তখন ওরা ছিল না। ওদের সত্যিই বড় ভাল লাগে। তাইআজ দুপুরে বসে কেবলই কাল রাতের মতো ছোট্ট একটি পল্লীনদী,

একটি বকুলগাছেরছায়াস্নিগ্ধ গ্রাম-এর কথাই মনে পড়ে। সুপ্রভার কথা সব সময়েই মনে হচ্চে। আহা, কোথায়কতদূরে রয়েচে পড়ে, ওর বাবার আবার অসুখ করেচে—ছেলেমানুষ, তাই নিয়ে ওর মন খুবখারাপ হবারই কথা।

সমস্তদিন যদি এ পার্কটিতে বসে এমনি আপনমনে ভাবতে পারতুম, খুবই ভাল হত।কিন্তু তা হবার নয়, আমরা পাটনা শহরে এসেচি শুনে তাবৎ প্রবাসী বাঙালিরা ভাবচেন আমরা তাদের অতিথি, কারণ মাতৃভূমি থেকে এসেচি, একটা প্রীতির চোখে সবাই দেখবেন, ওটা বেশি কথা নয়। বৈকালে একটা চা-পার্টিতে নিমন্ত্রণ ছিল—এখানকার পাবলিক প্রসিকিউটর মিহিরলালরায়ের বাড়ি। সেখানে গিয়ে দেখা বৈকুণ্ঠবাবু অ্যাডভোকেটের সঙ্গে—ভাগলপুর থেকেযখন-তখন আপীলের মোকদ্দমা করতে এসে ওঁর বাসায় উঠতাম। অনেকগুলি ভদ্রলোক এসেছিলেন—সবাই যখন চায়ের টেবিলে প্রবাসী বাঙালিদের বর্তমান দুর্দশা, বিহারিদেরসহানুভূতির অভাব, এমন কি বাঙালিদের প্রতি স্পষ্ট বিদ্বেষ প্রভৃতি বর্ণনা করছিলেন, আমিতখন আবার অন্যমনস্ক হয়ে জানালার বাইরে অস্তসূর্যের রঙে রঙিন আকাশ ও রাঙা-রোদ মাখানো গাছপালার দিকে চেয়ে ভাবচি, কত গ্রামের গাছপালার ছায়ায় এই সন্ধ্যায় কিশোরী মেয়েরা গা ধুয়ে চুল বেঁধে নিজেদের ছেলেমানুষি মনে কত কি ভাবছে, কত ভাঙাগড়া করচে।মনে মনে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে, কত স্বপ্ন দেখছে—তারপর এক অখ্যাত অবজ্ঞাত পাড়াগাঁয়েহাঁড়িকুড়ি নিয়ে সারাজীবন কাটালে।

সন্ধ্যার সময়ে বি-এ কলেজের হলে প্রকাণ্ড সভা। নীরদের অভিভাষণ বড় চিন্তাপূর্ণহয়েছিল। সেখান থেকে আমরা যখন বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েচি, তখন ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত, আজ পাটনাতে তেমন শীত নেই, আমার কেবলই বাংলাদেশের কথা মনে হয়।

এতক্ষণ সবাই কি ঘুমিয়ে পড়েচে?

ওরা সবাই?...

সুপ্রভাও ?...

সুশীলমাধব মল্লিক এখানকার বড় অ্যাডভোকেট। আমি তাকে এর আগে হাইকোর্টে কয়েকবার দেখেচি। তারই বাড়িতে নৈশভোজের নিমন্ত্রণ। তাঁদেরই গাড়িতে সবাই গিয়ে পৌঁছলুম। সেদিন বনগাঁয় যেমন এক সভা বসেচিল মন্মথ রায়ের বাড়িতে—এদিন এখানেও সুশীলমাধববাবুর বৈঠকখানায় রঙীনদা, কলেজের জনৈক biology-অধ্যাপক, নীরদ, সজনী, আমি সবাই মিলে আরম্ভ করলুম। আনাতোল ফ্রাঁস সম্বন্ধেই তর্কটা গুরুতর। খাওয়ার সময় সুশীলবাবু নিজে বসে এত তদ্বির করতে লাগলেন—বিশেষত বৃদ্ধ বোধহয় সন্ধ্যার পরেদু'-এক পেগ টেনে একটু খোশমেজাজে থাকেন—যে আমরা না পারি পাতের তলায় সন্দেশলুকিয়ে ফেলে ফাঁকি দিতে, না পারি মাছ-মাংসের বাটিতে একটুকরো ফেলে রাখতে। পাটনায়এসে কেবলই খাচ্চি, খেয়েই প্রাণ গেল।

রাত অনেক হয়েছে। জ্যোৎস্না আজও ফুটেচে। মণিদের বাড়ি এসে সকলে ঘুমিয়েপড়লুম।

সকালে উঠে এখানকার সেশনস জজ শিবপ্রিয় বাঁড়ুয্যের বাড়ি আমি, নীরদ আর ব্রজেনদা গেলুম বিলিতি মিউজিক শুনতে। নীরদ ও জিনিসটা বোঝে। আমি ওদের ঘর থেকে বেরিয়েগঙ্গার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। সাহেবী ধরনের বাড়ি, সবুজ ঘাসে মোড়া লন্ বড় বড় গাছ, ধূ-ধূকরচে সামনে গঙ্গার চর, দূরে ঘাটে স্টিমার পারাপার হচ্ছে। নীল আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কি অদ্ভুত আনন্দ পেলুম পূর্ব দিগন্তের দিকে চেয়ে! Schubert-এর মোজার্টের সুরকতই বাজচে ওদিকে। গানের সঙ্গে নিজের মনের অনুভূতি জড়িয়ে যে অপূর্ব আনন্দের রসায়নসৃষ্টি হল, বহুদিন আগে ইসমাইলপুরে থাকতে এমন ধরনের আনন্দ মাঝে মাঝে পেতুম, তারপর আর বহুদিন পাইনি।

ওখান থেকে আমরা গোলঘর নিতাইবাবুর বাড়ির রাস্তা দিয়ে বাড়ি এলুম। আমাদের গরম জল দিয়ে গেল ওদের বাড়ির একটি মেয়ে। দুপুরে কমলবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণে গেলুম।অনেক ভাল ভাল গোলাপ দেখা গেল তার বাগানে। সতীদেবীর মীরাবাঈয়ের ভজন গানখানাখুব ভাল লাগল।

বরিখে বাদরিয়া শাওন কি

শাওন কি মন ভাবন কি—

বাড়ি আবার এলুম ইঞ্জিনিয়ারটির মোটরে। আসবার পথে এরিস্টলোকিয়া লতা দেখবারজন্যে ট্রেনিং কলেজে নিয়ে গেলেন। অদ্ভুত লতার ফুলটি।

বৈকালে বি-এন কলেজের হোস্টেলের লনে চা-পার্টি। রোদ রাঙা হয়ে আসচে। ফটোনেওয়া হল। এখানে প্রীতি সেন বলে এক ছোকরার সঙ্গে আলাপ হল—তাকে বেশ ভাললাগল। সন্ধ্যায় মিটিং বি-এন কলেজের হলে। আমি একটা বক্তৃতা করলুম—'রচনার ওপরে ভূমিশ্রীর প্রভাব'—"যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ' গল্পটি পড়লুম। বহু জনসমাগম সভার পরেএক গাদা অটোগ্রাফ খাতা সই করতে প্রাণ যায় যায় হয়ে উঠল। একদল আমার সঙ্গে গল্পকরতে করতে বাইরে এল। আমার বইয়ের ছোট গল্পের সম্বন্ধে ওদের কিন্তু ভয়ানক উৎসাহ, আমার যে এত ভক্ত আছে তা জানতুম না।

আমি এখনই বক্তিয়ারপুর যাব। রঙীনদা আমায় তুলে দেবেন বলে মোটরে উঠলেন, আর মণি। এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকটির মোটর। মণিদের বাড়ি এসে জিনিসপত্র নিয়ে বেরুতে যাব— মোটর স্টার্ট নিলে না। ভদ্রলোক কত চেষ্টা করলেন—হাঁপাতে লাগলেন—আহা, তার কষ্ট দেখে আমার কি কষ্ট! সত্যিই ভেবে এখনো আমার চোখে জল আসছে। মহা অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন।মাত্র আর ২০ মিনিট দেরি আছে গাড়ির! একজন লোক ছুটল—একখানা ট্যাক্সি নিয়ে এল। তাতেই এলুম স্টেশনে। এসে দেখি পাঞ্জাব মেল ৫৫ মিনিট লেট। ওরা কেউ আমায় ফেলে যেতেচাইলে না। আমি একবার এসে সে অপূর্ব জ্যোৎস্নারাত্রে 'বাঁকীপুর স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালুম।এক-একবার মনে হচ্ছিল যেন আমি এখনো ইসমাইলপুরে আছি। এখান থেকে আজ বা কাল গিয়ে ইসমাইলপুরের সেই প্রান্তরে গিয়ে হাজির হব। কিন্তু কি পরিবর্তনই হয়েছে জীবনে এই ক'বছরে! তখনকার আমি আর বর্তমান আমিতে অনেক তফাত। জীবনে তখন সুখ ছিল, সে অন্যরকম। আর এখন এ অন্যরকম। তখন জীবন ছিল নির্জন, এখনখুকুএসেছে, সুপ্রভা এসেছে। সুপ্রভার কথা অত্যন্ত মনে হচ্চিল, আমি সেদিন যে পত্র দিয়েছি, তা শিলচরে আজ ঠিক পেয়েচে।

এমন সময় পাঞ্জাব মেল এল। একটি মেয়ে লক্ষ্ণৌ এগ্‌জিবিশন দেখে ফিরছে, তার সঙ্গেরঙীনবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন। বল্লেন—এই যে বিভূতিবাবু, ইনি বলছেন আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন বিভূতিবাবুর। আম খুঁজছিলুম, কোথায় গিয়েছিলেন?" মেয়েটা বেশ ভাল, অমায়িক স্বভাব, সুন্দরীও বটে। জিগ্যেস করলুম-লক্ষ্ণৌ একজিবিশন কেমন দেখলেন? তিনি বল্লেন—বেশ ভালই, আপনি দেখেননি? বল্লম—কই আর দেখলুম!

মনে হল আমাদের পাড়ার খুড়িমা, ন'দি প্রভৃতি মেয়েদের কথা। ওরা পরকে ভাবেশেয়াল-কুকুর, কিন্তু নিজেরা যে কিসের মতো জীবনযাপন করে তা কি ভেবে দেখেচে? মাঝেপড়ে খুকুটা ওদের মধ্যে পড়ে মারা গেল, একঘেয়েমি ও সঙ্কীর্ণ জীবনের তিক্ততায়।

কি ভয়ানক শীত লাগল ট্রেনে বক্তিয়ারপুর আসতে আসতে। অমন শীত অনেক দিনদেখিনি। রাত বারোটায় এক্সপ্রেস বক্তিয়ারপুর পৌঁছুল। একটা কুলি নিয়ে কালীদের বাড়িগেলুম। অনেক রাত পর্যন্ত ইরাদিদি ও কালীর সঙ্গে গল্প করলুম।

পাটনা থেকে এসেই জানলুম সুপ্রভা এসেচে কলকাতায়। সেই রাত্রেই তার সঙ্গে দেখাকরতে গেলুম। গত শনিবার বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েছিলুম ওর সঙ্গে। সেদিনকয়েকটি গান করলে—আমি জানতাম না ও এত সুন্দর গান গায়। কি মিষ্টি লাগল ওর গান ক'টি সেদিন। বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে ফিরেই বনগাঁয় ৬-৫০-এর ট্রেনে। স্টেশনে সুবোধ ও যতীনদার সঙ্গে দেখা। রাত ন'টাতে বনগাঁয়ে পৌঁছেই দেখি জগদীশদা'র মেয়ে হাসির বিয়ে—সেদিনই। প্রফুল্ল, হরিবাবু প্রভৃতি বরযাত্রীদের খাওয়ানোর কাজে মহাব্যস্ত। আমায়বল্লেন—এত রাত্রে কোথা থেকে! খেতে বসে যাও। যোগেনবাবুদের বাড়ি খাবার জায়গাহয়েছিল। খেয়ে যখন বাইরে এলুম তখন চাঁদ উঠেচে, অল্প অল্প জ্যোৎস্না, কৃষ্ণপক্ষের ভাঙাচাঁদ।

পরদিন দুপুরের পরে বারাকপুরে গেলুম। যাবার সময় আজকাল চালকীর মুসলমান পাড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে বড় চমৎকার লাগে। খুকুদের রান্নাঘরে ওরা খেতে বসেচে। বল্লুম—খুড়িমা, অতিথি আছে। ওরা অবাক হয়ে গেল। তারপর খুব খানিকটা গল্পগুজব করেবিকেলে ফিরি। ফেরবার পথে গাজিতলা ছাড়িয়ে সেই খেজুর গাছের হেলানো গুঁড়িটায় বসেঅর্ধচন্দ্রাকৃতি নদীর দিকে, ওপারের মুক্ত তৃণাস্তৃত চরভূমির দিকে চেয়ে রইলুম। সন্ধ্যায় বনগাঁফিরে চারুবাবুর ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল, চা খাওয়া সেরে সাড়ে আটটার ট্রেনে কলকাতারওনা হই।

আজ বিকেলে গোলদীঘিতে কতক্ষণ বসেছিলুম। গৌরীর কথা মনে হল অনেকদিনপরে। এই সময়েই সে মারা গিয়েছিল। সেই শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, সুন্দর ঠাকুরের দোকানেধারে লুচি খাওয়া—সেই সব শোকাচ্ছন্ন গভীর দুঃখ ও দুর্দশার দিনগুলো এতকাল পরে দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়।

এরাও তো চলে যাবে। সুপ্রভা পরশু বলচে গঙ্গার ধারে বসে বোটানিক্যাল গার্ডেনে—আপনি শীগ্‌গির কিন্তু একবার শিলং যাবেন। আমি বেশিদিন বাঁচব না, সত্যি আমারআয়ুকম, জ্যোতিষী বলেচে। কবে মরে যাব, আপনি টেরও পাবেন না।

খুকুও তো বিয়ে হলে চলে যাবে বারাকপুর ছেড়ে। তখন আবার যে নির্জন, সে নির্জন।

আজ বিকেলে রেডিও আপিস থেকে ফিরবার পথে লালদীঘিতে একটু বসেছিলুম! সন্ধ্যাহয়ে আসচে। যশোর জেলার দূর এক গ্রামে—তাতে সেই মেয়েটি এখন তাদের বাড়িরসামনের বকুলতলাটিতে আপনমনে হয়তো বসে আছে। সুপ্রভা হয়তো পুরীতে সমুদ্রের ধারেবসে কি ভাবচে। কি জানি কেন, বসলেই ওদের দুজনের কথা মনে হয়। তাই মনে হল এইসময় একবার জাঙ্গিপাড়া যাব। কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে সেই একঘেয়ে দুর্দিনেজাঙ্গিপাড়া গিয়েছিলুম। গৌরী তখন মারা গিয়েচে। আমার প্রথম যৌবনের সঙ্গিনী। তার কথাইতখন আমার সমস্ত মনপ্রাণ ভরে রেখেচে, সেই সময় গিয়েছিলুম জাঙ্গিপাড়া স্কুলে চাকুরি করতে, ১৯১৯ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি। সে কত কালের কথা হয়ে গেল! তারপর ১৯২৪সালের জানুয়ারি মাসে ভাগলপুরে চাকরি নিয়ে যাবার আগে একবার জাঙ্গিপাড়া গিয়েছিলুম।সেও হয়ে গেল ১২/১৩ বছর আগেকার কথা। আর কখনো যাইনি। অথচ এই ১২/১৩বছরে জীবনে সবদিক দিয়ে কি ভয়ানক পরিবর্তন হয়েছে। এখন জীবনে কত লোক এসেচে, যাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত আমার কাছে তখন ছিল অজ্ঞাত। আসলে দেখলুম অর্থসম্পদ কিছু নয়। মানুষই মানুষের প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করে। জীবনে যদি প্রেম এসে থাকে, তবে তুমি পার্থিববিত্তে দীন হলেও মহাধনী ফোর্ড বা রকফেলার তোমাকে হিংসা করতে পারেন আর যদি প্রেমনা আসে, যদি কারো স্মিতহাস্যে-ভরা চোখ দুটি তোমার অবসর মুহূর্তে মনের সামনে ভেসেনা ওঠে, যদি মনে হয় দূরে কোনো পল্লীনদীর তটের ক্ষুদ্র গ্রামে, কি কোনো শৈলশিখরের পাইন বার্চ গাছের বনের ছায়ায় কোনো স্নেহময়ী নারী নিশ্চিন্ত নিরালা অবসরে তোমার কথা ভাবে, তবে ফোর্ড বা রকফেলার হয়েও তুমি হতভাগ্য।

হয়তো একথা Platitude ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু যে Platitude জীবনে অনুভব করে, তখন সে আর Platitude থাকে না, তার জীবনের অভিজ্ঞতায় তা হয়ে দাঁড়ায় পরম সত্য।

জাঙ্গিপাড়া স্কুলে প্রথম চাকুরিতে ঢুকি ১৯১৯ সালে। হঠাৎ জাঙ্গিপাড়া যাওয়া ঘটল এতকাল পরে। ১৯২৪ সালে একবার বেড়াতে গিয়েছিলুম, আর কখনো যাইনি। স্কুলের দিকেগিয়ে বৃন্দাবনবাবুর সঙ্গে দেখা হল। চিনতেও পারলেন। চন্দনপুরের গাঁয়ের পাড়ে সেই তালতলায় তখন কত বসে থাকতুম। পুরোনো জায়গাটা দেখতে গেলুম শ্রীরামপুরের দিদিরসঙ্গে—এই সব জায়গার স্মৃতি বড় বেশি জড়াতো—ওখানে গিয়েই সে কথা মনে পড়ল।

তারাজোলের পথেও খানিকটা গেলাম। সে পথটা তেমন ফাঁকা নেই, বড় বড় গাছ হয়ে পড়েচে। বাজারে আমার কয়েকটি ছাত্রের সঙ্গে দেখা হল—যেমন গজেন, ফকির, মোদক প্রভৃতি। গজেন এই স্কুলেই এখন মাস্টারি করচে।

বিষ্ণুপুর গেলুম বৃন্দাবনবাবুদের বাড়ি। ওদের সেই পুরোনো রান্নাঘরটা ঠিক আছে, তার দাওয়ায় বসে খেলাম অনেকদিন পরে। রাত্রে অনেক গল্প হলপুকুরের ঘাটে বসে। বিজয়বাবুকেবল্লাম—রাজকুমার ভড় জীবনে বড় বন্ধু ছিল, তার জন্যেই এখান থেকে যাওয়া, সে না থাকলেহয়তো এতদিন পরে এখনো জাঙ্গিপাড়ার সম্পন্ন গৃহস্থ হয়ে বসে থাকতাম।

পরদিন সকালে উঠে ওদের পুকুরপাড়ে সেই উঁচু জায়গাটি দেখে এলাম—একটা বড়তেঁতুল গাছ আছে সেখানে। বহুদিন আগে চট্টগ্রাম জেটিতে বসে এই জায়গাটার কথাভাবতাম। হঠাৎ যে আজ এখানে আসব—জাঙ্গিপাড়ায়—এত জায়গা থাকতে—তা কি কেউ কখনো ভেবেছিল? থানার পাশ দিয়ে পথটায় হেঁটে যাবার সময় পুরোনো দিনের সব কথা, সবমনের ভাব মনে আসছিল যে ছোট্ট ঘরটাতে ডাকঘর ছিল, চিঠিপত্রের আশায় বসেথাকতাম—সে ঘরটা এখনো সেই রকমই আছে। আমার ছোট্ট ঘরটাতেও গিয়েদেখলাম—তবে ঘরটা বন্ধ। পদ্মপুকুরের ঘাটের দিকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলুম।

দুপুরে আমার ছাত্র গজেনের বাড়িতে গেলুম। ওর ভাগ্নী পরিবেশন করলে—তার আবার স্বামী এসেছে, বেচারি ঘোমটা দিয়ে লজ্জাতেই জড়সড়। ওদের মাটির ঘরটা কেমনচমৎকার সাজানো—মাটির মাছ, খেলনা, পুতুল, পুঁতির মালা ইত্যাদি কুলুঙ্গিতে বসানো। দু'টিতরুণী লাজুক মেয়ে আনাগোনা করচে ঘরে ও বাইরে—খাটি পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থালি।

এক জায়গায় অনেক গাঁদাফুল ফুটে আছে। একজনের বাগান এটা। সে তার মনেরসৌন্দর্যজ্ঞান প্রকাশ করেচে ফুলের গাছ পুঁতে। এও একধরনের কাব্যরচনা। মনের সৌন্দর্যযাতেই যে ভাবেই প্রকাশ করা যায় তাই তো শিল্প—সেই হিসাবে উদ্যান-রচনা একটা বড়শিল্প।

ভগবান বোধহয় নিজেকে প্রকাশ করেছেন বিশ্ব-রচনার মধ্যে দিয়ে। Analogy-টা হয়তো ঠিক হয় না, কিন্তু ভাবতে বেশ লাগে।

আর একটা কথা ভাবছিলুম, যাকে ভালবাসা যায় বেশি, তাকে দুঃখ দিলে ভালবাসাবর্ধিত হয়, আদর দিলে তত হয় না। এ পরীক্ষিত সত্য। এতে যে সন্দেহ করে, সে ভালবাসারব্যাপার কিছু জানে না। যাকে ভালবাসো, তাকে খুব আদর দিয়ো না, ভালবাসা কমে যাবে।মাঝে মাঝে তার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ো, ভালবাসার সঙ্গে করুণা ও অনুকম্পা মিশে ভালবাসার ভিত্তি দৃঢ়তর হবে।

ভগবান যাকে বেশি ভালবাসেন, তাকেই কি বেশি কষ্ট দেন—তবে কি এই বুঝতে হবে ?

আজ বিকেলে বিশ্রী ঝড়বৃষ্টি, একঘেয়ে বাদলা। স্কুলের ছেলেদের নিয়ে মিউজিয়মে স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী দেখতে গিয়েচি। একদল ঢুকেছে, একদল ঢুকতে পারেনি, তাই নিয়ে ওখানকারসেক্রেটারির সঙ্গে ভীষণ গোলমাল ছেলেরা হাতাহাতি করতে যায়। আমি তাদের থামিয়েদিই। সাহেব আমার নাম লিখে নিলে—অর্থাৎ আমার নামে কি যেন রিপোর্ট করবে। করগে যারিপোর্ট, তোর রিপোর্টকে আমি ভয় করিনে। ওয়াছেল মোল্লার দোকানে জামা-কাপড় কিনতে গিয়ে আটকে গেলুম বৃষ্টিতে। তারপর পরেশ খুড়োর সঙ্গে দেখা করে ফিরি।

ক'দিনই বড্ড ছুটোছুটি হচ্চে, কাল পুরী যাব। ঝড়বৃষ্টি পড়ে গেচে, তা কি করব, উপায়নেই। এখন না গেলে ছুটি কই আর? কাল গিয়েছিলুম রাজপুরে বিকেলবেলা। নগেনবাগচীদের পুকুরঘাটে সন্ধ্যায় সকলে দাঁড়িয়ে কত কথা মনে হল—অনেকদিন আগে এদের এইবাড়িতেই ছিলাম। এই পুকুরঘাটে মা নাইতেন। সেই রকমই সব আছে বাড়িটার। কিন্তুএই১৩/১৪ বছরে আমার জীবনে কি পরিবর্তন হয়ে গিয়েচে তাই ভাবি। সম্পূর্ণ একটাওলট-পালট হয়ে গিয়েচে, মনের দিক দিয়ে, সবের দিক দিয়ে। তখনকার আমি আর এই আমিকি এক? মোটেই না–সম্পূর্ণ পৃথক দুই মানুষ।

পুরী যাওয়া হয়নি। ঝড়বৃষ্টি দেখে যাওয়া বন্ধ করিনি। টিকিট কিনে এনেছিলুম, সুপ্রভারপত্র পেলুম, সে ওয়ালটিয়ার গিয়েচে, তাতেই যাওয়া বন্ধ করলুম। দেশে চলে গেলুম সাড়েছ'টার গাড়িতে। বেজায় ঝড়বৃষ্টির মধ্যে নেমে যদি গাড়ি না পাওয়া যেত, বড় কষ্ট পেতাম। তার পরের দিন সকালে বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে গল্প করি। দুপুরে নৌকো করে বারাকপুরে গেলুমস্বরস্বতী পুজো করব বলে আমার ঘরে। খুকুরা ওখানেই আছে। খুকু একটু পরেই বার হয়ে এল। অনেক গল্পগুজব করলে। এবার চড়কতলার ছেলেরা বারোয়ারিতে সরস্বতী পুজো করচে। শ্যামাচরণদাদাদের বাড়ি চুরি হয়ে গিয়েচে বলে রাত্রে আজকাল সেখানেই শুই। আমরা ঘরেতার পরদিন সরস্বতী পুজো করলুম। বাল্যকালে দেশে সরস্বতী পুজো করেচি, আর কখনো থাকিওনি দেশে। এতকাল পরে এই।খুকুরা এসে অঞ্জলি দিলে—পাঁচি ওখুকুকে বল্লাম, তোরাপ্রসাদ ভাল করে দে সবাইকে।

বৈকালে কুঠীর মাঠে একাই গেলুম বেড়াতে। গাছে গাছে কুল খেয়ে বেড়াই ছেলেবেলার মতো। চারাগাছে ফুল ফলেচে, কিন্তু ছেলেবেলার মতো কুলগুলো তেমন মিষ্টি না। শিমুল গাছে প্রথম ফুল ফুটে রাঙা হয়ে আছে। সন্ধ্যায় রাঙা আকাশের তলায় চারিধারে গাছের মাথাগুলো নানা বিচিত্র ভঙ্গি ও ছত্রবিন্যাসের সৌন্দর্যে ভারী চমৎকার দেখাচ্চে। হঠাৎ পাটনায় মিহিরবাবুর বাড়ির চা-পার্টির কথা মনে হল, সেই যে আমি পর্দার ফাঁকের দিকে রাঙা রোদ লাগানো গাছের দিকে চেয়ে দেশের কথা ভাবছিলুম সেদিন। সে তো এই কুঠীর মাঠের কথাই। খুকুর কথাও। তারপরে বাড়ি ফিরে আসতেই খুকু ছুটে এল—সে ভাল কাপড় পরে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিল চড়কতলায়। খুড়িমা বাড়ি নেই—কলে গা ধুতে গিয়েচেন—টিউবওয়েলে।

রাত্রে ইন্দুর বাড়ি বসে ওর মুখে নানারকম গল্প শুনি। ও যশোর জেলায় এক পাড়াগেঁয়েডাক্তারি করতে গিয়েচিল। গ্রামের নাম কালো বেলপুকুর। সেখানে কেমনভাবে তাকে একটাগৃহস্থবাড়িতে আদর-অভ্যর্থনা করেচিল, আর এক গ্রামে এক গৃহস্থবাড়ি কেমন অনাদরকরেছিল এ সব গল্প করে গেল। ওর গল্পে অনেক অজানা পাড়াগাঁয়ের ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। এমন গল্প বলার ক্ষমতা সকলের থাকে না।

পরদিন কালো এল—ওদের বাড়িতে দুপুরে নিমন্ত্রণ। খুকুবসে মাছ কুটচে রান্নাঘরেরসামনে উঠোনে, বেলা দশটা, আমি রান্নাঘরের দোরে দাঁড়িয়ে ওর দাদা আর মায়ের সঙ্গে অনেকগল্প করলুম। নদীতে কালো আর আমি সাঁতার দিয়ে আমাদের পাড়ার ঘাট থেকে চলে গেলুম রায়-পাড়ার ঘাটে। বৈকালেখুকুঅনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে গল্প করলে প্রায় সন্ধ্যার কিছু আগে পর্যন্ত।তারপর আমি একটু কুঠীর মাঠের পথে বেরিয়ে এসে স্টেশনে রওনা হলুম জিনিসপত্র নিয়ে। আসবার পথে বুড়িকে দেখতে গেলাম। বুড়ির হাত ভেঙে গিয়েচে, ময়লা কাঁথা পেতে শুয়ে আছে। আমায় দেখে কি খুশিই হল! বুড়ি সত্যিই আমায় খুব ভালবাসে। একসময় ওর অবস্থাভাল ছিল, ওর স্বামী ছিল জমীর দেওয়ালি। মুসলমানপাড়ার মধ্যে জমীরের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। ছেলেবেলায় জমীর দেওয়ালিকে আমি দেখেচি। বুড়ি তারই বউ। এখন আর কেউ নেইওর, অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েচে। ভিক্ষে করে চালাতে হয় এমন অবস্থা। বুড়িকে কিছু দিয়েতাড়াতাড়ি সেখান থেকে বার হলুম, কারণ ট্রেনের বেশি দেরি নেই। অশথতলায় তখনো জ্যোৎস্না ফোটেনি, শেষ বিকেলের ছায়া। হরিবোলার দোকানে এসে ইন্দু ও ফণিকাকাকেপাওয়া গেল। ওরা বসে গল্প করছে। আমার মনে কি অদ্ভুত আনন্দ! সত্যি এমন সব আনন্দেরদিন জীবনে ক'বার আসে? এই জ্যোৎস্না, এই শুক্রতারা, আধখানা চাঁদ, সেক্রাদের বাড়িরকাছে নেবুফুলের গন্ধ

পাওয়া গেল—এরই মধ্যে কত কি ভাবনা! এ আনন্দ অনেকদিন পরেভোগ করলুম বটে। আজ চার বছর এই প্রথম বসন্তের দিনে এখানে ফুলফোটা দেখি। আজ চারবছর নানা সন্ধ্যায় নানা ছুটির দিনে নানা বিকেলেখুকুআমায় আনন্দ দিয়েচে—কত ভাবে, কতকথায়। ওই ভাবতে ভাবতে জ্যোৎস্নার মধ্যে স্টেশনে এলুম। গোপালনগর স্কুলের ছাত্রেরাথিয়েটার করচে আজ। আমাদের গাঁ থেকে মেয়েরা দেখতে আসবে। ট্রেনে যখন বনগাঁ আসচি তখনো আমার অদ্ভুত আনন্দ। গাছের সারি ওপর দিয়ে পারঘাটার জলের ওপারে আমাদেরগাঁয়ের দিকে চেয়ে ভাবচি, সবাই এখন কি করচে? খুকুএখন কি করচে? হয়তো রান্নাঘরে বসেআছে এতক্ষণ, কারণ আজ কাকার তিথি উপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজন হয়েচিল বাড়িতে ওবেলা, এবেলা বাসি পায়েস, ভাত-তরকারি নিশ্চয়ই আছে, তাই সে বসে আছে। ইন্দু এতক্ষণ বারান্দায় ছেড়া মাদুর পেতে একা বসে আছে। ওরা বেশ আছে।

ভাবতে ভাবতে বনগার ট্রেন এসে দাঁড়াল। প্ল্যাটফর্মে আমার কাকার ছেলে লালমোহনলুচি-সন্দেশ বিক্রি করছে। ও এখানে আছে অনেকদিন, লেখাপড়া শেখেনি, গরিবের ছেলে, ওই কাজই করে।

একটু পরে কলকাতার ট্রেন এল—আমি সারাপথ কেবল ভাবছিলুম, এই ক'দিনের কথা, আজ সারাদিনের কথা।খুকুকতবার এল, সেকথা কেবলই শুক্রতারার দিকে চেয়ে ভাবি, ওখানেও কি এমন বনশ্যাম পল্লী আছে, তার ধারে ছোট্ট গ্রাম্য নদী বয়ে যাচ্ছে, কত মাধবী রাত্রে, কত বর্ষণমুখর আষাঢ় প্রভাতে, কত বসন্তের দিনে গাছে গাছে প্রথমমুকুল আবির্ভূতহবার সময়ে, ওদের দেশেও চোখে চোখে লোকে কত কথা বলে, কত স্নিগ্ধ মধুর ভাব ওবাণীর বিনিময় ? শুক্রতারা নাকি শুধুই বরফের দেশ, সাত হাজার ফুট উঁচু হয়ে গ্লেসিয়ারবরফের স্তর জমে আছে গ্রহের ওপরে।

ভাবতে ভাবতে ট্রেন এসে দাঁড়াল দমদমা গোরাবাজারে। অপূর্ব সরস্বতীপূজার ছুটি শেষ হল। অনেকদিন মনে থাকবে এদিনগুলোর কথা।

সেদিন চন্দননগরে গিয়েছিলুম সাহিত্য-সম্মেলনে। এখান থেকে মোটরে সজনীদেরসঙ্গে গেলুম। উত্তরপাড়া, বালি, কোন্নগর প্রভৃতি শহরের মধ্যে দিয়ে—গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে পথ। অনেকদিন এপথে যাওয়া হয়নি, সেই অনেকদিন আগে একবার শ্রীরামপুরে গিয়েছিলুমমোটরবাসে এপথে। সভামণ্ডপে অনেকের সঙ্গে দেখা হল, নীহার রায় বিলাত থেকে ফিরেচে। সুনীতিবাবু বল্লেন, সেদিন কনভোকেশনের দিন আপনি কোথায় গেলেন? আপনাকে খুঁজলুম, আর দেখা পেলাম না। প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটটার কাছে কনভোকেশনের দিনে সুনীতিবাবুর সংঘে দেখা হয়েছিল, তারপর আমি তাকে হারিয়ে ফেললুম। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসভার উদ্বোধনকরেই চলে গেলেন। আমি গেলুম আহার করতে। তারপর রবীন্দ্রনাথের বোটে তার সঙ্গে দেখাকরতে গিয়ে দেখি অমল হোম, নীহার রায় সেখানে বসে। বাগান সম্বন্ধে অনেকক্ষণ কথাবার্তাহল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুনীতিবাবুর। স্যার যদুনাথ সরকার এলেন বিকেলের দিকে।রবীন্দ্রনাথের বোটটা বড় চমৎকার। মেঘ করেচে আকাশে। ও-পারের মেঘে-ভরা আকাশটাবেশ দেখা যাচ্ছিল। অনেকদূরের একটা গ্রাম এই সান্ধ্য-আকাশের তলায় কেমন দেখাচ্ছে! ওখান থেকে আমরা মতিলাল রায়ের প্রবর্তক সংঘে গেলুম। ফাদার দোঁতেন আমাদের সঙ্গেমিশল এসে সজনীদের গাড়িতে। ফাদার দোঁতেন জনৈক পাদ্রী, কেবল বাংলা জানে। সন্ধ্যারপরে আমরা আবার বালি, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়ার মধ্যে দিয়ে কলকাতায় ফিরি।

আজ মাঘীপূর্ণিমা। টালিগঞ্জের খাল পার হয়ে সেই যে সুশীলেশ্বরী আশ্রমে আর বছর গিয়েছিলুম, এবারও সেখানে গেলুম। গাছে গাছে আমের বউল হয়েচে, ঘেঁটুফুল ফুটেছেজামতলায়, বাতাবীলেবু ফুলের গন্ধ পথে, কোকিল ডাকচে। আর বছরের সেই ইন্দুদিদি আছেন, তিনি ঘরের মধ্যে বসিয়ে বাড়ির ছেলের মতো যত্ন করে

খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ালেন। বহু মেয়ের ভিড়। কলকাতার উপকণ্ঠে এই নিভৃত পাড়াগাঁয়ের দেবালয়টি আমার বেশ লাগল।

বসন্তের প্রথম দিনগুলিতে আকাশে খররৌদ্র, নতুন ফোটা ফুলের দল মনে কি একটা অপূর্ব আনন্দ দেবার আশা দেয়, বিশেষ করে এই নীল আকাশ। সেদিন দুপুরে খয়রামারির মাঠেএকা বসে বসে বসন্ত-দুপুরের নীল আকাশ আর খররৌদ্র ভোগ করছিলুম। মাঠের মধ্যেফুল-ফোটা শিমুলগাছগুলো সমস্ত পটভূমিকে এমন একটা শ্রী দান করে, তা আর কোনো গাছ পারে না, খানিকটা পারে শীতকালের ছোট এড়াঞ্চির ফুল। আমার মনে হয় ওরা গ্রাম্য প্রকৃতিরঘরোয়া ভাবটা কাটিয়ে বৃহত্তর পৃথিবীর বৃহত্তর ভূমিশ্রীর সঙ্গে ওকে এক করিয়ে দেয়—মনেএনে দেয় আফ্রিকার ট্রপিক্যাল অরণ্যের কথা, দক্ষিণ আমেরিকার আধ-মরু আধ-জঙ্গলে-ভরা জায়গার কথা—নানা বিরাট, জনহীন, বহুবিস্তীর্ণ প্রাকৃতিক রাজ্যের ছবি। ওতেই এত ভাল লাগে দিগন্তরেখার রাঙা ফুলফোটা শিমুল গাছ, অথবা অর্ধ-শুষ্ক খড়ের মাঠে ছোটখাটো ঝোপের মধ্যে থেকে একা উঠেছে একটা বড় শিমুল গাছ—তবে শেষেরটা ভারী অদ্ভুত। মাঠযদি অমন দেখি, তবে সেখানে বসে সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারি। মানুষের মন বড় অদ্ভুতজিনিস। লোকে মুখে যে কথাই বলুক, বা চিঠিতে যে কথাই যাকে লিখুক, তার মন সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে। মুখের কথায় আর মনের কথায় এই জন্যেই মিল প্রায় হয় না।

হরিনাভি স্কুলের ছেলেরা ওদের re-union এ এসেছিল বলতে, ওদিকে মণিবাবুরবাড়িও নিমন্ত্রণ ছিল, দুই কারণে এদিন রাজপুর স্টেশনে নেমে হরিনাভি গেলাম। বসন্তে গ্রাম্য-শোভা দেখাই ছিল আমার আসল উদ্দেশ্য। তাই খররৌদ্র-দুপুরে বেগুনদের বাড়ি থেকেবেরিয়ে পাড়ার মধ্য দিয়ে যে পথটা গিয়ে হরিনাভি স্কুলের কাছে মিশল, ওই পথটা দিয়েগেলুম নেমে। খুব আম্র মুকুলের সৌরভ, লেবু ফুলের গন্ধ, ঘেঁটুবনের শোভা, কোকিলেরডাক, মাথার ওপর দুপুরের রোদ ঠিকরে পড়া নীল আকাশ। আপনমনে যাচ্ছি, কতকালেরপুরোনো পথ, কতবার এ পথ দিয়ে এসেচি গিয়েচি, যখন হরিনাভি স্কুলে মাস্টারি করতুম। ফণিবাবুদের বাড়ি নিমন্ত্রণ সেরে স্কুলে এলুম। প্রিয়নাথ ব্রহ্মচারী আমাদের বাল্যকালে স্কুলইনস্পেক্টর ছিলেন, তাকে দেখলুম অনেক কাল পরে। স্কুলের ওদিকের আকাশটা আমার তখন-তখন বড় প্রিয় ছিল, আর পাঁচিলের ওদিকের গাছপালা, সভা ছেড়ে আমি তাই দেখতে উঠে গেলাম। তারপর ভোম্বলের সঙ্গে বেরিয়ে বৈকালের ছায়ায় একটা ছায়াভরা পথ দিয়েহাঁটতে হাঁটতে একটা মাঠের ধারে এসে বসলুম। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে, দুজনে বসে পুরানো দিনের গল্প কতই করি। ওখান থেকে উঠে আরো কিছুদূরে এসে একটা পুরোনো ভাঙাদোলমঞ্চের কার্নিসের ওপর সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকি। দোলমঞ্চটার চারিধারে ভাঙা মন্দির, পাড়ার মধ্যে বলে চারিদিকেই আমবাগান, তার তলায় খুব ঘেঁটুফুল ফুটেছে, একধারে একটাকামিনী ফুলের ঝাড়। নানা ফুলের সম্মিলিত সৌরভে সন্ধ্যার বাতাস ভরপুর। হুতুম-পেঁচাডাক্‌চে প্রাচীনগাছের কোটরে। দু-একটা নক্ষত্র উঠেচে আমবনের ওপরে আকাশে। অন্ধকার হয়েগেল। একটা পুকুরের ধারে এসেও খানিকটা বসি।

কাল সন্ধ্যাবেলা নীরদবাবুর বাড়ি গিয়েছিলুম দুপুরে, প্রমোদবাবু অনেক দিন পরেকলকাতায় এসেচে। অনেক গল্পগুজব করলুম। একদিন হিজলী যাওয়ার কথাও হল। ওখান থেকে পশুপতিবাবুকে ফোন করে জানলুম দিলীপ রায় কলকাতা এসেচে এবং আজ থিয়েটার রোডে ডা. প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বাড়ি সন্ধ্যায় গান হবে। হেমেনদা এলেন তার মেয়েদের নিয়ে। ওঁদেরই মোটরে ওঁদের সঙ্গে প্রতাপ মজুমদারের বাড়ি গেলুম। দিলীপের সঙ্গেও দেখাগেটের কাছেই। ওর সঙ্গে কখনো চাক্ষুষ আলাপ হয়নি, যদিও চিঠিপত্রে আজ আট-ন' বছরেরআলাপ। নাম শুনে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল, কি চমৎকার উদার স্বভাব দিলীপের! বড় ভাললাগে ওকে। বহু বিশিষ্ট নরনারী এসেছেন দিলীপের গান শুনতে। আজ আট-ন' বছর পরেদিলীপ কলকাতায় এল। ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার, জীবনময় রায়, সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়,বুদ্ধদেব বসু, শচীন্দ্রদেব বর্মণ, উমা মৈত্র, 'পরিচয়' কাগজের দল- অনেককেই দেখলুম। কেবল মণিবোসকে পাওয়া গেল না। আব্বাস তায়েবজীর

মেয়ের কৃষ্ণবিষয়ক গানটি আমার সকলের চেয়ে ভাল লাগল। আসল গানটা হিন্দিতে ছিল, দিলীপ বাংলাতে অনুবাদ করেছে। কি চমৎকারগাইচে দিলীপ আজকাল! বাংলা গানের অমন ঢং কোথাও আর কখনো শুনিনি।

কাল দিনটা খুব ছুটোছুটি গিয়েচে। চারুবাবু হাইকোর্টের জজ হয়েছেন বলে তাঁকেআমাদের স্কুল থেকে অভিনন্দন দেওয়া হল। কালই আবার দিন বুঝে ইউনিভার্সিটিতে Examiners' meeting-স্কুলে ফণিবাবু এসেছিলেন, আমাদের স্কুল ছেড়ে গিয়ে পর্যন্ত আসেননি। তারসঙ্গে গল্প করে চলে এলুম ইউনিভার্সিটিতে। সেখানে মণি বোস,প্রমথ বিশী, জসীমউদ্দিন, গোলাম মুস্তাফা, মনোজ বসু, বারীন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জনবাবু সকলের সঙ্গে দেখা। সুনীতিবাবুপ্রধান পরীক্ষক এবারও। ওখানকার কাজ শেষ করে সুধীরবাবুদের বইয়ের দোকানে সবাই মিলেগিয়ে খানিকটা আড্ডা দিলাম। তারপর আবার এলুম স্কুলে। চারুবাবুর অভিনন্দন সভা তখন জোর চলছে। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা ছিলুম। তারপর এক মাস্টারমশাই আর আমি এসেসেন্ট জেমস্ স্কোয়ারে একখানা বেঞ্চের ওপরে বসে অনেক পুরোনো কথার আলেচনা করলুম।রসিদ কি করে আমাদের অনিষ্ট করতে চেয়েছিল। ক্লাজির সাহেবকে আমরা কেমন সাবধানকরে দিয়েছিলুম এই সব কথা।

ইস্টারের ছুটিতে বারাকপুরে কাটাইনি অনেকদিন। এবার গিয়েছিলুম। আমার যাওয়ারপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঘেঁটুফুল দেখা। প্রথম দেখলুম বনগাঁয়ের খয়রামারির মাঠে—কি অজস্রঘেঁটুবন সেখানে! এর আগের সপ্তাহেও যে তিনদিন ছুটি ছিল, তাতেও বনগাঁ গিয়ে রোজবিকেলে রাজনগর ও চাঁপাবেড়ের মাঠে যেতুম বেড়াতে। ফিরবার পথে অপূর্ব জ্যোৎস্নায় একটিঘেঁটুবনের কাছে বসে থাকতুম। পশ্চিম আকাশে শুকতারা জ্বল্‌জ্বল করত, তেতো তেতোঘেঁটুফুলের গন্ধ। পাখি ডাকত, কোকিল ও পাপিয়া। বউকথাক'র এখনো আমদানি হয়নি।বারাকপুরে ঘেঁটুবন কোথাও তেমন নেই, কেবল আছে সলতেখাগী আমতলায়, বরোজপোতারডোবার গায়ে আর সাজিতলার পথে। সকলের চেয়ে বেশি পেলুম আসবার সময়ে চালকীমুসলমান পাড়ার ওই পথটায়।

ক'দিন চমৎকার কেটেছে। অবিশ্যি ম্যাট্রিকের কাগজ দেখতে ব্যস্ত থাকার দরুন বড়কোথাও বেরুতে পারতুম না। একদিন গোপালনগর হাটে গিয়েছিলুম, সঙ্গে ছিল জগো, গুটকেও জীবু। ও পথেও কিছু কিছু ঘেঁটুবন আছে বড় আমবাগানের কাছে। বৈকালে প্রায় কুঠীর মাঠেবেড়াতে যেতুম বেলা পড়ে গেলে। চাঁদ উঠবার সময়ে নদীর ধারে মাঠে একা একা কত রাতপর্যন্ত বসে থাকতুম। জ্যোৎস্নায় নদীজলে নামতুম, স্নান করে আলোছায়ার জালবোনা পথেমেয়েদের পিঠে দেওয়ার ষাঁড়া গাছের তলাটি দিয়ে বাড়ি ফিরতুম। দুপুরে ও বিকেলে কত কিগন্ধ দু'ধারের মাঠে। রোদপোড়া মাটির গন্ধ, ঘেঁটুফুলের গন্ধ, শিমুলের গন্ধ, শুকনো পাতালতারগন্ধ, টাটকা-কাটা কাঠের গন্ধ-খয়রামারির মাঠে বনমল্লিকার ঘন সুগন্ধ—প্রভৃতির নানাসুবাসে মন ভরে ওঠে।

কাল মনু রায়দের গাড়িতে বারাকপুর থেকে বনগাঁ ফিরলুম। রাত্রের ট্রেনে কলকাতা।

চৈত্রসংক্রান্তির দিন গিয়েছিলুম বারাকপুরে। একদিন চাঁপবেড়ের মাঠে সন্ধ্যা পর্যন্তবসেছিলুম, তারপর এসে ফুটবল খেলার মাঠটাতে বসলুম। দুপুরবেলা বারাকপুর গিয়ে পৌঁছই।ঝনঝন্ করচে রোদ। খুকুরা ঘুমুচ্ছিল। ওদের ওঠালুম, তারপর অনেকক্ষণ বসে গল্প করি। ফণিবাবু ও যতীনবাবু গাড়ি করে গেল আমাদের গাঁ দেখতে। তাদের ঘুরিয়ে নিয়ে এলুম কুঠীরমাঠ।

এবার শিমুলের গন্ধ ভাল লেগেছে। ঘেঁটুফুল এখনো আছে—তবে খুব কমে গিয়েচে।কোনো কোনো বনে কিন্তু নতুন ফুটেচে তাও দেখতে পেলুম।

কাল রাত্রে হেমেন রায়ের বাড়ি দিলীপ রায়ের গান শোনার নিমন্ত্রণ ছিল, তাই আমরা অনেকে গিয়েছিলুম। গণপতিবাবু ও নীরদবাবুরাও ছিলেন। হেমেনদা অনুযোগ করলেন, মঙ্গলবারে পেনিটির বাগানবাড়িতে আমরা তাকে কেন নিয়ে গেলুম না! দিলীপ আসতে বড় দেরি করল। এল যখন প্রায় রাত ন'টা। বড় সুন্দর লাগল আব্বাস

তায়েবজীর মেয়ের সেই হিন্দিগানের অনুবাদটা—দিলীপের মুখে সেদিন যেটা থিয়েটার রোডে শুনেছিলুম। কাল ওরমেজাজ আরো ভাল ছিল, কি চমৎকারই গাইলে!

কলকাতায় কিন্তু সব সময়ই থাকা আমার বড় খারাপ লাগচে। চারিদিকে দেওয়াল তুলেএখানে মনে প্রসারতা ও আনন্দ বন্ধ করে দেয়। সব সময়েই কোনো না কোনো ঘরের মধ্যে আছি, হয় স্কুল, নয় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, নয় মেস, নয় কোনো বন্ধুর বাড়ি, নয়তো সিনেমা। এত ঘরের মধ্যে থাকতে পারিনে, দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয় এতে। সামনে গ্রীষ্মের ছুটিআসচে—এই যা একটা আনন্দের কথা।

কাল কাগজের বোঝা সুনীতিবাবুর বাড়ি গিয়ে নামিয়ে চলে গেলুম দক্ষিণাবাবুর বাড়ি।হেঁটেই গেলুম। মনে ভারী স্ফূর্তি-কাগজগুলো দেখতে সত্যিই এই দেড় মাস কি কষ্টই নাগেচে—আর এই রোদ্দুরে। ফিরবার সময়ে আলিপুর হয়ে বাসায় ফিরি।

এইমাত্র পানিতর থেকে ফিরে এলুম। প্রসাদের বউ-ভাত গেল কাল। আজ সকালে আমি কিরণবাবুদের সঙ্গে রওনা হয়েছিলুম। কিছুদূর নৌকো আসতে না আসতেই এল খুব মেঘ, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ঝড়। আমরা নেমে ইটিন্ডার স্কুলঘরে আশ্রয় নিলুম। কিরণবাবুর মেয়েদের ধরেনামালুম একে একে। তারপর বৃষ্টি থামলে ওখান থেকে বার হয়ে এসে নৌকোয় বসিরহাটপৌঁছেই ট্রেনখানা পাওয়া গেল। পানিতরের খালের ঘাট থেকে নৌকো চড়ে অনেকদিনআসিনি।

ক'দিন বেশ আনন্দে কাটিয়েছি। বুধবার দিন গিয়েছিলুম সকালের ট্রেনে। নৌকোএসেছিল ঘাটে। বাড়ি পৌঁছে দেখি আন্নাদিদি ইত্যাদি এসেচে। সেই সন্ধ্যাবেলা পিসিমা ওসুশীল পিসেমশায় এলেন, আমি তখন নদীর ধারে বসে আছি, সঙ্গে পানিতরের কয়েকটিছেলে। প্রথম প্রথম যখন পানিতর আসতুম, তখন এসব ছেলে জন্মায়নি। রাত্রে দুই ঘরেরমধ্যবর্তী চাতালে বসে পিসিমা, হেনাদিদি ওদের সঙ্গে গল্প ও আড্ডা। প্রসাদ বসে বসেগ্রামোফোন বাজাতে লাগল। অনেক রাত্রে ছাদের ওপর শুই—কারণ কোথাও শোবার জায়গা নেই।

কি বিশ্রী বৃষ্টি আরম্ভ হয়েচে কাল থেকে! কাল সুপ্রভার ওখানে গিয়ে শুনি সে তখন নেই। হাতে কোনো কাজ ছিল না। এসে কাউন্সিল হাউসেরসিড়িতে বসে রইলুম। কিছু ভাল লাগে না—অন্যমনস্ক মন। তখন স্থির করলুম শিলং থেকে কাল সকালেই চলে যাব। অথচ কালই তো মোটে এসেচি—আর তার ওপর এই বিশ্রী আকাশ। গরম নেই তাই কি? এর চেয়েগরম ঢের ভাল ছিল যদি রোদ্দুর উঠত। যখনকার যা, তাই লাগে ভাল। সুপ্রভাকে চিঠি দেব বলেপোস্টাপিসে গিয়ে কতক্ষণ বসে রইলুম। পোস্টমাস্টার আসেই না। একটা লোক দরজির কাজ করছে, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলি বসে। এমন সময় দেখি আমার পুরনো ক্লাসফ্রেন্ড মনোরঞ্জন যাচ্ছে—তার সঙ্গে কাল সন্ধ্যায় ফার্মেসিতে সাক্ষাৎ হয়েছিল—আমার সঙ্গে দেখা হয়ে ও খুবখুশিই হল। কিন্তু আমার মন এই মেঘলায় যেন কিছুতেই ঠিক হয় না! পোস্টাপিস্ থেকে ফিরেশিলং ডেয়ারিতে দুধ খেতে গেলুম। বেশ ভাল দুধ দেয়, পরিষ্কার ঘরটা। জেল রোড আরপুলিশ বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে মেঘাচ্ছন্ন লুম্ শিলং-এর দিকে চেয়ে ভাবলুম আমাদের গ্রামে এতক্ষণ রোদে তেতে উঠেছে চারিদিক। মাঠে সোঁদালি ফুল ফুটেছে, ইছামতী নদীতে এই গরমেনেয়ে খুব তৃপ্তি হবে। তীব্র গরম দূর করে হঠাৎ বেলা তিনটের সময় কালবৈশাখীর মেঘউঠবে, ঝড় শুরু হবে, গরম পড়ে যাবে, সবাই আম কুড়ুতে দৌড়ুবে।

এই এখন বসে লিখচি, টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়েচে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। আমার ঘরেরদরজা দিয়ে দূরে পাহাড়ের চূড়া, মেঘে ঢাকা কয়েকটি পাইন গাছ সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে, হোটেলের চাকর ৩নং ও ৪নং ঘরের বাবুদের জন্যে গরম জলের বন্দোবস্ত করচে, জোড়হাটেবাড়ি এসে এক আসামী ভদ্রলোক আমার সঙ্গে গল্প করছেন। কি বিশ্রী বৃষ্টি! এখানে বসেরৌদ্রালোকিত বাংলাদেশ, তার মাঠ, কুঠীর মাঠে বিকেলের ছায়ায় সোঁদালি ফুলের মেলা, সারাদিনের গরমের পরে জ্যোৎস্নারাত্রে ইছামতীর স্নিগ্ধ জলে একা নির্জন ঘাটে নাইতে নামা, খুকুর আস্তে আস্তে আসা ওদের বাড়ির বেড়ার

পাশ দিয়ে—এসব স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।বৃষ্টি জোরেই নামল—শীত বেশ। আমাদের দেশের অগ্রহায়ণ মাসের মতো শীত। কলকাতাওএর চেয়ে ঢের ভাল, সেখানে দুপুর রোদে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি যাওয়া চত একমাস মর্নিংস্কুলের সময়। বউঠাক্‌রুণদের বাড়িতে চা পান, কমল সরকারের গান—সেও যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়। কাল সন্ধ্যায় একবার ওয়ার্ড লেকে বেড়াতে গিয়েছিলুম, সেই ট্রিফার্ন দুটো দেখলাম।খাসিয়া মেয়েরা বেড়াতে এসেচে। ওখানে দাঁড়িয়ে কাল কেবলই মনে হয়েছে সুপ্রভা এখানেনেই। একবার মনে হল, সেদিন যে পানিতরে বেশ ক'দিন কাটিয়ে এসেছিলুম সেকথা। সেইচাঁদা-কাটার বন, সন্ধ্যায় একটা তারা উঠল। তাই নিয়ে ওখানকার ছেলেদের সঙ্গে সেইনক্ষত্রজগৎ সম্বন্ধে আলোচনা।

বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে একঘেয়ে। থামবার নাম নেই। এ যে শ্রাবণ মাস। গরম আর সূর্যেরআলোর জন্যে মন হাঁপাচ্ছে। লাইউমক্রাতে সুনীলবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে গেলেও হত—কিন্তু সুপ্রভা না থাকাতে আমার কোনো কাজে উৎসাহ নেই। কে বেরোয় এই বৃষ্টিরমধ্যে? ভেবেছিলুম একবার শিলং পিক-এ উঠব—তাও গেলাম না। মজা এই যে এখানেএতগুলো লোক এসেচে হোটেলে—সবাই কেবল বসে বসে খাচ্ছে আর শরীরসারাচ্চে—কোনো কিছু দেখবার উৎসাহ নেই ওদের। খাসিয়া ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখেবড় সাহেবী-ভাবাপন্ন হয়েচে। ওরা সাহেবদের ধরনে হাত নেড়ে আনন্দ জানায় কাল সনৎ কুটিরের সামনে এক খাসিয়া ছোকরা তার বন্ধুকে বল্লে—Cheerio! কেন বাবু, তোদেরমাতৃভাষায় কোনো কথা নেই? গির্জা থেকে কাল রবিবার সন্ধ্যার সময় অনেকগুলো খাসিয়ামেয়েপুরুষ ফিরছিল। নিজের ধর্মও এরা ছেড়েচে।

এই শীত আর বৃষ্টির মধ্যে নাইবার উৎসাহ হচ্ছে না। জোড়হাটের ভদ্রলোকটি তেলমাখচেন। আমায় বল্লেন, নাইবেন না? বল্লাম—মাথাটা ধোবমাত্র। আজ এখন চলে যাব—বড়ঠাণ্ডা লাগবে সারাদিন।

Rain, Rain, go to Spain—কি একঘেয়ে পাইন বন আর বৃষ্টি, সূর্যের আলো নইলেসুন্দর বিকেলের ছায়া নামে না, পাখি ডাকে না, ফুলের সৌন্দর্য থাকে না—একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দে মন খারাপ হয়ে যাচ্চে। দূরের পাইনবনাবৃত পাহাড়ের চূড়াটা বৃষ্টিতে অপূর্ব হয়ে উঠেছে।

এখানে এসেচি অনেকদিন, শিলং থেকে ফিরেই। কিন্তু এতদিন লিখতে পারিনি। এসেইপ্রথমে একদিন পায়ে হেঁটে গিয়েছিলুম বাগানগাঁয়ে পিসিমার বাড়ি। কাঁচিকাটার খেয়া পার হয়েসেদিন গেলুম গাড়া-পোতার বাজারে, গিয়ে একটা দোকানে খানিকটা বসে রইলুম, কারণ সে সময়টা বড় বৃষ্টি এল। তারপর চলে গেলুম পাটশিমলে। সন্ধ্যার আগে বাগানগাঁ। ফিরবার দিন খুব বেলা থাকতেই মোল্লাহাটির খেয়াঘাটে এসে পৌঁছে গেলাম। জামদা'র বাঁওড় পার হলুমদড়াটানায় খেয়ায়। পার হয়েই—এপারটা বেশ ছায়াভরা চমৎকার জায়গা-খানিকক্ষণ বসেতারপরে রওনা হই। সন্ধ্যার আগে এসে বাড়ি পৌঁছে গেলুম। একটা বটগাছের তলায়অনেকক্ষণ বসেছিলুম মোল্লাহাটির ওপারে—সেটা বড় ভাল লেগেছিল।

দিন বেশ কাট্‌চে। গোপালনগরের বারোয়ারি দেখছি প্রতি বৎসরের মতো—কাল রাত্রেও হয়ে গেল। কাল অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরেচি। একদিন খিনুদের ওখানেও গিয়েছিলুম।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এবার যেন বেশিদিন এখানে ভাল লাগচে না। মন উড়ু উড়ু করচে, কেন তা কি জানি। জীবন এখানে অনেকটা একঘেয়ে, সেইজন্য কি ? কিন্তু নির্মলতা ও প্রাকৃতিকশোভাসৌন্দর্যে এর তুলনা নেই বলেই তো এখানে আসা। এবার সেটাও যেন ভাল লাগচে না অন্যবছরের মতো—তার একটা প্রধান কারণ আমি বুঝতে পেরেচি। কলকাতায় যে কর্মবহুল জীবন কাটিয়ে এসেচি এবার, তার তুলনায় এখানকার অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় জীবনযাত্রা মনকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে। আমি মাঠের মধ্যে থাকতে ভালবাসি। তবে মোটে সেদিন কলকাতা থেকে এসেচি বলে এই রকম লাগচে—দীর্ঘদিন কাটালে অভ্যস্ত হয়ে যাবে এসবে। কথা বলবার লোকের অভাবসকলের

চেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে এখানে। শ্যামাচরণদা'র ছেলেটি সেদিন মারা গেল, আমরা সবাই যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলুম তাকে বাঁচাবার। সেজন্যেও মনে একটা কষ্ট আছে।

বিকেলের দিকে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলুম। আজ খুব বৃষ্টি হয়েছিল দুপুরে। তাই পথেএকটু কাদা হয়েছিল—এত ফুল এত গাছপালাও কুঠির মাঠে! সর্বত্রই সৌন্দর্য। এখান থেকেআরম্ভ করে বাগানটা পর্যন্ত সমস্ত জায়গাটাই একটা প্রকাণ্ড বড় পার্ক। কত বিচিত্র লতাবৃক্ষগুল্মের সমাবেশ, কত বিচিত্র বন্যফুলের সমারোহ—কত কি পাখির ডাক, বাঁশগাছের সারি, প্রাচীন বট-অশ্বত্থ—সবই সুন্দর। মনটা ভার ছিল, একটা ছোট বাগাছের গুঁড়ির ওপরগিয়ে কতক্ষণ শুয়ে রইলুম। আমার চারিপাশে সোঁদালি ফুল ঝুলচে, একদিকের গাছপালার ফাঁকে কি সুন্দর ময়ূরকণ্ঠী রংয়ের নীল আকাশ, বসে কত কী ভাবলুম। এই যে বিরাটবিশ্ব-চরাচর, এতে কত গ্রহ, কত উপগ্রহ, কত নীহারিকারাজি, কত Globular cluster, কতনাক্ষত্রিক বিশ্ব, এদের মধ্যে কত আমাদের মতো প্রাণী রয়েচে। Jeans-এর দল যাই বলুন, আমি বিশ্বাস করতে পারিনে যে শুধু আমাদের এই পৃথিবীতেই বুদ্ধিমান প্রাণী আছে, আর কোথাও নেই। তা যদি থাকে, ধরেই নেওয়া যাক, তবে তাদের মধ্যে অনেকে কষ্টপাচ্ছে—আজ আমি তাদের দলের একজন। দুঃখে তাদের সঙ্গে আমি এক হয়ে গিয়েচি।

সকালবেলা কি বিশ্রী বর্ষা নেমেছে। আমার ঘরের বাইরে বড় পাতাওয়ালা গোঁড়ালেবুর গাছটাতে থোকা থোকা সাদা ফুল ফুটেছে। মনটা ভাল না, বসে বসে লিখছিলুম বাইরে বসে, হঠাৎ ভয়ানক বৃষ্টি আসাতে ঘরের মধ্যে এসে বসেচি। বিলবিলের দিকে জলের তোড় ছুটচেকলকল শব্দে। ন'দিদি ও বড় খুড়িমা ওদের ভুতোতলায় আম কুড়িয়ে বেড়াচ্চে জলে ভিজে।খুকুকে বড় একটা দেখা যাচ্ছে না আমতলায়।

বিকেলে মেঘ-থমকানো আকাশের তলা দিয়ে বেড়াতে গেলুম সুন্দরপুরে প্রমথ ঘোষেরবাড়ি। সারা পথটা আকাশে মেঘের কি শোভা! কত পাহাড়পর্বত, আকাশের কি চোখ-জুড়ানো অদ্ভুত নীল রং! নীচে বর্ষাসতেজ শ্যামল গাছপালা, নতুন আউশ ধানের কচি জাওলা বেরিয়েছেমাঠে মাঠে, মরগাঙের ধারে, বাঁওড়ের ওপারে! আষাঢ় মাসে এদিকে প্রকৃতি যে রূপ পরিগ্রহ করে, তার তুলনা কোথাও বুঝি নেই। শিলং-এর পাইন বন এর তুলনায় নিতান্ত একঘেয়ে। জ্যোৎস্নাবেশ যখন ফুটেছে, তখন নদীর জলে এসে নামলুম। জ্যোৎস্না চিকচিক করচে জলে, চাঁদ হাজার টুকরো হয়ে জলের মধ্যে খেলা করচে—এখনো নদীপারে বনে কোথায় বউ-কথা-ক' ডাকছে, নদীর ধারের সোঁদালি গাছগুলোতে এখনো ফুলের ঝাড় ঝরে পড়েনি। কত গাছ, কত লতা, কতফুল, কত পাখির খেলা, আকাশে রঙের মেলা, কি ঘন সবুজ চারিধার। নক্ষত্র চোখে পড়ে না আকাশে, হালকা মেঘের পরদার আড়ালে দ্বাদশীর চাঁদখানি মাত্র দেখা যাচ্চে।

এতদিন পরে আবার বারাকপুর বড় ভাল লাগচে। মানুষ এখানে তেমন নেই বটে কিন্তুপ্রকৃতি এখানে অপূর্ব লীলাময়ী। প্রকৃতিকে নিয়ে থাকতে পার তো এমন জায়গা আর নেই।কলকাতার কাজ আর মানুষ—এখানকার প্রকৃতি, এই দুইয়ের সম্মিলন যদি সম্ভব হত! রোজ কাজকর্ম সেরে কলকাতা থেকে দ্রুতগামী মোটরে বেলা ৫টার সময় যদি বেলেডাঙার পুলেরমুখে ফিরে আসা সম্ভব হত এই আষাঢ় মাসের দীর্ঘ দিনের শেষে, জীবনটা সত্যি উপভোগকরতে পারতুম। নিজের একখানা এরোপ্লেন থাকলে চমৎকার হত। সমস্তদিনের হৈ-চৈ ওকর্মক্লান্তির পরে শান্ত অপরাহ্ণে বর্ষণক্ষান্ত আকাশের তলে কাঁচিকাটার পুলের কাছে মরগাঙেরএপারে সবুজ ঘাসভরা মাঠে উড়ি ধানের ক্ষেতের ধারে বসে থাকতে পারতুম—তবে Contrast-এর তীক্ষ্ণতায় প্রকৃতিকে ভাল করে বুঝবার সুযোগ হত—একে উপভোগ করতে পারা যেত আরো গভীর ভাবে।

আজ বৈকালের দিকে খুব ঝমঝম বর্ষা। আমার একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা হল। সন্ধ্যার আগে মাঠে বেড়াতে গিয়ে যেন মনে হল এই আকাশ, রঙীন মেঘরাজি, সবুজ বাঁশবন—এদেরসবটা জড়িয়ে যে বিরাট বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতি,

তা হৃদয়হীন নয়। তা ভালবাসে, দয়া করে। দুঃখেসহানুভূতি দেখায়। আজ কোনো একটা বিষয়ে সেটা আমার অভিজ্ঞতা ঘটেছে। সে অভিজ্ঞতাসত্যিই অপূর্ব।

আষাঢ় মাসের এ দিনগুলি আমার বড় পরিচিত। বাল্যকাল থেকে চিনে এসেচি এদের। মেঘান্ধকার আকাশ, আর্দ্রবাতাস, বাঁশবনে পিপুললতা ও অনন্তমূলের নূতন চারা বার হয়েছে, ওলের চারা বার হয়েছে, যখনই এমন হয়, তখনই আমার গ্রীষ্মের ছুটি ফুরিয়ে যায়, ছেলেবেলা থেকে দেখে আসচি। কিন্তু একটা তফাত ঘটেচে, আগে এই নবোদ্‌গত পিপুলচারার সঙ্গে একটাদুঃখ ও বিরহের অনুভূতি জড়ানো থাকত—এখন আর সেটা হয় না। এখনমনে হয় কলকাতা গেলেই ভাল হয়, অনেকদিন তো দেশে কাটল।

কতবার এই নব বর্ষা, এই আষাঢ় মাস আসবে যাবে। যেমন আমার জীবনে এরা কতবার এসেচে গিয়েচে। কতবার কাঁটাল পাকবে, বাঁশবনে অনন্তমূলের চারা বেরুবে, ফলবিরলআমবাগানে হাজারি জেলে ও হাজু কামারনী আম কুড়িয়ে বেড়াবে ভোরে। এসব সুপরিচিতদৃশ্য আরো কতবার দেখব। আমাদের গ্রামটুকু নিয়ে যে জগৎ, এ দৃশ্য তারই। অন্য কোথাওকারলোকের কাছে এসব হয়তো সম্পূর্ণ অপরিচিত তাও জানি, তারা কখনো পিপুললতাই দেখেনিহয়তো।

তারপর আমি চলে যাব, হাজারি জেলেনী চলে যাবে, আমার সমসাময়িক সকল লোকইচলে যাবে, তখনো এমনি আষাঢ়ের নতুন মেঘ জমবে মাধবপুরের ঘরের ওপরে, আর্দ্র বাঁশবনেএমনিধারা পিপুলচারা বেরুবে, বউ-কথা-ক' পাখির ডাক বিরল হয়ে আসবে বকুলগাছটাতে, গাঙের জলে ঢল নামবে—শুধু আমার এই আবাল্যসুপরিচিত জগৎ তখন আর আমারচৈতন্যের মধ্যে থাকবে না।

সবদিনে মানুষের মনে সমান আনন্দ থাকে না জানি, কিন্তু আজকার দিনের যত আনন্দ আমি কতকাল যে জীবনে পাইনি! প্রথম তো সকালে উঠেই দেখলুম আকাশ ভারী পরিষ্কার—নিজের ঘরের দাওয়ায় খানিকটা বসে মুসলমান মাস্টারটির সঙ্গে গল্প করে বাঁওড়েরধারের বটতলার পথে একটু বেড়াতে গেলুম। এমন নীল আকাশ অনেকদিন দেখিনি।জেলেপাড়া ছাড়িয়েই ওই সরু পথটা দিয়ে যেতে যেতে বাঁশঝাড় থেকে একটা সরু কঞ্চি বেছেনিলাম হাতে নেবার জন্যে। বাঁশের কঞ্চির জন্যে এ আগ্রহটা আমার চিরকাল সমান রইল সেই বাল্যকাল থেকে। যেতে যেতে আমাদের মাথার ওপরকার নীল আকাশটার দিকে চেয়ে মনেহল আষাঢ় মাসের দিনে আকাশ এত নীল, এত নির্মেঘ, এ সত্যিই একটা আশ্চর্য ব্যাপার। রোদের কি রং ! বাঁওড়ের ওপারের আকাশ নিবিড় বট-অশ্বত্থের আড়ালে মাঝে মাঝে চোখেপড়ে। এই বাঁওড়ের ধারের বটতলার পথটা দিয়ে আজ আঠারো-উনিশ বছর কি তারও বেশি এমনি সকালে হাঁটিনি। বটগাছের একটা ডালে কাল খানিকক্ষণ বসেছিলুম, আজও সে ডালটায় বসব বলে গেলাম, কিন্তু আজ একটু বেলা হয়ে গিয়েচে বলে রোদ এসে পড়েচে সেখানে। একটা বাঁশের মাচা করেচে বটতলায় বাঁওড়ের ধারের দিকে। সেখানে বসে কি আনন্দ! আমায়এমনি উদ্ভ্রান্তের মতো বসে থাকতে দেখে কিন্তু কেউ কিছু ভাবে না—সবাই খুব ভালবাসে দেখলুম। আমি অনেককে চিনিনে, ওরা আমায় চেনে। একজন কাল বলচে—দাদাবাবু আমাদের দেখ বসে আছেন বটের শেকড়ে। দাদাবাবুর অজ্ঞার নেই গা। আজ একজন পথচলতি লোক, তার বাড়ি আরামডাঙায় পরে জানতে পারলুম, আমায় বসে থাকতে দেখে পাশে এসে বসল।

বল্লে বাবু, একটা ব্যারামে বড় কষ্ট পাচ্চি। প্যাটের মধ্যে ভাত খেয়ে উঠলি এমন শূলোয় যে আপনাকে কি বলব! কি করি বলুন দিকি বাবু?

সে এমন বিশ্বাস ও নির্ভরতার সঙ্গে প্রশ্ন করলে যেন আমি স্বয়ং ডাক্তার গুডিভচক্রবর্তী।

কি করি আমার কোনো ওষুধই জানা নেই—তাকে পরামর্শ দিলুম রানাঘাটে গিয়ে আর্চারসাহেবকে দেখাতে। মিশনারি হাসপাতালে পয়সা-কড়ি লাগবে না। মনে এমন দুঃখ হল, একটু হোমিওপ্যাথি জানলেও এইসব গরিব লোকের উপকার করা যায়। ভগবানের কাছে প্রার্থনাছাড়া আমি ওর রোগ সারানোর জন্যে আর কি করতে পারি!

ওখান থেকে উঠে মাঠের মধ্যে গেলাম। এক জায়গায় একটা কি চমৎকার লতাবিতান, ওপরে ডালপালায় ছাওয়া, মোটা লতার গুঁড়ি কাঠের মতো শক্ত হয়ে তার খুঁটি তৈরি করেছে।ওর মধ্যে বসে একটু পাখির ডাক শুনলুম, তারপর মাঠের মধ্যে এসে বাবলাগাছের মাথারওপরকার আকাশের অপূর্ব নীল রং দেখে সেখানটায় গামছা পেতে ঘাসের ওপর কতক্ষণ শুয়েরইলুম। সে যে কি আনন্দ, তা হয়তো আমি নিজেই কিছুকাল পরে অবিশ্বাস করব, কারণ ওসবঅনুভূতি মানুষের চিরকাল একভাবে বজায় তো থাকে না, পরে শুধু স্মৃতিটা থাকে মাত্র। মাথারওপরকার ওই ময়ূরকণ্ঠ রংয়ের আকাশ, ঘাসের নীচে এই বিচরণশীল পোকামাকড়, ছোট ছোট ঘাসের ফুল, ওই উড়ন্ত চিল, বটের ডালে লুকানো ওই বো-কথা-ক' পাখির ডাক, কত বিচিত্র বনলতা, বনফুল—ওই সূর্য থেকে পাচ্চে এদের জীবন, রং ও আলো। কিন্তু এই সবের পিছনে, সূর্যেরও পিছনে এই ভূতধাত্রী ধরিত্রীর সব রূপ-রস-গন্ধের পিছনে যে বিরাট অতিমানস শক্তির লীলা—তার কথা কেবলই এমনিদুপুরে নীল আকাশের দিকে চেয়ে ভাবতে ইচ্ছা করে। ভেবে কিছু ঠিক করতে হবে তার কোনো মানে নেই, এই ভাবনাতেই আনন্দ। তখন যেন মনে হয় এই বিশ্বের সঙ্গে আমি এক তারে গাঁথা—অদৃশ্য যে লতায় এই সব ফুল নিয়ে মালা গাঁথা হয়েচে, আমি তাদের দল থেকে বাদ পড়িনি, তাদেরই একজন—বিশ্বের সঙ্গে একটা যোগস্থাপিত হয় মনে মনে।

মনকে এভাবে তৈরি করে নেওয়ার সার্থকতা আছে, কারণ মনই সব, মন যে ভাবেপৃথিবীকে দেখায়, জীবনকে দেখায়—মানুষে সেভাবেই দেখে। মন দুঃখ দেয়, সুখ দেয়—মনকে তৈরি করে যে না নিতে পেরেছে, তার দুঃখ অসীম!

ওই লতাবিতানের মধ্যে আজ সকালে অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলুম—ভারী নিভৃত, ছায়াঘন স্থানটি। প্রকৃতি অনেক যত্নে একে যেন নিজের হাতে গড়েচে। কাঠবিড়ালী খেলা করছে, কত কি পাখি ডাকচে, পত্রান্তরাল থেকে একটু একটু রোদ এসে পড়েচে, ঠাণ্ডা মাটিতে বড় চমৎকার ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে, কেয়োঝাঁকা, ষাঁড়া, ডুমুর, কুঁচকাটার লতার সমাবেশে এইঝোপটা তৈরি—দুপুরের রোদে এই নিস্তব্ধ ঝোপের ছায়ানিবিড় আশ্রয়ে বসে বইপড়া কি লেখাবড় ভাল লাগে।

এবেলা থেকে বর্ষা নেমেছে। ইছামতীর ওপরকার আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। আজ কলকাতায় রওনা হব ভেবেছিলুম—কিন্তু এরকম বাদলা দেখে পিছিয়ে গেলাম।

আজ সারাদিন মনে একটা অপূর্ব আনন্দ—কাল চলে যাব, গ্রীষ্মের ছুটি তো ফুরিয়ে গেল। যা দেখচি, সবই বড় ভাল লাগছে। খুকু বার বার আসচে আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে, নানা ছুতোয় নানা ফাঁকে। সারা দিন আজ ভয়ানক বর্ষা—বৃষ্টির বিরাম নেই একদণ্ড। দুপুরের সময়যে বৃষ্টি নামল, তা ধরল বিকেল চারটের পরে। খানা-ডোবা ভরে গিয়েচে। আমন ধানের মাঠেরোয়ার জল হয়েচে। বিলবিলে তো জলে টইটম্বুর। মেঘমেদুর বিকেলে সবুজ মাঠের ওপরদিয়ে জলের আনন্দময় দিনগুলোর যোগ আছে— যখনই খুব আনন্দ পেয়েচি, তখনই ওরবাড়িতে গিয়ে বসেচি এই ক'বছরের মধ্যে। আজও গেলাম। ওর বাড়ির দাওয়ায় বসেমেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলায় বাঁওড়ের ধারের ঘন সবুজ আউশের ক্ষেত ও প্রাচীন বটের সারির দিকে চোখ রেখে ওর সঙ্গে কত গল্প করলুম। বয়স হয়েছে ৯৮ বছর, কিন্তু আইনদ্দি কখনোশুধু-হাতে বসে থাকে না। আমি যখনই গিয়েচি, তখনই দেখেচি ও কোনো না কোনো একটাকাজ নিয়ে আছে—এখন সে একটা তলতা বাঁশের পাশ চাঁচছিল—বল্লে মাছধরার ঘুনি বুনব।

ওর উঠোনের দক্ষিণ ধারে একটা বাবলার গাছ, তার জিরে জিরে সরু পাতাভরাডালগুলোর দিকে চেয়ে মনে যে কি আনন্দ পেলাম—তার যেন তুলনা নেই। ওখান থেকে বারহয়ে কাঁচিকাটা পুলের ওপর এসে দাঁড়ালুম—বর্ষাক্ষান্ত বৈকালে দিগন্তে মেঘের যে শোভা হয়, ইছামতীর ওপারে, মাধবপুরের চরের মাথায়, বাঁওড়ের শেষ সীমানার দিকে এদের দেখে তুষারমণ্ডিত হিমালয়শৃঙ্গের কথা মনে পড়ে।

ঘোষেদের দোকানে এসে বসেচি। একটা লোক মাথায় একটা পুঁটুলি নিয়ে ঢুকে বল্লে—মুসুরি নেবা ?

ওরা বল্লে—নেব।

এর বদলে কিন্তু চাল দিতে হবে।

ওরা তাতেই রাজী হল।

তারপর সে বসে বসে গল্প করতে লাগল। চৈত্র মাসে আউশ ধানের বীজ ছড়িয়েছিল। বলে তার ক্ষেতে ধান এখন খুব বড় বড় হয়েচে। বাড়ি তার খাবরাপোতায়। খাবার ধান এখনআর ঘরে নেই, সব মহাজনের ঘরে তুলে দিয়ে এখন সে নিঃস্ব, অথচ এগারো জন লোক তার পরিবারে, দু'বেলা বাইশ জন খেতে। সামান্য কিছু মুসুরি ছিল তাই ভরসা। তাই বদলে চালনিতে এসেচে।

ফিরবার পথে অস্ত-দিগন্তের মেঘস্তূপে অপূর্ব রাঙা রং ফুটল, দেখে দেখে চোখ ফেরাতেইচ্ছে করে না।

গ্রীষ্মের ছুটির পরে স্কুল খুলেচে প্রায় মাসখানেক হল। কলকাতায় এসে পুরোনো হয়েগেল। এরই মধ্যে একদিন বারাসাত গিয়েছিলুম পশুপতিবাবুদের সঙ্গে, একদিন রাজপুরগিয়েছিলুম। একদিন ডা. মহেন্দ্র সরকারের বাড়ি নিমন্ত্রণ ছিল, অনেক রাত পর্যন্ত নানা গভীরবিষয়ে আলোচনা শুনলুম তার মুখে। আমার মন উদ্বিগ্ন হয়েছে আর একবার ইছামতীতে স্নান করবার জন্য। এরই মধ্যে যেন মনে হচ্চে কতকাল এসেচি।

গত শুক্রবার বারাকপুর গিয়েছিলুম। পরিপূর্ণ বর্ষার শোভা অনেকদিন দেখাহয়নি—এবার এই বারাকপুরে থাকব বলে গিয়েছিলুম। ইছামতীর জল ঘোলা হয়ে এসেচে।দু'দিনই বাঁওড়ের তীরে বটতলার পথে সকালবেলা বেড়াতে গেলুম—দু'দিনই ঘোলা গাঙে খুকুদের সঙ্গে স্নান করলুম। রৌদ্রে নতুন ওঠা কচি ঘাসের ওপর খানিকটা করে শুয়ে ঘাসের সাদা সাদা দুটো ফুল লক্ষ্য করলুম। বটগাছের তলায় গাছের গুঁড়ি ঠেস্ দিয়ে আজই সকালেকতক্ষণ বসে রইলুম। বিশেষ করে শনিবার বিকেলে ন'দিদির কাছে নতুন বইখানার প্রথম দিকের গোটাকতক অধ্যায় শুনিয়ে যখন ইন্দু মাছ ধরতে বসেছিল তাই দেখতে গেলুম—তখন যেন একটা নতুন দৃশ্য দেখলুম। নকুলের নৌকোতে বেলেডাঙার মাঠে নতুন জায়গায় নেমেনীল আকাশের কোলে রঙীনমেঘস্তূপ দেখে মনে হল এমন দৃশ্য ফেলে কেন কলকাতায় পড়েথাকি।

রানাঘাট হয়ে কলকাতা ফিরলুম বিকেলে। বেশ লেগচে শ্রাবণ মাসে দেশে গিয়ে। অনেকদিন যাইনি এ সময়। কাল দুপুরের পরে ন'দিদিদের দালানে বসে যখন পুষ্পের কথা পড়েশোনালুম নতুন বই থেকে, খুকু খুবই খুশি। ওদের উঠোনে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল, বল্লে—সব বইতে কেবল তুমি আর আমি, ওই নিয়েই গল্প—এটা নতুন ধরনের হয়েচে।

নকুলের নৌকোয় যখন যাচ্চি, নদীর ধারে এক জায়গায় প্রকাণ্ড একটা বাবলা গাছ থেকেকত কি বন্যলতা ঝুলচে, ডাইনে রঙীন মেঘস্তূপ, আবার একটা জায়গায় আধভাঙা একটা রামধনু। বেলেডাঙার মাঠে নেমে সবুজ ঘাসের একধারে বড় সুন্দর একটা ঝোপ। এদিকটাকখনও আসিনি। কতক্ষণ মাঠের মধ্যে ঘাসের ওপর শুয়ে রইলুম। মটরলতা তো যেখানেসেখানে—নতুন পাতার সম্ভার নিয়ে দুলচে প্রতি ঝোপের মাথা থেকে আমার কি জানি কেন ভারী আনন্দ হয় নতুন কচি মটরলতা দেখলে। ওর সঙ্গে যেন কিসের যোগ আছে আমার।আজ সকালে জগো আর গুটুকে যখন কুঠীর মাঠের গাছটাতে পেয়ারা পাড়চে আমি একটামটরলতার ঝোপের তলায় বসলুম—নতুন এক ধরনের চওড়া পাতা নরম ঘাসের ওপরে। সে এক অপূর্ব অনুভূতি। তার বর্ণনা দেওয়া যায় না—মনের আনন্দই তার চরম প্রকাশ।

আমি ডায়েরিতে অনেক বারই লিখি—"এ আনন্দের তুলনা নেই।" হয়তো একঘেয়ে হয়ে যায় কথাটা, কিন্তু আনন্দটা যে একঘেয়ে হয় না। যে আনন্দ মনকে ভরিয়ে দেয়, তা সবসময়ে, সর্বকালে এক। যখনই পাই, তখনই মনে হয় এ বুঝি নতুন, এমনটা আর কখনো বুঝিহয়নি। সেই নিত্যনূতন চির অক্ষয় আনন্দ, তার কি ভাবে বর্ণনা দেব একমাত্র ওই কথা ছাড়া যে। 'এর আর তুলনা নেই'! জীবন যে বহু আনন্দ-মুহূর্তের সমষ্টি, তাদের পৃথক

বর্ণনা নেই, তারাচির নবীন, শাশ্বত, অক্ষয়, অব্যয়—কাজেই তাদের তুলনা নেই। সত্যিই তো তাদের তুলনাআর কিসের সঙ্গে দিতে পারি? অন্য অন্য দিনের আনন্দের সঙ্গে? কিন্তু তারা তো তখন ক্ষীণ স্মৃতিতে পর্যবসিত—বর্তমানে যা পাচ্চি, তাই তখন বড়।

এত শীগ্‌গির যে আমায় আবার শিলং আসতে হবে, তা ভাবিনি। কিন্তু সুপ্রভা আসতেলিখলে, আর আমারও একটা সুযোগ উপস্থিত হল আসবার। কাজেই চলে এলুম।

কাল বিকেলে ট্রেনে সময়টা কি চমৎকার কেটেচে! কত নতুন অনুভূতি, কত নতুন চিন্তা।নৈহাটির কাছাকাছি যখন গাড়িখানা এল, তখন মনে হল, এখান থেকে সোজা বারাকপুরকতটুকুই বা আর, এখন দুপুরবেলা, আমাদের বকুলতলায়, বিলবিলের ধারে ছায়া পড়ে গিয়েচে, খুকু এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েচে, বৃহস্পতিবার আজ গোপালনগরের হাট, সব লোক হাট করতে যাচ্চে, কত গ্রামে বাঁশবনের ছায়ায় ঢাকা কত পল্লীকুটিরে কিশোরী মেয়েরা প্রেমের রঙীন স্বপ্নজাল বুনে ঘুরে বেড়াচ্চে, খুঁটির কাছে বসে চলে যাবার সময় চেয়ে বসে থাকার; নদীর ধারেকত বন-সিমলতার আড়ালে চোরা চাউনি ও হাসির কত ঢেউ—এই সব ছবি মনে আসে।বিকেলে তারা জলে নেমেচে গা ধুতে। পার্বতীপুর এসে যেন সব চেনা পুরোনো হয়ে গিয়েচে।গাড়িতে বেশ জায়গা ছিল। ট্রেনে ঘুমও হল খুব। লালমণির হাটে নেমে জেলি ও পাগলারখোঁজ করলুম। অত রাত্রে কোথায় পাব?

ভোর হ'ল রঙ্গিয়া জংশনে, এখানেই প্রতিবারে ভোর হয়। আর যখনই এপথে এখানেএসেচি, বৃষ্টিছাড়া দেখিনি কখনো। ভিজে স্যাঁতসেঁতে জলাভূমি আর ফার্ন গাছের বন, কাদাভরামাটির পথ-ঘাট, কলার ঝাড়, নীচু নীচু খড়ের বাড়ি।

ব্রহ্মপুত্র কূলে কূলে ভরা। কি ঠাণ্ডা জল! জলে নেমে মুখে মাথায় জল দিয়ে তৃপ্তি হলভারী। টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি পড়চে, মেঘমেদুর আকাশ, ওপারের পাহাড়ে কুয়াসার মতো মেঘ জমেরয়েছে।

গৌহাটি-শিলং মোটরবাসে ত্রিপুরার মহারানির একদল পরিচারিকা উঠল—তাদের কথাবার্তা বিন্দুবিসর্গও বুঝিনে—মোটর যেমন পাহাড়ের পথে উঠল—অমনি ওরা সবাইসামনের বেঞ্চিতে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল—সবারই নাকি মাথা ঘুরচে। বেশ গরম, নংপোতে।এলুম তখনো এতটুকু ঠাণ্ডা নয়, এমন কি শিলংএ-ও নয়। বরপানি নদীতে বর্ষার পরিপূর্ণযৌবনের জোয়ার এসেচে—এক শিলাখণ্ড থেকে আর এক শিলাখণ্ডে লাফিয়ে আছড়ে পড়ে কি তার উদ্দাম মাতন!

আমার পুরোনো স্নো-ভিউ হোটেলে এসেই উঠলুম। ওদের কলটার কাছে সেই গোলাপগাছটা তেমনি আছে, থোকা থোকা রাঙা গোলাপ ফুটেছে।

ঝড় মেঘ আর বৃষ্টি শিলং-এ। পাইন বনে মেঘ জমে আছে শাশ্বত, আর টিপটিপে জল, রৌদ্র দেখলুম না কখনো শিলং-এ।

লাবানে যাবার সময় গোটা পথটাতেই বৃষ্টি। আজ আসামের ভূতপূর্ব গভর্নর সার মাইকেল কিনের মৃত্যু উপলক্ষে স্কুল কলেজ আপিস সকালে ছুটি হয়ে গিয়েচে। তাই ভাবলুম সুপ্রভাদের কলেজও নিশ্চয়ই বন্ধ হওয়াতে সে সনৎ কুটিরেই ফিরে এসেচে। ওকে পেলামওতাই। হঠাৎ আমায় দেখে খুব খুশি হল। আমিও বড় আনন্দ পেলাম অনেকদিন পরে ওকে দেখে। ওর দিদির দুই মেয়ে রেবা ও সেবাকেও দেখলুম। কমলা সেনের সঙ্গে আলাপ হল। অনেকক্ষণ বসে ওদের সঙ্গে গল্প করে সাড়ে ছ'টায় উঠে গভর্নরের বাড়ির পেছন দিয়েসুশীলবাবুদের বাড়ি Health Back Cottage-এ গেলুম। সুশীলবাবু তো আমায় দেখে অবাক!আমি কোথা থেকে এলুম শিলং-এ! শঙ্কর এল ফুটবল খেলে সন্ধ্যার সময়। সে বড় হয়েগিয়েচে, আর যেন চেনা যায় না।

লুম্ শিলং-এর পাইনবনে মেঘ জমেচে। এই সন্ধ্যায় আমি দূর বাংলাদেশের এক ক্ষুদ্রপল্লীর কথা ভাবছি।

সুপ্রভা বলছিল, কাল আপনি ডাউকি পর্যন্ত বেড়িয়ে আসুন। শঙ্করও বল্লে, সে কালসকালে এখানে আসবে। দেখি কোথায় যাওয়া যায়।

সকালে শঙ্কর এসে ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙালে। তার সঙ্গে ওয়ার্ড লেক ও বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়িয়ে মৌখরা গেলুম ডাউকির মোটর কখন ছাড়ে দেখতে। শুনলুম এ পর্যন্ত রিটার্ন টিকিট দেয় না–সুতরাং চেরাপুঞ্জি রওনা হলাম। আবার সেই আপার শিলং-এররাস্তা! সেই পাইনবন পথে তিন চার রকমের বন্যফুল ফুটে আছে প্রান্তরে, একটা হলদে, একটা ভায়োলেট, একটা লাল, একটা সাদা। ঠিক যেন মরসুমী ফুলের ক্ষেত। সর্বত্র অজস্র ফুটেরয়েচে—চেরার একটু আগে পর্যন্ত। চেরাতে নেই, মুম্বাইতেও নেই। যাবার সময় Gorge-এখুব মেঘ করেচিল, খানিকদূর পর্যন্ত মনে হল যেন আকাশে এরোপ্লেনে চলেচি। চেরার কাছে।অদ্ভুত আকৃতির জঙ্গল আছে—তার প্রত্যেক গাছটাতে অসংখ্য পরগাছা, শেওলা ঝুলচে, ফার্নহয়ে আছে—কি ঘন কালো জঙ্গলের তলাটা! আনারস কিনে খেলুম চারপয়সা দিয়ে একটা।খাসিয়া দোকানদার কেটে প্লেটে করে দিলে। বেশ মিষ্টি আনারস। একজন ডাক্তার তার ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। তারপর মুস্‌মাই পর্যন্ত গেলুম বাসে। চমৎকার দিন আজ, মুস্‌মাই-এর পথে নীল আকাশ একটুখানি দেখা গেল। সবাই বল্লে, এত ভাল দিন অনেকদিনহয়নি। মুস্‌মাই জলপ্রপাতের এপারে একটা পাথরে কতক্ষণ বসে রইলুম—একধারে সিলেটেরসমতলভূমি ঠিক যেন সমুদ্রের মতো দেখাচ্চে। একসময়ে তো ওখানে সমুদ্রই ছিল, খাসিয়াজয়ন্তিয়া পাহাড় ছিল প্রাচীন যুগের সমুদ্রতীর। ঢেউ এসে তাল মারত পাহাড়ের দেওয়ালেরগায়ে। চেরা থেকে ফিরবার পথে আবার সেই ফুলের ক্ষেত—মাঠের সর্বত্র, শৈলসানুর সর্বত্রওই চার রকম ফুলের বাগান। একটা খাসিয়া গ্রামে বাংলাদেশের গোয়ালের মতো একখানাঅপকৃষ্ট ভাঙা খড়ের ঘরে টুপিপরা ছেলেমেয়ে, ফর্সা মেয়েরা। বেড়ার ফর্গেট-মি-নটের বাহারদেখে মনে হল এ কোন্ দেশে আছি! চেরা থেকে এসে চা খেয়ে ওয়ার্ড লেকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। খুকু এতক্ষণ ঘোলার গাঙে গা ধুতে নেমেছে। আমাদের দেখে নাটাকাঁটার ফুল ফুটেছে—সে এক দেশ আর এই এক দেশ! অনেককাল আগে এই গোধূলিতে একটা স্মৃতিজড়ানো আছে, পাইনবনের মধ্যে বসে সেটা মনে আনতে বেশ লাগে। সুপ্রভাদের ওখানে গিয়েদেখি সুপ্রভার বাবা এসেছেন সিলেট থেকে। আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অপেক্ষাকরছিলেন। ভারী চমৎকার লোক, এমন সরল, সদানন্দ, অমায়িক স্বভাবের ভদ্রলোক আমি কমই দেখেচি। অনেকদিন পরে সুপ্রভার ছোট বউদিদির হাতে তৈরি ভ্যানিলা দেওয়া নারকোলের সন্দেশ খাওয়া গেল।

সন্ধ্যার দেরি নেই। লুম শিলং-এর পাইন বনে মেঘ জমেচে। পশ্চিম দিগন্তে কিন্তু অল্পএকটু নীল আকাশের আঁচ—মেঘে রং লেগেচে, ওয়ার্ড লেকের ওপারে পুবদিকের বহু দূরেরআকাশে জমেচে অন্ধকার। কেবল শুনি মোটরের ভেঁপু, কত গাড়ি যে যাচ্চে সামনে দিয়ে।খাসিয়া মেয়েরা গল্প করতে করতে যাচ্ছে। গির্জায় প্রার্থনা হচ্চে, সম্মিলিত ইংরিজি গানের সুরকানে ভেসে আসচে। আমি কাউন্সিল হাউসের সোপানে বসে আছি। কি জানি কেন এই সন্ধ্যায়কেবল আমাদের গাঁয়ের কথা মনে পড়ে। এ যেন কোথায় এসেচি, কতদূরে—সুপ্রভা না থাকলেএকটুও ভাল লাগত না। আমরা যখন পৃথিবীকে ভালবাসি বলি—তখন ভেবে দেখিনে, অনেকেই ভালবাসি খুব সংকীর্ণ অত্যন্ত প্রিয় ও পরিচিত একটা জায়গা। সেখানকার গাছপালা, নদী, মাটি, লোকজন আমার কাছে বড় আদরের—তাই তাদের পেয়ে ও ভালবেসে মনে হয়।এই পৃথিবীকে বড় ভালবাসি। আসলে সেই গ্রাম বা নগরটাই আমার পৃথিবী। এমন কি রোদ বাজ্যোৎস্না সেখানে যত মিষ্টি, অন্য জায়গায় ঠিক ততটা নয়।

আজ সকাল থেকে অত্যন্ত বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল, বেলা ১০টায় বৃষ্টি ধরেচে। সুপ্রভাদেরহস্টেলে গিয়ে বল্লুম—আজই চলে যাব! সুপ্রভা যেতে বারণ করলে, তবুও বলে এলুম, না আজই যাব। কিন্তু হোটেলে এসে আর যেতে ইচ্ছে হল না। ভাবলুম, সুপ্রভা বারণ করলে, আজ থেকেই যাই। দুপুরে সুপ্রভার বাবা, সুপ্রভা, বীণা, রেবা দেখি একেবারে আমার ঘরেরমধ্যে উপস্থিত—আমায় মোটরে উঠিয়ে দিতে। রেবা চকোলেট ও ফুল এনেচে। ওদের সবাইকে দেখে এত আনন্দ পেলুম। তারপর সকলে মিলে গেলুম সুপ্রভাদের কলেজ ও হোস্টেল দেখতে।নতুন

তৈরি বিরাট কাঠের বাড়ি, দেখবার মতন জিনিস বটে। ওখান থেকে বীণাদের বাড়িগিয়ে চা, তালের ক্ষীর, তালের বড়া, লুচি কতরকম খাবার খেলুম। সুপ্রভার মাকে দেখে বড় কষ্ট হল। আহা, এই বয়সে এই শোক পেয়েছেন, তাতে মেয়েমানুষ, মনকে বোঝানো ওঁদেরপক্ষে খুবই শক্ত। সুপ্রভার বাবাকে যতই দেখচি, ততই মুগ্ধ হচ্চি, তাঁর মনের স্থৈর্যে ওপ্রসারতায়। তিনি যত সহজে শোক জয় করতে পারচেন, সুপ্রভার মা তা পারচেন না। কাজেই তার মনে কষ্ট হয়।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। চাঁদ উঠেছে মেঘের ফাঁকে, দক্ষিণ বনের মাথায়। একটা সীমাহীন নক্ষত্র মিটমিট্ করচে লুম শিলং-এর ওপারের আকাশে। গির্জা থেকে দলে দলে খাসিয়া মেয়ে-পুরুষ উপাসনান্তে বাড়ি ফিরচে। অনেকগুলি খাসিয়া মেয়ের বাঙালিদের ধরনে কাপড়পরা! তাদের দেখাচ্ছে ভাল।

শিলং-এ একটা জিনিস নেই। এখানে কোনো সৎপ্রসঙ্গের চর্চা দেখলুম না কোথাও। নাসাহিত্য, না গান, না অন্য কোনো শিল্প। লোকেরা সব চাকুরিবাজ, নয়তো স্বাস্থ্যান্বেষীহাওয়াখোর। শেষোক্ত শ্রেণীর লোক কিম্ভূতকিমাকার ধরনের জীব। রোগের কথা, পথ্যের কথা, শরীরের উন্নতি কার কতটুকু হয়েছে, এ ছাড়া অন্য বিষয়ে তারা interested নয়। আর এরাপ্রায়ই ত্রিকালোত্তীর্ণ প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ। এদেরই বড় ইচ্ছা বাঁচবার। যেন তারা বেঁচে ফিরে গেলে সোনার দেউল ওঠাবে।

পীরতলা জায়গাটা পাইন বনের মধ্যে একটা ভ্যালি। ছোট্ট ভ্যালিটা যদিও, চারিদিকে ঘনসন্নিবিষ্ট পাইন শ্রেণী, মাঠের মাঝখান দিয়ে একটা পাহাড়ি নদী বয়ে চলেচে, বেশ সুন্দরজায়গাটা। এদিন সকালে লাবানে যাবার পথে একটাউঁচু পাহাড়ি পথ টপকে পাইন বনেরছায়ায় ছায়ায় সোজা রাস্তাটা দিয়ে যাবার সময় দূরে লাবান হিলের মাথায় ওধারকার পাইনবনগুলো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। মর্নিং গ্লোরি ফুল থোকা থোকা ফুটেছে লোকেরবাড়ির বেড়ার গায়ে, মাকড়সায় বিচিত্র জাল বুনেচে।

সুপ্রভাদের বাড়ি গিয়ে রেবাকে একটা প্রশ্ন জিগ্যেস করে ঠকিয়েছিলাম। যীশুখ্রিস্টকতদিন মারা গিয়েচেন, এ প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারলে না। ওকে দেশলায়ের বাক্সে ম্যাজিকটা দেখিয়ে বাক্সটা দিয়ে দিলুম। বেলা সাড়ে ন'টা। সুপ্রভার সঙ্গে পীরতলা বেড়াতেগেলুম। একটা নদীর ধারে মাঠের মধ্যে পাইন বনে ঘেরা নির্জন স্থানটিতে বসে গান শোনাগেল। তারপর ওখান থেকে চলে এসে সেই পাহাড়টার উপর দিয়ে আসচি, রেবার দাদা আসচে, বল্লে—কাউন্সিলে গিয়েচিল অর্থাৎ শিলং লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে। একটা টিকিট দিলে আমায়। আমি গিয়ে কাউন্সিল হাউসে ঢুকলাম। একজন পুলিশ দেখিয়ে দিলে ওপরের সিঁড়িটা। ওপরের গ্যলারিতে লোক লোকারণ্য। আইনসভার অধিবেশন হচ্ছে নীচের হলটাতে। বসন্তকুমার দাস নিচেকার উঁচু চেয়ারে ডবল কলার পরে গম্ভীর মুখে বসে। তার সামনে, ওপরে, দোতলায়, পেছনে উঁচু চেয়ারে আসামের গভর্নর রিড বসে। একজন কংগ্রেস-সদস্যমন্ত্রীদের বেতন সম্পর্কে বক্তৃতা করছিলেন। রাজস্ব-সদস্য স্যার আবদুল্লা তার জবাব দিতেউঠলেন। একপক্ষ যখন বক্তৃতা করতে ওঠে, অপর দল দেখলুম হাসি, টিটকিরি সব রকমচালায়—এ বিষয়ে আইনসভা সাধারণ স্কুলের ডিবেটিং ক্লাসের চেয়েও অধম।

কাউন্সিল হাউস থেকে এসে জিনিসপত্র গুছিয়ে মোটর স্টেশনে এলুম। দুটোর সময় মোটর ছাড়ল—অপরাহ্ণের ছায়ায় মোটর-রাস্তার দু'ধারে অরণ্য-দৃশ্য অতি সুন্দর—পাহাড়িনদীটাই কি অদ্ভুত! ফিরে আসতে আসতে উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাথার দিকে চেয়ে দেখলে মায়েরসেই কড়াখানার কথা মনে হয়। সন্ধ্যায় গৌহাটিতে নামবার পথে মণি ডাক্তারের কথা ভেবেদেখলুম। গাঁয়ের হাটতলায় সে এতক্ষণ সেই মুদীর দোকানটাতে বসে গান করছে। হয়তো বেচারা এবারও বাড়ি যেতে পারেনি। সামনে সূর্যাস্তকে লক্ষ্য করেই যেন মোটর ছুটচে, সামনে কামাখ্যা দেবীর মন্দির পড়ল একটা উঁচু পাহাড়ের মাথায়। খুকু এতক্ষণ হয়তো গাঙ থেকে গাধুয়ে ফিরে এল। জঙ্গলে ভরা পোড়োভিটেটাতে ছায়া পড়ে এসেচে। স্টিমারে এসে ওপরেরডেক থেকে পাহাড়ে ঘেরা আধো-অন্ধকার বৃক্ষপত্রের

দিকে চেয়ে রইলাম কতক্ষণ, কত চিন্তা যে মনে আসে এই সন্ধ্যায়! ট্রেনে উঠে তাড়াতাড়ি শোবার ব্যবস্থা করিনি—বরপেটা স্টেশন পর্যন্তবসে আসামের সুবিস্তীর্ণ জলাভূমি ও ছোট ছোট গ্রাম দেখতে দেখতে এলুম। কেবলই মনে হয় ওবেলা পীরতলা ভ্যালিতে বসে যেই যে গানটা সুপ্রভা গেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের—

যৌবন সরসীনীরে

মিলন শতদল

কোনো চঞ্চল বন্যায় টলমল টলমল

আর একটা গান—'রোদন ভরা এ বসন্ত'—চিত্রাঙ্গদা গীতি-নাট্যের গানটা।

কামরূপ জেলার দিগন্তব্যাপী প্রান্তর ও জলার ওপর আকাশের ছায়া পড়েচে, সন্ধ্যা হয়েএলেও সূর্যাস্তের after glow এখনো আকাশে। ঝিঁঝি ডাকছে বনে বনে, সুপ্রভা ও শিলংঅনেক দূরে গিয়ে পড়েচে।

মণি ডাক্তার এতক্ষণ বাসা পৌঁছে তার সেই ছোট চালাঘরখানায় ভাত চড়িয়ে দিয়েছে।আহা, গরিব বেচারা! কত গ্রাম, কত মাঠ-ঘাট-প্রান্তর, এখান থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে কত গ্রামের কত সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা দ্বন্দ্বের মধ্যে একখানি মাত্র ক্ষুদ্র খড়ের ঘরের জন্যে আমারসহানুভূতি এত বেশি কেন?

রাণাঘাট স্টেশনে পরদিন দুপুরে পৌঁছে যেন মনে হল বাড়ি এসেচি। এখান থেকে আমার সুপরিচিত সব কিছুই। মনে হল নিবারণ গোয়ালা এতক্ষণ ওপাড়ার ঘাটে স্নান করতেনেমেচে—কি জানি কেন এই চিন্তাটা মনে হয়ে বড় আনন্দ পেলাম।

জন্মাষ্টমীর ছুটিতে দেশে যাওয়া আমার পক্ষে আনন্দজনক ব্যাপার। এই জন্মাষ্টমীর সঙ্গেআমার জীবনের অনেক শুভদিন, বিশেষ করে একটি অতীব শুভদিনের স্মৃতি জড়ানো। তাইজন্মাষ্টমী এলেই মন ব্যস্ত হয়ে ওঠে দেশে যাওয়ার জন্যে। এই ক'বছর তার সুবিধা ও সুযোগওঘটেচে—১৯৩৪ সাল থেকে। এবারও কাল গিয়েচে জন্মাষ্টমী, আজ নন্দোৎসব। বনগাঁয়েগিয়েছিলুম শনিবারে। সেদিন কি ভয়ানক বর্ষা! খানাডুবো জলে ভর্তি হয়ে থৈথৈ করছে। ওদিন দুপুরে খুব জল হয়ে গিয়েচে ওখানে। গিয়েই শুনি ফণিবাবু ওভারসিয়ারের মেয়েটি সেই বিকেলে নিমোনিয়ায় মারা গিয়েচে। সন্ধ্যার সময় আমরা অনেকে তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে সেখানে গিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত বসে রইলুম। পরদিন খয়রামারির মাঠে আমার সেই প্রিয় স্থানটাতে দুপুরে গিয়ে দেখি মটরলতার ঝাড় তখনো টাটকা রয়েচে, ছোট এড়াঞ্চিরঝোপগুলো বর্ষার জল পেয়ে বিষম বাড় বেড়েছে। বিকেলে ছ'টায় গেলুম। যাবার পথটি বড়সুন্দর লাগল সেই ছায়াভরা বিকেলে।খুকুএসে অনেকক্ষণ গল্প করলে। সন্তু এসেও বসল। কালোর মেয়েকে এনেখুকুআমার কোলে দিলে। সন্তুকে জিগ্যেস করলুম সিলেন্ডাইন মানেকি? খুকুবল্লে—আহা, ওকথা আর জিগ্যেস করতে হবে না। মিতা বাংলাদেশের রাজধানীবলতে পারলে না—বলে খুকু তো হেসেই খুন। সন্ধ্যা পর্যন্ত ওদের ওখানে ছিলাম, তারপরচলে এলুম। দেবেনের ডাক্তারখানার সামনে বিশ্বনাথ আর সরোজ বসে গল্প করচে অন্ধকারে। আমি সেখানে একটু বসে চলে এলুম ডাক্তারবাবুর বাড়ি গান শুনতে। আমারসঙ্গে প্রথম দেখাহয় কি ভাবে, খুকুসেই গল্পটা করলে সন্তুকে। ১৯১৮ সালের জন্মাষ্টমীর ছুটিতেও এইবাসাতে এসেছিলুম সকালে। তখন খিনুরা থাকত, খিনুর মা তখনো বেঁচে। সরকারিডাক্তারখানার কোয়ার্টারে তখন ওরা থাকত।

আজ সকালে ছায়াভরা পথ বেয়ে একা হেঁটে যাই বারাকপুরে। বর্ষায় বনস্থলীর শোভাআরো বেড়েচে। কোথাও তেলাকুচো পেকে টুকটুক্ করচে, নাটাকাঁটার ফুল ফুটেছে, বনকলমীরফুল ঝোপের মাথায় ক্বচিৎ দৃশ্যমান, 'ক্বচিৎ'এইজন্যে বললুম যে এই ফুলটা এবার যেন দেশে একটুকু কম, ঢোলকলমীর ফুল খুব ফুটেচে, কিন্তু বনকলমী তেমন দেখা যায় না। জগোর সঙ্গেবেলেডাঙার পথে বেড়াতে যাই বাড়ি পৌঁছে। বড় আমবাগানের পথে সইমার সঙ্গে দেখাবাঁশতলায়, তিনি হরিপদর বিরুদ্ধে কি একটা নালিশ করলেন আমার কাছে। সেই

গাছতলায়গাছের গুঁড়ি ঠেস্ দিয়ে বসি, সেবার যেখানটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। আইনদ্দির নাতিস্কুলে যাচ্ছে পথ দিয়ে, আমায় দেখে হাসচে। তাকে ডেকে বাড়ির কে কেমন আছে জিগ্যেসকরলুম। আজ সোমবার, ভাবছিলুম যে ও-সোমবারের আগের সোমবারে ঠিক এ সময়টা আমিআর সুপ্রভা পীরতলায় বসে আছি শিলং-এ পাইনবনে ঘেরা সেই ছোট্ট উপত্যকাটিতে, ছোট্ট নদীটার ধারে। তারপর জগো আর আমি মাঠে রৌদ্রে একটু নরম ঘাসের উপর শুয়ে থেকে আমাদেরঘাটে নাইতে নামি। ভারী তৃপ্তি হয় ঘোলাজল ইছামতীতে এই সময়টা স্নান করে। একটা ঝোপ থেকে একটা বনসিমের ফুলের ছড়া তুলে নিলাম। দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম দস্তুরমতো যে এই ভাদ্র মাসেও কুঠীর মাঠে দুটো গাছে ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল ফুটে রয়েচে।

খুকুদের বাড়িটাতে কেউ নেই। দাওয়ায় গরু উঠেচে, ভাঙ্গাচোরা পৈঠে। একবারটাসেইদিকে গেলুম। দুপুরে আমার ঘরটাতে শুয়েচি-ইন্দু এসে খানিকটা গান করলে। আমাদের ভিটের দিকে গিয়ে দেখি ঘন জঙ্গল হয়েচে—মায়ের সেই ভাঙ্গা কড়াখানা জঙ্গলে ঢেকে ফেলেচে। একটি মেয়ের কথা মনে পড়ল, যাকে অনেকদিন আগে এই দিনটিতে এখানে দেখা যেত।

নৌকো করে বনগাঁয়ে এলুম বিকেলে। ইছামতীর জলখুব বেড়েচে—জলের ধারে উলুটি বাচ্‌ড়া, নরম সবুজ ঘাসে ভরা, মাঝে মাঝে বনকলমীতে ছাওয়া ঝোপ। বিকেলের ছায়ায়নদীবক্ষের কি শান্ত শোভা!

ক'দিন থেকে পুজোর আগে বড় কাজকর্ম চলেছে। স্কটিশচার্চ কলেজে বক্তৃতা ছিল, সেখান থেকে সেদিন বার হয়ে ডি. এম. লাইব্রেরিতে এলুম। এবার প্রভাবতী দেবী সরস্বতীকেদেখলাম না, অন্য অন্য বার দেখি। প্রমোদবাবু এসেছিলেন শনিবারে। ঠিক করা গেল এবারপুজোয় কোথায় যাওয়া যাবে, অনেকটা ঠিক হল—হয় চাটগাঁয়ে, নয়তো রাখামাইন্‌সে। আজ সকালে সাঁতরাগাছি হয়ে গেলুম শ্রীরামপুরে। বর্ষার সবুজ বনরাজির শোভা দেখতে দেখতে আমি ও সুরেন মৈত্র গিয়ে উঠলুম শ্রীরামপুর টাউনহলে। কে একজন বল্লে—আপনার বদ্যিবাটিআসবার কথা ছিল না? বলতে বলতে হরিদাস গাঙ্গুলী এলেন, তাঁরই বাড়িতে ছিল খাওয়ারকথা, ভুলেই গিয়েছিলাম। বাইরে আকাশ আজ বড় নীল,—তালগাছগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে।অনেকদূরের আকাশে একটা খড়ের বাড়ি পড়ে আছে, দাওয়ায় গরু-বাছুর উঠছে। বাড়িটাতে কেউ নেই। দিদিদের বাড়িও গেলাম, আগেকার দিনের মতো কি আর আছে? আগে ট্রেনেযেতে যেতে দানিবাবু আমাকে সাহস দিতেন, তবে যেন শ্রীরামপুরের মাটিতে পা দিতেপারতুম।

আজ সারাদিন ভীষণ দুর্যোগ, যেমন ঝড় তেমনি বৃষ্টি। সকালে কলেজ স্কোয়ারে বেড়াতে গিয়ে রমাপ্রসাদের সঙ্গে গল্প করলুম। তারপর স্কুল গেল ছুটি হয়ে। বৃষ্টির মধ্যে গেলুমক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, সেখান থেকে প্রবোধ সরকারের দোকান হয়ে গুরুদাসচাটুয্যে অ্যান্ড সন্স ও কাত্যায়নী বুক স্টল। ওখানে আমার একখানা উপন্যাস 'আরণ্যক'-এরআজ কন্ট্রাক্ট হওয়ার কথা। হয়েও গেল। ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে সুধীর সরকারের বইয়ের দোকানেএলুম ট্রামে, সেখান থেকে রামপ্রসাদের বাসায় এসে খানিকটা গল্প করি।

কি দুর্যোগ আজ! রাত্রে এখন যেন ঝড় বেড়েছে। আজ সারাদিন এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে টোটো করে ঘুরে বেড়িয়েচি।

রাত্রি ১০টা। বৃষ্টি সমানে চলচে, গোঁ গোঁ করে ঝড় বইছে। আমি ভাবছি বহুদিন আগে ১৯২৭ সালে ঠিক এই রাত্রিটিতে এই সময়ে আমি আর অম্বিকা ভাগলপুর থেকে পায়ে হেঁটে দেওঘর যেতে জামদহ ডাকবাংলোতে কাটিয়েছিলুম। এখনো মনে পড়চে নির্জন শালবনেরমধ্যে চানন নদীর ধারে সেই বাংলোটি—আমি এদিকে কোণের ঘরে টেবিলের ওপর বসেডায়েরি লিখচি, আর বাংলোর ওদিকে লছমীর স্টেটের ম্যানেজার নদীয়াচাঁদ সহায় প্রজাপত্তর নিয়ে কাছারি করচেন। এই রাত্রেই শোবার সময় আমি অম্বিকাকে বলি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নিরাপদ রাস্তা ছেড়ে দিয়ে কাল লছমীপুর হয়ে কানিবেলের জঙ্গলের পথে দেওঘর যেতে হবে।তাতে প্রথমে সে ঘোর আপত্তি জানায়, শেষে রাজী হল।

সেই ১৯২৭ সালের এই দিনটি—আর ১৯৩৭ সালের এই দিন! কত পরিবর্তন হয়েগিয়েছে জীবনে সব দিক থেকে...যদি ধরা যায় তারও আগে ১৯১৭ সালের এই সময়ের কথা...সেইমামার বাড়িতে থিয়েটার করলুম আমি ও মেজমামা মিলে...করুণা গান গাইলে : —

আমি না তোর জান্ কলিজা

ভালবাসা গেছে বোঝা।

তবে তো পরিবর্তনের অনন্ত অকূলে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হবে।

১৯২৭ সালে আমি মুক্ত পথিক, পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই অপ্রত্যাশিত অজানার সন্ধানে—চোখে মায়ার ঘোর, সৌন্দর্যের ঘোর, এখনো আমার সে ঘোর কাটেনি, বরংঅনেক-অনেক ঘনীভূত হয়েচে। জীবনে তখন ছিলুম একা, এখন আরো সব অনেকে এসেচে।যেমন সুপ্রভা, খুকু, মিনু, রেণু—এরা সব। এই সামনের রবিবারে তো খুকুর সঙ্গে দেখা হবে ছ'ঘরেতে—তারপর ৯ই অক্টোবর সুপ্রভা আসবে শিলং থেকে। ওর মায়ের সঙ্গে কাশী যাচ্চেপুজোয় বেড়াতে—ওর সঙ্গেও দেখা হবে। তারপর আমি চাটগাঁ যাব ইচ্ছে আছে, সেখানেরেণুর সঙ্গে দেখা হবেই। এরা এখন জীবনে এসে আমায় খুব আনন্দ দিয়েচে—তবুওদশ-এগারো বছর আগেকার সেই বনে, পথে, প্রান্তরে অরণ্যসীমায় যাপিত দিনরাত্রিগুলিরস্মৃতি ফিরে এলে মনটা কেমন হয়ে যায়...।

অভিজ্ঞতা অর্জন যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে এই দীর্ঘকালের ব্যবধান, উভয় দিনেরমধ্যে আমায় কত বিচিত্র অমূল্য অভিজ্ঞতা বহন করে এনে দিয়েছে। আমি সেদিক থেকে ধনী, তবুও আজ কেউ যদি বলে—সে জীবন চাও না এ জীবন? আমি সেই জীবনে আবার এখুনি ফিরে যেতে চাই, যদি কেউ সেই দিনগুলো ফিরিয়ে দিতে পারে!

১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বেঁচে থাকব কি? কি লিখব সে দিনটিতে? তখন কোথায় থাকবে আজকের দিনের সঙ্গীরা ? কোথায় থাকবে খুকু, সুপ্রভা?...রেণু-মা ?

কে বলবে?

ভীষণ ঝড়ের রাত্রি। ঝড়ের বিরাট সোঁ সোঁ শব্দ। রাত্রে ভয়ে ঘুম হল না মেসসুদ্ধ। রাত দেড়টা। মনে হচ্চে যেন মেসের বাড়িটা দুলচে। এমন ভীষণ ঝড় ১৩১৬ সালের পরে আরদেখেছি বলে মনে পড়ছে না তো! সারা আকাশ রাঙা ধূসর মেঘে উগ্রমূর্তি, রুদ্র প্রকৃতির রক্তচক্ষুযেন মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারচে।

কাল স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েচে।অন্য অন্য বার এ সময়ে বাইরে যাবার জন্যে কত আগ্রহ থাকে, কত উদ্যোগ আয়োজন করি। এবার অন্য অন্য দিক থেকে আমার ব্যাপার মন্দ নয়, কিন্তুবাঁ পা-খানা হঠাৎ সেদিন বনগাঁয়ে মুচকে গিয়ে এক রকম শয্যাগত হয়ে আছি— কোথাও দূরেবেড়াতে যাওয়া অসম্ভব। সেজন্য মন ভাল নয়। ভাল লাগে কি এ সময় কোথাও বাইরে যেতেনা পারলে? সবাই দূরে কোথাও যাবার পরামর্শ আয়োজন করচে, সজনী ও ব্রজেনদা আজসন্ধ্যায় চলে গেল ভাগলপুরে। সুধীরবাবু কাল রাত্রের এক্সপ্রেসে যাচ্ছেন হরিদ্বার ও মুসৌরি, অপূর্ববাবু আজ সকালে চলে গেচেন শিমুলতলা, নীরদ চৌধুরী গেচে রাঁচী, অশোক গুপ্ত যাচ্ছে বেনারস, শচীন সরকার কাল সকালে চট্টগ্রাম যাবে, নীরদ দাশগুপ্ত তো সস্ত্রীক আগেই চলেগেচে চট্টগ্রাম—আজ সুধীরবাবুদের দোকানে দুপুরবেলা বসে কেবলই শুনি ওদের টিকিটকেনার, বার্থ রিজার্ভ করার, হাওড়া স্টেশনের এনকোয়ারি আপিসে ফোন করার বিপুল ব্যস্ততা।হৈ চৈ-এর মধ্যে ওরা নিজেদের ডুবিয়ে রেখেচে—কোথাও যাব এ আমোদটা কোথাও গিয়ে পৌঁছানোর আমোদের চেয়ে বেশি কিন্তু আমি শুধু বিষণ্ণমুখে বসে বসে ওদের আয়োজন দেখচি আর ভাবচি এবার আমার আর কোথাও যাওয়া হল না। সুপ্রভা লিখেছিল ৯ই তারিখে ওরা এখানে আসবে কাশী যাবার পথে—তাও সে চিঠি লিখেচে এবার তার যাওয়া হল না।আমার যাওয়ার মধ্যে দেখচি খালি মজিলপুরে দত্তদের বাড়ি সাহিত্য-সেবক সমিতির নিমন্ত্রণআছে, তারা আমাকে বিশেষ করে ধরেচে যাওয়ার জন্যে—ওই একমাত্র জায়গা যেখানেযাওয়া ঘটতে পারে, কারণ তারা মোটর পাঠাবে।

হায়, হায়, কি বিভ্রাট এবার—শিলং গেল, চট্টগ্রাম-চন্দ্রনাথ গেল, কাশী গেল, হরিদ্বারগেল, মুসৌরি-দেরাদুন গেল—শেষকালে কি না পুজোতে বেড়াতে যাব জয়নগর- মজিলপুর? আরো না জানি অদৃষ্টে কি আছে!

অথচ মজা এই, সকলেই বলচে আমাদের সঙ্গে এসো। সুধীরবাবুরা বলচেন, চলুন আমাদের সঙ্গে হরিদ্বার, নীরদ দাশগুপ্ত তো কাল স্টেশনে লোক পাঠাবে, চট্টগ্রাম স্টেশনে—কারণ কাল সকালের ট্রেনে আমার সেখানে পৌঁছানোর কথা পূর্ব ব্যবস্থামতো— অপূর্ববাবু তো কাল কলেজ স্কোয়ারে সাধাসাধি—আমার সঙ্গে শিমুলতলা চলুন। সজনী বলচে আসুন দু'দিনের জন্যেও ভাগলপুরে।

এমন সময়েও পা ভাঙে মানুষের ?

পুজোটা এবার একেবারে মাটি হল। অগত্যা কাল দেশেই যেতে হবে।

কাল পর্যন্ত ভেবেছিলুম কোথাও যাওয়া হবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পা অনেকটা সেরে উঠল। রাত্রিটা বসে বসে ভাবলুম কোথাও যাব না, এটা কি ঠিক? চাটগাঁতেই যাওয়া যাক।সকালে উঠে স্টেশনে এসে দেখি চাটগাঁয়ের একটা স্পেশাল ট্রেন ছাড়চে। শচীনবাবুও যাচ্চেসেটিতে। বেজায় ভিড় এমন কিছু নয়—তবে ভিড় দেখলুম স্টিমারে ও চাঁদপুর ট্রেনে বসে, শোওয়া তো দূরের কথা, কাত হবার জায়গা নেই। তার ওপরে এক এক স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ায়আর ছাড়তে চায় না—বিষম বিরক্তির ব্যাপার! চাটগাঁয়ে এসে নীরদবাবুর বাসা খুঁজে না পেয়েরেণুদের বাড়িতে এলুম। রেণু তো অপ্রত্যাশিতভাবে আমায় দেখে খুব খুশি। ওপরের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তুললে। রেণুর দাদা এল, মা এলেন। সবাই খুশি আমায় দেখে। রেণু বাক্সথেকে কাপড় বের করে কুঁচিয়ে নীচে নিয়ে গেল স্নানের জায়গায়। স্নান করে খেয়ে ওদের সঙ্গেঅনেকক্ষণ নানা গল্প করি। ষোলো বছর আগে এদের বাড়িতে এসেছিলুম—আর এই এখন ষোলোবছর পরে। আজ চাটগাঁয়ে বড় গরম, হাভন পার্কে আমি রেণুর দাদার সঙ্গে গিয়ে বসলুম—বেজায় ধুলো চাটগাঁয়ের রাস্তায়। নবগ্রহ বাড়িতে সপ্তমী পুজোর ঢাক বাজচে। একটাবাড়িতে প্রতিমা দর্শন করলুম। এবার আর হবে কি না কে জানে?

সন্ধ্যার সময় রেণু এসে বসে কত গল্প করলে।

ওবেলা দুপুরে খাওয়ার পরে একটু ঘুমুব বলে শুয়েছি—রেণু এসে গল্প করতে লাগল, ঘুম চটে গেল। ও চলে গেলে ঘুমুবার চেষ্টা করতেই ঘুম এল। ও কখন চা এনে দাঁড়িয়ে আছে।কিন্তু আমায় ডাকেনি। সেই সময় আমায় একটু নড়তে দেখে বল্লে—উঠবেন না? চা এনেচি, কিন্তু আপনি ঘুমিয়ে আছেন দেখে আমি আর ডাকিনি। চা খাবেন আসুন উঠে।

নীরদবাবুদের বাসা খুঁজে পেলুম না বটে, কিন্তু সেজন্য আমার কোনো কষ্ট নেই। এদেরআতিথ্যে যত্নে সব দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েচে।

সকালে রেণুদের বাড়িতে যখন আজ ঘুম ভাঙল তখন জানলার ধারে শুয়ে দেখি রাঙারোদের আভাস পুব আকাশে। পরিষ্কার দিনের অগ্রদূত এই অরুণ বর্ণ উদয় দিগন্তের।ভাবচি—আমি কি বনগাঁর বাসায় ? চাটগাঁয়ে এদের বাড়িতে ষোলো বছর পরে এসেচি, এ যেনস্বপ্ন। সেবার যে সেই এদের বাড়ি থেকে অন্নদাবাবুর সঙ্গে ফেণী চলে গিয়েছিলুম— তারপর পৃথিবীতে যুগ পরিবর্তন হয়ে গিয়েচে। হাওড়ার পুলের নীচে দিয়ে অনেক জল চলে গিয়েচে।তখনকার দিনের জীবন আর এখনকার জীবন! সেই আমি আর এই আমি? তারপর ঘটেছেঢাকা, বর্ধমান, হরকু, চরি, ইসমাইলপুর, গোটা ভাগলপুরের জীবনটাই। তারপর আমার সাহিত্যিক জীবনের আরম্ভ—স্কুল, কত নতুন বন্ধু লাভ, সুপ্রভা, খুকু ওরা সব। জীবনের চলমানস্রোতে কোথা থেকে কোথায় ভাসিয়ে এনে ফেলেচে দ্যাখো!...

রেণু চা নিয়ে এল। বুদ্ধ বল্লে—আজ চন্দ্রনাথে চলুন।

বেশ যাব। কখন গাড়ি আছে দ্যাখো।

সাড়ে দশটায় গাড়ি।

সওয়া দশটা বেজে গেল বুদ্ধুর দেখা নেই। কোথায় বাইরে গেচে।

আমি একলা স্টেশনে এলুম—ফেরিওয়ালা বিক্রি করচে—চাই বনরুটি, কেক বলবাশিংসু! আমি ভাবি 'বলবাশিংসু'টা কি জিনিস? চাটগেঁয়ে কোনো খাবারের নাম নাকি?

চাই বলবাশিংসু...বলবাশিংসু...

কান পেতে শুনে বুঝলুম লোকটা আসলে বলচে—ভাল পাশিং শো। চাটগাঁয়ে 'ও'-কারান্ত শব্দের উচ্চারণ করে 'উ'-কারান্ত শব্দের মতো। জ্যোৎস্নাকে বলবে জ্যুৎস্না। শো' হয়ে গিয়েচে 'শু'।

যাক্। চন্দ্রনাথে এসে নামলুম বেলা বারোটা তখন। ঝমঝম করচে দুপুরের রোদ। নীল ইস্পাতের মতো আকাশ। একা হেঁটে ভাঙা পা নিয়ে পাহাড়ে উঠচি। পায়ের ব্যথা এখনো সারেনি—এখনো বেশ খচখচ করে হাঁটতে গেলে। বিরূপাক্ষ মন্দির থেকে যাত্রীদের দল নামচে। দুপুরে ঘেমে নেয়ে উঠচি। বিরূপাক্ষ মন্দিরে উঠতে বাঁ ধারে বনের মধ্যে দিয়ে একটা সরু পথ আছে—সেইটে ধরে চললুম। বড় নির্জন রাস্তাটা। হঠাৎ বাঁ দিকে চেয়ে দেখি সমুদ্র দেখা যাচ্চে। পাহাড়ের ধার দিয়ে সরু পথটা বনস্পতিসমাকুল ঘন বনের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে উঠে নেমে ঊনকোটি শিবের গুহা বলে একটা ছোট্ট গুহার কাছে গিয়ে শেষ হয়েচে। ঘামেরউপদ্রবে 'দু'বার এর মধ্যে গাছের ছায়ায় শিলাখণ্ডে বসেচি। একটা বনকলার পাতা হাতে নিয়েচি—যেখানে সেখানে সেটা পেতে বসচি। ঊনকোটি শিবের গুহা দেখে ফিরবার সময়একটা ছোট ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ বসে রইলুম। পেছনে উঁচু পাহাড়ের দেওয়াল, ঘন জঙ্গলাবৃত—ঝরঝর ঝরনার জলের তোড়ের শব্দ পাচ্চি। একটা কী পাখি ডাকছে, ঠিক যেন ঘণ্টা বাজছে। সামনে সমুদ্রের দৃশ্য। সমুদ্রের দিক থেকে মাঝে মাঝে বেশ হাওয়া বইচে—এই ভীষণ গরমে ও রোদে সে ঝিরঝিরে হাওয়াতে যেন সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল। ডাইনে একটা উঁচুচূড়ায় একটি মাত্র নির্জন বনস্পতি অত উঁচুতে সুনীল আকাশের নীচে একটা অসাধারণ ছবিরসৃষ্টি করেছে। সুন্দর, কিন্তু যেন অবাস্তব। অত উঁচুতে কি গাছ থাকে?

ফিরবার পথে সেই ঝরনার ধারে বসলুম। যেমন বড় বড় গাছ জায়গাটাতে, তেমনি বড়বড় শিলাখণ্ড। সিঁড়ি বেয়ে অনেকটা ওপরে উঠলুম—ওপরে বিশাল অরণ্য-regular mountain forest-বেশিদূর উঠতে হল না এই মচকানো পা নিয়ে—পথটাও জনহীন, শুনেচি চন্দ্রনাথে বাঘ আছে। নেমে আসবার পথে প্রথমে বসলুম সিঁড়িটার ওপরে—মাথার ওপরে চূড়ার পাশে বনের গাছপালা—তার মাথায় চিল উড়চে, দূরে সমুদ্র বেঁকে গিয়েচে। ওই সমুদ্রেরদূর গায়ে বাংলাদেশের এক ক্ষুদ্র গ্রামে কত প্রতিমা, কত উৎসব!

সমুদ্রকে সামনে করে একটা আমলকী গাছে ঠেস দিয়ে পড়ন্ত বেলায় অনেকক্ষণ বসেরইলুম। চন্দ্রনাথ পাহাড়কে কতভাবে যে দেখলুম আজ! এক এক জায়গায় এর এক এক স্বরূপ, নামবার পথে সেই ঝরনাটার ধারে ঘন ছায়ায় আর একবার খানিকটা বসলুম, বিকেলের ঘনছায়ায় এই বনের দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে। সেই যে নীচের পুলটাতে ষোলো বছর আগেরোজসন্ধ্যায় বসতুম এখানে থাকতে—সেইটাতে ঠিক সন্ধ্যার সময়েই আজ বসলুম। আবার এই ষোলো বছরের অতীত ঘটনাবলী মনের মধ্যে একে একে উদিত হল। পরিবর্তন...পরিবর্তন... একেবারে আমি নতুন মানুষ এখন। সে আমিই নেই। শম্ভুনাথের মন্দিরের ডাইনের ঘন বনের রাস্তাটি দিয়ে নামলুম। বনের মাথায় মাথায় সাদা সাদা যেন অনেকটা কাপাস তুলোর ফুলেরমতো ফুটে আলো করে রেখেচে। আরো অনেক রকম ফুল দেখলুম।

ফেরবার পথে অখিল চক্রবর্তীর এক ভাই-এর সঙ্গে দেখা। অখিল সেবার আমার পাণ্ডাছিল—ষোলো বছর আগে যখন চাটগাঁ এসেছিলুম। তাদের সে বাড়িটাও দেখলুম। একটা ছোট্ট মেটে বাড়িতে প্রতিমা দর্শন করলুম। তখন

ছায়া ঘন হয়ে এসেচে। মাটির উঠান ঝকঝকে তকতকে, পেছনে বাঁশের ছেঁচার বেড়া ও বেতবন, ছোট্ট প্রতিমাটি, কতগুলি গ্রাম্য নরনারী প্রতিমা দেখতে এসেচে, ট্যাংট্যাং করে ঢোল বাজচে। ওখান থেকে বার হয়ে স্টেশনের কাছে এক বড় পূজার বাড়িতে মহাষ্টমীর আরতি দেখলুম। সুপ্রভাদের বাড়ি পুজো আছে, সে-ও এমনসময় হয়তো আরতি দেখচে দাঁড়িয়ে—খুকুও।

ট্রেন এল। অখিল চক্রবর্তীর ভাই আমার টিকিট কিনে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল। কত কথাভাবতে ভাবতে চাটগাঁয়ে এলুম। এসে ওপরে বসেচি, রেণু তখনি এক গ্লাস শরবত নিয়ে এসেহাতে দিলে। তারপর চন্দ্রনাথ ভ্রমণের গল্প করি বসে। সবাই একসঙ্গে খেতে বসলুম রান্নাঘরে নেমে—রেণু, আমি, বুদ্ধু ও বুদ্ধুর মামা। বুদ্ধুর মামা চন্দ্রনাথের এক পাণ্ডার কীর্তিকলাপ বলতেলাগল।

ডায়েরি লিখবার সময় বসে বসে ভাবলুম দশমীর দিন দেশে কাটাব।

এবার পাঁচ দিন পুজো—তাই আজও মহাষ্টমী। আজ সন্ধিপূজা। কাল রাত্রে সঙ্কল্প করেছিযে যখন এবার পাঁচ দিন পুজো-তখন দেশে দশমী কাটাতে হবে। সকালে উঠে বাইরের ঘরেবসেচি—রেণু এসে বল্লে, বাতাবিনেবু খাবেন? একটা ফিরিওয়ালার কাছে বাতাবিলেবু কিনেবাড়ির মধ্যে থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এল একটা প্লেটে করে। বল্লে—লেকে বেড়াতে যাবেন তো? আমি যাব আপনাদের সঙ্গে।

দুপুরে খুব ঘুমিয়ে উঠলুম আজ রাত্রে ট্রেনে জাগতে হবে বলে। মোটর এল, রেণুর দাদা, আমি, রেণু বেরিয়ে পড়লুম। শহর ছাড়িয়ে ছোট পাহাড়, বন্য কাঁটাল গাছ কেলেকোঁড়া লতা এত দূরেও দেখে অবাক হয়ে গেলুম। হ্রদটি জঙ্গলে ভরা, পাহাড়-বেষ্টিত, বৃষ্টি পড়তেলাগল—রেণুকে ছাতি দিলুম, সে কিছুতেই খুলবে না। জোর করে খোলালুম। একটা পাহাড়েরওপর উঠলুম সমুদ্র দেখব বলে, সামনে আর একটা পাহাড় দৃষ্টি আটকেচে।

বাড়ি ফিরে আমি বিছানাপত্র বেঁধে নিলুম। আমি, বুদ্ধু, রেণু একসঙ্গে খেতে বসলুম ওদের রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে। গাড়ি এল। রওনা হলুম স্টেশনে। সঙ্গে একজন লোক এল, বুদ্ধুতাকে পাঠিয়ে দিলে। তাকে কিছু বকশিশ দিলুম। ফেরিওয়ালা হাঁকচে—চাই বলবাশিংসু...

ঘুম হয়নি ট্রেনে, যদিও শুয়েই এসেছিলুম। লাক্সাম জংশন ছাড়িয়ে একটুখানিশুয়েচি—অমনি উঠে দেখি চাঁদপুর ঘাট। স্টিমারে এসে বেশ জায়গা পেলুম। যেমন ঝড়, তেমনবৃষ্টি। রাজবাড়ি, তারপাশা, মৈনট্ কত কি স্টেশন! ওই ঝড়-বৃষ্টিতে যখন নৌকা করে খাবারবিক্রি করতে আসচে, জলের ঝাপটায় ওদের ধারে যাবার জো নেই। বড় বড় নৌকা করেযাত্রীরা বাক্স-বিছানা, মোট-পুঁটুলি নিয়ে ছাতি মাথায় ভিজতে ভিজতে তীরে যাচ্ছে স্টিমারথেকে। বড় বড় চর, কাশবন। চরের মধ্যে লোক বাস করছে। স্টিমার খুব বেগে যাচ্ছে। কিন্তুসারাদিনের মধ্যে বৃষ্টি থামল না। একঘেয়ে বসে বসে ভাল লাগচে না। বেলা চারটার সময় গোয়ালন্দ ঘাটে স্টিমার এসে লাগল। ভাবলুম নিজের দেশেই যেন এলুম। এই তো গোয়ালন্দ পোড়াদহ এলুম—তো নিজের দেশ আর কতটুকু?

কলকাতা নেমে দেখি টরু আমার ঘরে বসে আছে। সে কলকাতা বেড়াতে এসেচে। আমি ট্রামে বিভূতিদের বাড়ি গেলুম। মন্মথ এসে বল্লে, না খেয়ে যেতে পারবেন না কিন্তু। খেতে রাতবারোটা হয়ে গেল। তখনো পথেঘাটে মেয়েছেলের হাত ধরে লোকে ঠাকুর দেখে বেড়াচ্চে।

সকালে উঠে বাগবাজারে গেলুম পশুপতিবাবুদের বাড়ি নীরদবাবুদের কি হল সেসন্ধানে। বাড়ি তো গেলুম, গিয়ে শুনি নীরদবাবুরা গিয়েচেন গালুডি। সেখানে চা খেয়েবউঠাকরুণের সঙ্গে গল্প করি। বউঠাকরুণ বিজয়ার প্রণাম সারলেন বিসর্জনের আগেই পায়ে হাত দিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে। আমিও তাই করি। বগলা এল, তার সঙ্গে সার্বজনীন দুর্গোৎসবদেখতে গেলুম বাগবাজারে। প্রতিমা বড় সুন্দর হয়েচে। দু'জন ছেলের সঙ্গে বগলা আলাপ করিয়ে দিলে এবং তাদের দেখিয়ে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বসল। তাকে কমল যেতে লিখেচেঘাটশিলায়। তার

সঙ্গে সুবর্ণরেখার ধারে বসে কাব্যালোচনা করবে বলে মহা উৎসাহে চলেছিল, কিন্তু ট্রেন ফেল করলে। আমি ওখান থেকে বাসায় এসেই ট্রেনে বনগাঁ রওনা হলুম।

দুপুরের পরে এসে বনগাঁয়ে পৌঁছুই। প্রফুল্লদের বাড়ি ঠাকুর বরণ হচ্চে। আমি, বীরেশ্বরবাবু, যতীনদা, মনোজ সবাই সেখানে গিয়ে বসি। একটু পরে বেলা পড়লে আমি ঘোড়ার গাড়ি করে বারাকপুর গেলুম বাঁওড়ের ধারে বিজয়ার আড়ং দেখব বলে। কতকাল দেখিনি গ্রামের মেলাটা। এবার যখন আছি দেশে, তখন একবার যাবার খুব ইচ্ছে হল। পথে খুব ভিড়, চালকীপোতা চাঁপবেড়ে থেকে বিজয়ার মেলা দেখতে আসচে লোকে বনগাঁ। চাষারমেয়েছেলেরা রঙিন কাপড় পরে আসচে। এই জোড়া বটতলা, এই রায়দের বড় বাগান—গ্রামে পৌঁছে গিয়েচি, আমাদের গাঁ!..কোথা থেকে কোথায় এসেচি দ্যাখ!

বাঁওড়ের ধারে ছেলেবেলাকার মতোই মেলা বসেছে। গোপালনগরের হাজারি ময়রাপাঁপড় ভাজচে, বাসন-বেচা কুণ্ডু পানের দোকান খুলেচে, গ্রাম্য নরনারী ছেলেমেয়ের ভিড়খুবই। বাঁওড়ে দশ-পনেরোখানা নৌকার বাচ্ খেলা হচ্ছে। শ্যামাচরণদা, ফণীকাকা, সাতুকাকা, বৃন্দাবন—এদের সঙ্গে দেখা হল। অমূল্য কামারের ছেলে এসে হাত ধরে বল্লে—কাকা, একটাপয়সা দিন না, পাঁপড় ভাজা কিনব। রায়দের বাড়ির ছেলেরা অমনি ঘিরে দাঁড়াল—আমাদেরওদিন। প্রকাণ্ড বড় বটতলায় মেলা হয়। ছায়া পড়ে এসেচে ঘন হয়ে। আমি যেন স্বপ্ন দেখচি। কোথায় চট্টগ্রাম, রেণু-কোথায় মেঘনা আর পদ্মা, কুমিল্লা জেলা, নোয়াখালি জেলা, আর কোথায় দাঁড়িয়ে আছি একেবারে আমাদের গ্রামে, বাঁওড়ের ধারে বিজয়ার আড়ং দেখছি।

সন্ধ্যা হয়ে আসচে, মেলার জায়গা থেকে বুড়ির বাড়ি এলুম। বুড়িকে কিছু দিলামবিজয়ার দিন—সে তো আমায় দেখে কেঁদেই আকূল। এখন যেন আর ভাল চোখে দেখতেপায় না—বড় বয়স হয়ে গিয়েচে। পুঁটিদিদিদের বাড়ি এসে দেখি বিলবিলের ধারে বসেপুঁটিদিদি বাসন মাজচে। খুকুদের বাড়িটা শূন্য পড়ে রয়েচে। ন'দিদিদের সঙ্গে দেখাকরলুম—তারপর সকলকে বিজয়ার প্রণাম করে কিশোর-কাকার বাড়ি এলুম। কিশোর-কাকা কিছুতেই ছাড়লেন না, বসিয়ে একটু জলযোগ করালেন। কতদিন কিশোর-কাকার বাড়ি বসেবিজয়ার দিন জলযোগ করিনি। তারপর অশথতলাটায় দাঁড়িয়ে একবার ভাবতে চেষ্টাকরলুম—কালও ছিলুম পদ্মার ওপরে স্টিমারে—রাজবাড়ি, বিক্রমপুর এপারে-ওপারেফরিদপুর, কোথায় সেই চন্দ্রনাথ পাণ্ডার বাড়িতে সেই ছোট্ট প্রতিমাখানা, সেই আমলকী গাছে ঠেস দিয়ে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে থাকা—আর কোথায় আমার বারাকপুরেরহেলা কাঁটালতলা!

চলে এলুম গাড়ি করে বনগাঁয়ে। হরিবাবুর বাড়ি... পটলের বাড়ি, বীরেশ্বরবাবুর বাড়ি বিজয়ার প্রণাম আলিঙ্গন সেরে ফেললুম। সুপ্রভাদের বাড়িতে তারাও বাবার বাড়ি বিজয়ারপ্রীতিসম্ভাষণ করচে পরস্পরে। খুকু—সুপ্রভা—রেণু—ওদের সকলকেই মনে মনে বিজয়ারপ্রীতি ও শুভেচ্ছা পাঠিয়ে দিই।

এবার ভারী চমৎকার পুজো কাটল। সপ্তমীতে প্রতিমা দেখলুম চট্টগ্রামে, অষ্টমীতে চন্দ্রনাথে, নবমীতে কলকাতায় বিভূতিদের বাড়ি, দশমীর প্রতিমা বনগাঁয়ে ও বারাকপুরে। আর কোথাও যাব না। চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেচে—ঘোড়ার গাড়ি যেন চলেচে ঘন বনবীথির মধ্যেদিয়ে বনগাঁয়ে। আমি বসে বসে চাটগাঁয়ের কথা, পথের কথা ভাবচি। সুপ্রভার কথা ভাবচি। কিসুন্দর জ্যোৎস্না, কি সুন্দর রাত্রি! বনপুষ্পের জ্যোৎস্নামাখা সুবাস সন্ধ্যার হিম বাতাসে।

আজ দিন-দশ-বারো এখানে এসেচি। ক'দিন খুবই ভাল লেগেছিল—এখনো লাগচে মন্দ নয়। বৈকালে কুঠীর মাঠের সেই জলাটার ধারে বেড়াতে যাই—বনে ঝোপে সর্বত্র বনমরচেফুলের সুগন্ধ। ওইখানের ঝোপগুলোতে কেলেকোঁড়া আর কেঁয়োঝাঁকার ফুল ফুটে গন্ধেআমোদ করছে—বিশেষ করে কেঁয়োঝাঁকার ফুল। কুঠীর মাঠের দিকে বনমরচে লতা বেশি নেই।রোদ রাঙা হয়ে আসে, তখনো পর্যন্ত বসে থাকি, আজ আবার এক রাখাল

ছোঁড়া জুটে গল্পকরে আমার চিন্তার ব্যাঘাত করতে লাগল। ফিরবার সময় আটির মাঠ দিয়ে গিয়ে বাঁওড়ের ধারের পথে পড়ি ও গোঁসাইবাড়ির সামনে দিয়ে বাড়ি ফিরি। আজ কি চমৎকার রাঙা মেঘকরেছিল সন্ধ্যার কিছু আগে! আমি গায়ের চেক্ চাদরখানা পেতে কতক্ষণ মাঠের মধ্যে বসেরইলুম ভূষণো জেলের কলাবাগানের পাশের জমিতে। এক পাশে আটির ডাঙায় নিবিড় বন, সামনে মুক্ত মাঠে বৈকালের ঘন ছায়া, মাথার ওপরে আকাশে ময়ূরকণ্ঠী রং, চারিধারে রাঙামেঘের পাহাড়পর্বত—যেন উঠতে ইচ্ছা করে না। সুপ্রভা কাল যে রুমাল ও বালিশের ঢাক্‌নিটাপাঠিয়েছে, তার সঙ্গে চিঠি ছিল, কাল তো নদীর ধারে মাঠে বসে হাট থেকে এসে পড়েছিলুম, কিন্তু সন্ধ্যার ধূসর আলোয় ভাল পড়তে পারিনি, আজও সেখানা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলুম। খুকু এবার এখানে নেই, সদাসর্বদাই তার কথা মনে হয়—দুপুরে সে যেন পাশের পথটা দিয়ে আসচে। এসেই বলচে—কি করচেন? চার পাঁচ বছর পরে এই প্রথম দীর্ঘ অবসানআমি বারাকপুরে কাটাচ্চি, যখন ও এখানে নেই। সেই জন্যই এখনো ওর অনুপস্থিতিতে অভ্যস্তহয়ে ওঠেনি মন।

ন'টার গাড়ি যাওয়ার শব্দ পাচ্চি, নিজের খড়ের ঘরটায় বসে আলো জ্বেলে ডায়েরিটা লিখচি। এখনো মশারির মধ্যে হারিকেন লণ্ঠন জ্বাললে গরম বোধ হয়—অথচ মশা এমন যেমশারি না খাটিয়ে লেখাপড়া করার জো নেই রাত্রে। দিনটা এখানে বেশ কাটে, রাত্রে অন্ধকারআর নির্জনতায় যেন হাঁপ লাগে। কারো বাড়ি গিয়ে একটু দু'দণ্ড গল্প করব এমন জায়গা নেই।পচা রায় ছিল, সে ডাক্তারি করতে গিয়েচে শুনচি আমডোরে।

আমাদের বাড়ির পেছনের ওই বাঁশবাগানটায় যে ডোবা আছে, আজ দুপুরে শুকনো বাঁশের খোলা পেতে রোদে ওখানে খানিকটা বসে ভারী ভাল লাগল। ঘন বাঁশবন, চারিদিকে বনমরচে ফুলের ঘন সুগন্ধ আমোদ করেছিল দুপুরের বাতাস—বরোজপোতার ডোবার ওপারেকখনো বসে দেখিনি কেমন লাগে। জায়গাটা বড় চমৎকার।

কুঠীর মাঠের অনেক বন কেটে ফেলেচে বেলেডাঙার চাষিরা। ওরা এবার অনেক জমি বন্দোবস্ত নিয়ে চাষ করচে। কুঠীর মাঠের বন আমাদের এ অঞ্চলের একটা অপূর্ব প্রাকৃতিকসম্পদ। কিন্তু কাকে তা বোঝাব!

আজকাল বনে-জঙ্গলে মাকড়সার নানা রকম জাল পাতা দেখি—দু'তিন বছর থেকেআমি এটা লক্ষ্য করচি। জাল গড়বার কৌশল ও বৈচিত্র্য আমায় বড় আনন্দ দেয়—কিন্তু আজসকালে কুঠীর মাঠে একটা জাল দেখেচি, যা একেবারে অপূর্ব। ঘাসের মধ্যে দুটি দূর্বাঘাসের পাতায় টানা বাঁধা ঠিক একটি এক-আনির মতো একটা মাকড়সার জাল। মাকড়সাটা প্রায়আণুবীক্ষণিক, তাকে খালি চোখে দেখা প্রায় অসম্ভব—একটা ঘাসের পাতা ধরে একটুখানি নাড়া দিতে একদিকের জাল যেন একটু নড়ে উঠল—কি যেন একটা প্রাণী নড়াচড়া করচেসেখানটাতে। ওই এক আনির মতো ছোট্ট জালটুকুই ওর জগৎ।

ন'টার গাড়িতে রাণাঘাট গেলুম অবনীবাবুদের বাড়ি। অমৃত-কাকা সঙ্গে গেলেন।বৈকালে ওখান থেকে বন্ধুর শ্বশুরবাড়ি। বন্ধুর স্ত্রী এখানেই আছে। রেলবাজারে নীরুর সঙ্গে দেখা, তার মুখে শুনলুম খিনু এখানে নেই। গোপালনগর নেমে ঘুটঘুটে আমি ও নন্দ ঘোষ বাজার পর্যন্ত এলুম। যুগলের দোকানে ভাগ্যিস বুদ্ধি করে লণ্ঠন রেখে গিয়েছিলুম ওবেলা।

আজ বিকেলে কুঠীর মাঠে গিয়ে সেই ঝোপটার পাশে ঘন অপরাহ্ণের ছায়ায় ঘাসেরওপর একটা মোটা চাদর পেতে বসে 'কেঁয়োঝাঁকা' ফুলের সুঘ্রাণের মধ্যে 'আরণ্যক'-এর একটাঅধ্যায়ের খসড়া করছিলুম। কি নীরব শান্তি, কি পাখির কাকলী, কি বনফুলের ঘন সুবাস! নানারকম চিন্তা মনে আসে ওখানে নির্জনে বসলে, আমি দেখেচি ঘরের মধ্যে বসে সেরকম খুবকম হয়। মনের আনন্দই তো সৃষ্টির গোড়ার কথা—দুঃখও বটে—কারণ আসলে অনুভূতিরগভীরতাটাই আসল, দুঃখেরই হোক বা আনন্দেরই হোক। আজ সকালেও বেলেডাঙারবটতলার পথটাতে

বেড়াতে গিয়েছিলুম, মাঠের মধ্যে সেই যে একটা ঝোপ আবিষ্কার করেছিলাম সেবার—তার পথটা বুজে গিয়েচে শেঁয়াকুলকাঁটায়, ঢুকতে পারা গেল না। নদীতেনেমে সাঁতার দিয়ে গিয়ে উঠলাম রায়পাড়ার ঘাটে।

সন্ধ্যাবেলা নিজের ঘরে বসে লিখচি, শিবুদের বাড়ি কলের গান হচ্চে দেখে শুনতেগেলাম। এইমাত্র ফিরচি। অন্ধকার রাত, অন্ধকার আকাশে কি অসংখ্য নক্ষত্রের ভিড়, কত জগৎ, কত পৃথিবী—Jeans, Eddington-দের ও-কথাই মানিনে যে এই পৃথিবী ছাড়া আর কোথাওমানুষের বাসের উপযুক্ত গ্রহ বা নক্ষত্র নেই। এই রকম পরিচিত গ্রামের পথ, ওই যেবকুলতলাটা, শিউলিতলাটা—যা কত দিনের স্মৃতিতে মধুর—আর কোথাও বিশ্বে এমননেই—স্রষ্টা বুঝি দেউলে হয়ে পড়েছিলেন কায়ক্লেশে পৃথিবীকে তৈরি করেই।

সে অনন্ত, বিরাট দেবতাকে প্রণাম করি। কে-ই বা তাঁকে চেনে, বোঝে বা জানে! যাঁরাজেনেছিলেন, তাঁরা কাউকে বলে বোঝাতে পারেননি বা সে চেষ্টাও বোধ হয়করেননি—অসম্ভব বলেই করেননি—সাধারণ লোকের জন্যে কতকগুলো মিথ্যে মনগড়াফকির সৃষ্টি তবু করে গিয়েচেন।

আজও বিকেল তিনটার সময় কুঠীর মাঠের জলার ধারে সেই ঝোপটাতে এসে বসে 'আরণ্যক'-এর একটা অধ্যায় লিখচি। লিখবার জন্যেই এই জায়গাটাতে এসেচি। ভারী সুন্দরবনকুসুমের গন্ধটা—চাঁপা ফুলের গন্ধটাই বেশি। আমার মাথার উপরে থোকা থোকা ফুলে ভরাডালটা দুলচে, এখন রোদ রাঙা হয়ে এসেচে যখন এটা লিখচি, জলার পাখির দল কি অবাধকূজন শুরু করেচে, গন্ধটা আরো ঘন হয়েচে। ওপারে গাছগুলোর বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরনেরশীর্ষদেশে রাঙা রোদ পড়ে কি সুন্দর দেখতে হয়েচে! পাখির দল উড়ে যাচ্চে। এইখানে বসে সুপ্রভার বিজয়ার চিঠিখানা পড়ছিলুম আজ। এইখানেই লেখা বন্ধ করি। সন্ধ্যা হয়ে এল। জগোদের নিয়ে হাজারির ওখানে গোপালনগরের কালীপুজোর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হবে সন্ধ্যার পরেই।

উঠে বাড়ি এসেজগো ও জিবুকে নিয়ে প্রথমে গেলুম বুড়ির বাড়ি। বুড়ি উঠতে পারে না, তাকে দেখেশুনে গোপালনগর গেলুম। দারিঘাটা পুলটার ওপর থেকে ছায়াপথটা কি চমৎকারদেখাচ্ছিল। কত নক্ষত্র, অসংখ্য, অসীম। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম পুলের ওপরে। হাজারিদেরবাড়িতে কালীপুজোতে প্রতি বৎসরই আনন্দ উৎসব হয়। এবার জিতেন, সুধীরদা ছিল—চট্টগ্রামভ্রমণের গল্প করলুম ওদের কাছে। বাড়ি ফিরতে হয়ে গেল রাত এগারোটা। নক্ষত্রের জ্যোতি আরো ফুটেচে। কালপুরুষ ন'দিদিদের উঠোনের ওপরেই উঠে এসেচে। আজ যে নক্ষত্রসংস্থান এই কালীপুজোর রাতে, পঞ্চাশ বছর আগেও এমনি উঠত, আমার ঠাকুরদাদা যখন শিশু তখনো এমনি উঠেচে, দুশো বছর আগে যখন শাঁখারীপুকুরের ধারে বর্ধিষ্ণু শাঁখারীর বাস ছিল তখনো এমনি উঠত। আবার পঞ্চাশ বছর কি দুশো বছর পরে ঠিক এমনি দিনে এমনি কালীপুজোর রাতে ওরায়ন ন'দিদিদের বাড়ির উঠোনের ওপরে এমনি উঠবে—কিন্তু তখন পাশের বাড়িরপথটা দিয়ে বিলবিলের পাশ দিয়ে খুকুও অমন আসবে না—কে কোথায় চলে যাবে। নতুন দলতখন আসবে পৃথিবীতে—তাদের হাসি কান্না প্রেম ভালবাসায় মুখর হয়ে থাকবে গ্রামেরবাতাস।

কাল এখান থেকে চলে যাব। পুজোর ছুটি ফুরিয়ে গেল। এবার খুকু ছিল না, তা হলেও কেটেছিল বেশ। বৈকেলে প্রায়ই কুঠীর মাঠে বনে ঝোপের ধারে বসে বিকেলটা কাটাতুম—ভারীআনন্দ পেতাম। এখন রাত্রি দশটা, আমার ঘরে নির্জনে বসে লিখচি। পুঁটি দিদি মাঝের গাঁ থেকেএসেচে, আমার জন্যে একটা ভাঙীর ফুলের ডাল এনেচে ফুলসুদ্ধ। শ্যামাচরণদাদাদের বাড়িএসে একটু গল্প করে এলুম। কাল গ্রাম ছেড়ে যাব, সকলের জন্যেই কষ্ট হচ্চে। গঙ্গাচরণ মনু রায়দের বাড়ি বসে ভাঙা হারমোনিয়াম বাজিয়ে বেসুরো গলায় সেকেল যাত্রাদলের গানগাইচে; মনে হচ্চে, আহা, ওই একটু গিয়ে বসে শুনে আসি। এদের সকলের জন্যেই কষ্ট হয়। গ্রামের এই সব লোক দরিদ্র, অশিক্ষিত—ওদের জীবনে কোনো আমোদ-প্রমোদনেই—জগতের কিছু দেখেওনি, শোনেওনি। সকলের

জন্যেই মন কেমন করে। মনু রায়দেরবাড়ির মেয়েরা বাঘ-আঁচড়ায় গিয়েছিল কালীপুজো দেখতে—এখন সব গরুর গাড়ি করে বাড়িএল।

সীতে জেলের নৌকোয় বিকেলে বনগাঁ এলুম। বেলা তিনটার সময় বেরিয়েচি, গাজনবাঁশতলার ঘাটে মাছ ধরচে, ফণীকাকা মাছ ধরচে চটকাতলার নীচে। চালকীর ঘাটে একটা লোকছিপে প্রকাণ্ড কাছিম বাধিয়েছিল, আমরা নৌকো নিয়ে কাছে গেলাম, সুতো কেটে নিয়ে কাছিমটা গেল পালিয়ে। সীতানাথ মাঝি বিশ বছর আগে নেপাল মাঝির নৌকোয় ভোলা ও বরিশালে গিয়েছিল—সে গল্প করতে লাগল, ওরা নৌকোতে কাজ করত, বাদুড়ে থেকে খাবার জন্যে চালডাল কিনত। নলচিটিতে সুপুরি কিনে বিক্রি করতে করতে বনগাঁ পর্যন্ত আসত—ওখানে সব বিক্রি হয়ে যেত। নৌকোতে মধু ছিল— চালতেপোতার বাঁকে ছায়াভরা সেই সুন্দর বনঝোপের কাছে এসে সে নৌকোর দাঁড় বাওয়া রেখে তামাক সাজতে বসল। রোদ ক্রমে রাঙা হয়ে এল, দুধারে বড় ঝোপ, সাঁইবাবলা বনের অপূর্ব শোভা! পুজোর ছুটিটাবারাকপুরে বেশ কেটেচে, বরোজপোতার ডোবার ওপারের কথা এখনো ভুলতে পারচিনে।এই বাঁশবাগানটায় কি যে একটা মায়া আছে! তারপর সাজিতলার বনটা এবার নতুন আবিষ্কার। সকলের চেয়ে আমার ওইটাই লেগেচে ভাল। কুঠীর মাঠের জলার ধারে ওই ডাঙাটা। সবই ভাল, কেবল সন্ধ্যার পরে লোক-অভাবে বড় নির্জন লাগে। নয়তো এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমাবেশ কোথায় আছে কলকাতার এত কাছে? সুপ্রভাকে পাঠাব বলে কিছু বনের ফুল সংগ্রহকরেছিলুম। কাল পাঠাব।

কাল বৈকালে খুকুদের ওখানে দেখাশুনো করে এলুম। বেশ কাটল বিকেলটা। যতীনদারবাড়ির ধারের ডোবাটাতে সকালে উঠে যেতে গিয়ে দেখি সাদা সাদা কচুরির ফুল ফুটে আলো করে রেখেচে। কি যে তার শোভা! আবার বেড়িয়ে ফিরবার সময় ঘণ্টা-দুই পরে দেখি সূর্যের কিরণে ফুলগুলোর রং এর মধ্যেই নীলাভ হয়ে উঠেচে। সূর্যের আলোয় কি যে রসায়ন বুঝলুম—ফুলগুলির কাছে ঘাসপাতায় কি ল্যাবরেটরি নিহিত, তাই বা কে বলবে? আমি দেখেভারী মুগ্ধ হয়েচি।

আজ সকালে রাম অধিকারী ডাক্তারের সঙ্গে দেখা মীর্জাপুর স্ট্রীটে। সে ধরে নিয়ে গেলতার বাড়ি। সেখান থেকে গল্পগুজব করে এসে বাড়িতে অভিভাষণের শেষটুকুলিখি। দুপুরেরপরে গেলুম সজনীর বাড়ি। ছেলেবেলায় রামকৃষ্ণ রায়ের পদ্য-মহাভারত একবার পড়েছিলুম, গ্রামে তখন কি একটা নিমন্ত্রণ ছিল। মা এক বাটি সুজি করে দিলেন খেতে অনেক দেরি হবেবলে, আর চালভাজা। আমি খেতে খেতে মহাভারতখানা পড়তে লাগলুম রান্নাঘরের মধ্যেবসে। কিন্তু সেদিন আর দেরি হয়নি, অল্প পরেই খাবার ডাক এসেছিল। আজ সেইমহাভারতখানা সকালে পড়তে পড়তে ছেলেবেলার সেই কথাই মনে পড়ছিল।

সজনীর বাড়ি অমিয় মোটর নিয়ে এল আমাদের নিয়ে যেতে। মনোজ বসু আমাদেরসঙ্গে যাবে বলে এসেচে। ওকে দেখে খুব খুশি হলুম। প্রেমেনকে তুলে নিলাম বরানগর থেকেবালী ব্রিজ পার হয়ে। আজকাল দক্ষিণেশ্বরে একটা রেলওয়ে স্টেশন হয়েচে জানতুম না।শ্রীরামপুরে টাউন হলে যখন আমরা পৌঁছুলাম তখন চারটে বেজেচে। লোক আসতে শুরু হয়েচে। সভার কাজ আরম্ভ হল। প্রথমেই কথাসাহিত্য শাখার কাজ আরম্ভ করবার জন্যে সবাইমত দিলে। কাজেই আমার অভিভাষণ প্রথমেই পাঠ করতে হল। তারপরে প্রেমেনের। বেশ বিকেলটা। সভার কাজ করতে করতে ডাইনের বড় জানলা দিয়ে অপরাহ্ণের আকাশ ও একটা তালগাছের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছিল আগে শ্রীরামপুরে আসতুম জ্ঞানবাবুর সঙ্গে—সে এক ধরনের দিন ছিল। আমাদের গ্রামে আমার খড়ের ঘরখানার কথাও মনে হল। বকুলতলায়ওএমনি ছায়া পড়ে এসেচে, এই তো সেদিন ছেড়ে এসেচি, কিন্তু তাদের কথা মনে হচ্চে।

সভার কাজ শেষ হবার কিছু আগে আমি চলে এলুম বিনয়দাদের বাড়ি। হরিদাস গাঙ্গুলীসামনের রবিবার শেওড়াফুলি যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। দিদিদের বাড়ি দেখলুম শান্তি এসেচে, মানুও আছে। শান্তি আমার অনেক বই

পড়েচে, বলতে লাগল। ওখান থেকে উঠেলীলাদিদিদের বাড়ি এলাম। লীলাদিদি না খাইয়ে ছাড়লেন না। তারপর ট্রেনে আমি, প্রেমেন, সুরেন গোস্বামী একসঙ্গে এলুম। মনোজদের দল আগের ট্রেনে চলে গিয়েচে সভা ভাঙতেই।বেশ কাটল রবিবারটা। কাল স্কুল খুলবে। পুজোর ছুটি আজই শেষ হল।

ঘুমিয়ে উঠেই মনে পড়ল বহুদিনের কথা—যখন আমরা কেওটা থেকে ফিরচি— আমার বয়স ছ'বছর—রাজি ও পটিদিদি আমাদের বাড়ির সামনের পথে বাঁশের খোলা ও ধুলো নিয়ে খেলা করচে। ওরাও তখন নিতান্ত বালিকা। আজ এতক্ষণ পাগলা জেলে গিয়েনদী থেকে নেয়ে এসেচে। কারণ সাড়ে এগারোটার ট্রেনে সে গিয়েচে—ওর কথা ভাবতেই মনে পড়ল।

বারাকপুরকে মধুর করে গিয়েচে কত লোক। পিসিমা ছেলেবেলায়। মা, চক্কত্তি-খুড়িমা, জ্যাঠাইমা, সইমা, মণি আর একটু বেশি বয়সে। প্রথম যৌবনে গৌরী। এদের দান কত বড় তাইভাবছিলুম। সেই পিসিমার উঠোন ঝাঁট দেওয়া, হেমন্তের এক বিকেলে হঠাৎ কোথায় অন্তর্ধান। সেই গৌরী তাকের কোণে কি একটা নিতে এল। সদ্যস্নাতা কিশোরী, ভিজে চুল পিঠে দুলচে।আমি কাছেই তক্তপোশে বসে পড়চি পুরানো বই—আমার দিকে চেয়ে লাজুকচোখেহাসলে—তারপর সেও কোথায় গেল চলে। মা'র কত দিনের কত ভালবাসা মনের মধ্যে গাঁথারয়েচে।

এখন যারা বারাকপুরে বাস করে তারা জানে না বারাকপুর কি। এখানে যে দেবী বাসকরেন, সৌন্দর্যময়ী রহস্যময়ী গ্রাম্যদেবী—বরোজপোতার বাঁশবনে রাঙা-রোদ, সন্ধ্যাবেলায়তাঁর আসন পাতা, আমি যেন কতবার একলা সেখানে বেড়াতে গিয়ে দেখেচি। আর কেউ দেখেনি।

একসঙ্গে সবাই দেহ ধরে পৃথিবীতে এসেচি অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে। সবাই, পৃথিবীসুদ্ধনরনারী একই সময়ে যারা পৃথিবীতে এসেচে—পরস্পরের আত্মীয়। তাদের উচিত পরস্পরকেসাহায্য করা, পরস্পরকে elevate করা। কিন্তু অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবে থাকার জন্যেইপরস্পরকে শত্রু বিবেচনা করে। নইলে কি স্পেনে উড়োজাহাজ থেকে বোমা ফেলে অসহায় শিশু ও নারীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারত আজ?

মনে পড়ল, পিসিমা শীতের বদলে 'জাড়' কথাটা ব্যবহার করতেন, ছেলেবেলায়শুনেছি। এখন আর কারো মুখে আমাদের গাঁয়ে ও-কথাটা শুনিনে।

আজ বিকেলে P.E.N. Club-এর একটা বিশেষ অধিবেশন ছিল, সরোজিনী নাইডু ছিলেন প্রধান অতিথি। তিনি বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন— তাই এই বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সকালে আজ কলেজ স্কোয়ারে যখন বেড়াতে যাই, তখনো আমি জানতুম না যে ব্যাপারটা আজই হবে। সরোজ ও গিরিজাদা ছিল স্কোয়ারে, আমি আর রমাপ্রসন্ন তো আছিই। ওখানেই সরোজ কথাটা বল্লে, কারণ আমি তখনও পর্যন্ত চিঠি পাইনি—তারপর বেড়িয়ে এসে পত্র পেলাম।

নীরদবাবুর সঙ্গে গেলাম, চৌরঙ্গীতে একটা রেস্তোরাঁতে হচ্ছে। খুব বেশি লোক হয়নি, জন চল্লিশ। মেয়েদের মধ্যে শান্তা ও সীতা দেবী। আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সুরেশবাঁড়ুয্যে, সরোজ চৌধুরী, সুধীরবাবু, মণি বোস—এই রকম জনকতক। খগেন মিত্র ও হুমায়ুনকবীর একটু দেরি করে এলেন।

সরোজিনী নাইডু দেখলুম অদ্ভুত কথা বলতে পারেন। মেয়েদের মধ্যে অমন সুবক্তা আর অমন নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ মেয়ে আমি খুব কমই দেখেচি। ইংলন্ডের নানা সাহিত্যিকদের সঙ্গেতরুণ বয়সে কি ভাবে ওঁর প্রথমে আলাপ হয়, সে বিষয়ে অনেক গল্প করলেন, ভারতেরঅন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের কথা এত ভাল লাগছিল আমার যে আরো দু'ঘণ্টা বল্লে যেন ভাল হয়, এমন মনে হচ্ছিল।

ওখান থেকে সোমনাথবাবুর ও সুশীলবাবুর বাড়ি হয়ে ফিরলুম নীরদবাবুর বাড়িতে।ওরা 'বিচিত্রা'র সম্পাদক হওয়ার জন্যে আমায় বিশেষ অনুরোধ করচে, কিন্তু আমি রাজীহইনি। সুশীলবাবু আজ বিশেষ পীড়াপীড়ি করলেন। আমার তো ইচ্ছে নয়।

ঈদের ছুটিতে শুক্রবারে বনগাঁ এসেচি। একদিন রাজনগরের মাঠে গিয়ে বিকেলে বসি।

ঠিক যেন ইসমাইলপুরের সেই সোঁদামাটির ও কাশের গন্ধ। পরদিন চলে গেলুম বারাকপুরে। পুঁটিদিদি একা বাড়ি আছে। বরোজপোতার ডোবার ধারের বাঁশবাগান শীতের দুপুরে কি সুন্দরইহয়েচে। দুপুরের পরে গেলুম কুঠির মাঠে ইন্দুদের বাড়ি খেয়ে। ছোট এড়াঞ্চির গাছে মুকুল ধরেচে—নির্জন মাঠ, ভূষণ জেলের পুরোনো কলাবাগানের বাঁশবনে আবার। তারপর হেঁটেবনগাঁয় এলুম সন্ধ্যার পরে।

আজই সকালে দেশ থেকে ফিরেচি। দেশে ভারী চমৎকার কাটল, যদিওখুকুছিল না, কেউ ছিল না। একাই পুঁটিদিদিদের ঘরে থাকতুম, সকালে বিকেলে নিজে খাবার তৈরি করেখেতুম, কঞ্চি কাটতুম, জল আনতুম, কাঠ ও বাঁশের শুকনো খোলা কুড়িয়ে আনতুম। আররোয়াকে বসে 'আরণ্যক' লিখতুম, খুকুদের বাড়ির দিকের নেবুতলার ঘাটে ফিরে সেই মেয়েটিআসচে না বসে বসে ভাবতুম। এবার বারাকপুর একেবারেই শূন্য। তবুও বেশ লেগেচে।দুপুরের পরে ভূষণ মাঝির জমিতে একটা খেজুর গাছে ঠেস দিয়ে দিয়ে বসে লিখতুম। ছোট এড়াঞ্চি ফুলের কি শোভাই হয়েছে চারিধারে! একদিন বেলেডাঙার পথে আমি ও ইন্দু বসে কতক্ষণ গল্প করি। নীল আকাশের তলায় বটতলার কোলে সাদা বক উড়ছে। আমি বসে ভাবচিকে বলেছে আপনার সুখ্যাতি শুনতে বেশ ভাল লাগে। তাই তো শুনতে চাই।

একদিন চালকী গেলুম শিবে বাগ্‌দীর বাগানে রস খেতে। বড় বটগাছটার তলায় সে বসে বসে ভূতের গল্প করলে। একদিন আইনদ্দির বাড়ি গেলুম বিকেলে—তার এক ছোট নাতি বই নিয়ে আমার কাছে এল। বাড়ির মেয়েরা দেখতে লাগল, বনগাঁয়েও খুব হৈ হৈ করা গেল। রোজ রোজ ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আড্ডা হত। একদিন দেবেনের মোটরে সুপ্রভার চিঠি আনতে গোপালনগরে গেলুম বনগাঁ থেকে—সেদিন হাজারীর বাড়ি কলকাতা থেকে বড়ডাক্তার গিয়েচে অনুকূলের মেয়ের চিকিৎসা করতে। তাদের সঙ্গে খুব আনন্দ হল। এক মুচিবুড়িকে কাপড় দিতে আসবার আগের দিন সর্ব পরামাণিকের বাগান দিয়ে নেমে ওর বাড়ি গেলুম। বেশ লাগল সে সকালটা। ইন্দুর বাড়ি সন্ধ্যায় বসে নানা গল্প হল—আগুন করে আমতলায় ন'দি ও খুড়িমা পোয়াত।

কিন্তু সকলের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা মুসলমান বুড়ি মারা গেল, আমি তখন ওখানে।তার কবর দেওয়ার সময়ে আমি কতক্ষণ আমতলায় বসে কালু মুসলমানের সঙ্গে গল্প করলুম; আর রাধাবল্লভ বোষ্টমের বাড়ির পাশের পথটা দিয়ে এলুম কতকাল পরে এক সন্ধ্যায় বুড়িকেদেখতে। তখনো সে বেঁচে ছিল—পরদিন সকালে মারা গেল।

আজ একটা স্মরণীয় দিন।

সেনেটে বিজ্ঞান কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অধ্যাপক ক্লিওরের বক্তৃতা ছিল—সেখানে খুবভিড় হয়েচে শুনতে গিয়ে দেখি। আগের বেঞ্চিগুলো প্রতিনিধিদের জন্যে রিজার্ভ আছে, কিন্তুআমার খুব ইচ্ছে অধ্যাপককে দেখা—কাজেই আমি এগিয়ে প্রতিনিধিদের বেঞ্চি দখল করেবসলুম। কি আর করি! আমার আসনের পেছনে মেয়েদের আসন, সেখানে একটি মেয়েকে যেন সেদিন ইন্দিরা দেবীর ওখানে দেখেচি। বক্তৃতা তো শেষ হল, ভিড়ের মধ্যে আমি সেনেটেরপূর্বদিকের হলে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় তিনটি লম্বা-চওড়া সাহেব হলে ঢুকতে গিয়ে ঢুকবারজায়গা না পেয়ে একটা করে চেয়ার পেতে একপ্রান্তে বসল। আমার মনে হল এদের মধ্যেএকজন সাহেব Sir James Jeans, মূল সভাপতি।

গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—আপনি কি স্যার জেমস্ জিনস্?

—হাঁ।

—আপনার বক্তৃতা কবে হবে? আমি আপনার বইয়ের একজন ভক্ত। আপনারঅধিকাংশ বই পড়েচি।

বক্তৃতা হবে বুধবারে।

—বিষয় কি?

নেবুলা।

দার্জিলিং ও হিমালয় আপনাদের কেমন লাগল?

—চমৎকার।

—আপনাকে আর একটি প্রশ্ন জিগ্যেস করব, আমাকে সময় দেবেন কি?

—আমার গলা ধরেচে ঠাণ্ডা লেগে, কথা বলতে কষ্ট হয়।

আমি নাছোড়বান্দা। বল্লুম—দয়া করে এক মিনিট সময় দেবেন?

—কি বলো?

—আপনার নাম কি ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর সাইকিক্ রিসার্চসের সঙ্গে জড়িত আছে?

—না, কখনো না। আমি ও-জিনিস বিশ্বাস করি না।

ইতিমধ্যে একটি মেমসাহেব অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে এগিয়ে এল দেখে আমিও আমারপকেট থেকে মোহিত মজুমদারের পাটনার অভিভাষণখানা বার করলুম—এই একমাত্র কাগজ যা আমার পকেটে ছিল। স্যার জেমস্ মেমটির অটোগ্রাফ লেখা শেষ করে তাকে জিগ্যেস করলেন—আমি কি তোমার এই পেনটি ব্যবহার করতে পারি?

তারপর আমাকে অটোগ্রাফ দিলেন।

সেনেট হলের মধ্যে আমিও ঢুকলাম স্যার জেমস জিনসের পিছু পিছু। ওঁদের কাউন্সিলেরমিটিং বসবে—ডা. শিশির মিত্র মঞ্চ থেকে লোকের ভিড় সরাতে ব্যস্ত। শিশিরবাবুকেবল্লুম—এঁদের মধ্যে এডিংটন আছেন? শিশিরবাবু বল্লেন—না।

ড. কালিদাস নাগ আমাকে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন ডা. অ্যালবার্ট ডেভিস মিড-এর সঙ্গে। তাঁর স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন। দু'জনের সঙ্গে করমর্দন করলুম ও কার্ড বিনিময় হল।আমি তাঁরও অটোগ্রাফ নিলুম।

ভুলে আমার ফাউন্টেন পেনটা ডা. মিড-এর কাছে রেখে গিয়েছিলুম, সেনেট হল থেকেবার হয়ে ট্রাম লাইনের কাছে গিয়ে মনে পড়ল। ফিরে এসে সেটা আবার নিলুম।

স্যার জেমস্ জিন্স-এর সঙ্গে আলাপ করেচি! স্মরণীয় দিন না জীবনের?

আজ সারাদিনটি কি অপূর্ব আনন্দে কাটল! এমন দিন কটাই বা আসে জীবনে! প্রথমেতো সকালে বিশ্বনাথ এসে বনগ্রাম সাহিত্যসম্মেলনের কথা বল্লে। দেশে এমন একটাসাহিত্যসভা হবে শুনে খুবই আনন্দ হল। সেই আনন্দ নিয়েও যদি কমল সরকার আমাদেরদেশে যায়, তবে সে কেমন গান গাইবে পুঁটিদিদিদের ভাঙা রোয়াকে বসে বসে—সে কথাভাবতে ভাবতে তো স্কুলে গেলুম। স্কুল থেকে বিকেলে সুধীরবাবুর দোকানে গিয়ে শুনি আজস্যার জেমস্ জিন্সের বক্তৃতা শোনা যাবে না। কার্ড বিলি করা হয়েচে, বিনা কার্ডে ঢুকতেদেবে না,

মণীন্দ্রলাল বসু ওদের নাকি বলেচে। আমি মনে মনে ভাবলুম, এই কলকাতা শহরেএমন কোনো লোক নেই যে আজ আমায় Jeans-বক্তৃতা শুনতে বাধা দেয়! দেখি ঢুকতে পারিকিনা!

গিয়ে দেখি সেনেটের সব দরজা বন্ধ। পেছন দিয়ে আশুতোষ মিউজিয়মে গিয়ে দেখিসেদিকেরও দরজা বন্ধ। তখন পূর্বদিকের দালানের কোণের দরজা খোলা দেখে সেখান দিয়েঢুকলুম। দেখি অত বড় হলে মাত্র ছ'জন প্রাণী উপস্থিত। একজন তার মধ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞানজগতের লোক সুধাংশু। সে আমায় ডাকলে। তার কাছে গিয়েই বসলুম। কিছু পরেসোমনাথবাবু সস্ত্রীক এলেন। ডা. সুশোভন সরকার এলেন, আমাকে দেখে পাশে এসেবসলেন। একটু পরে ভীষণ ভিড় জমে গেল। দরজা সব বন্ধ, দরজায় লোক ধাক্কা মারতেলাগল। ভিড় ঠেলে দেখিনুটুআসছে।নুটুসামনের দিকে গেল। বি. এম. সেন, মাইক্রোফোনের কাছে দাঁড়িয়ে বল্লেন—Ladies & Gentlemen, Sir James Jeans has arrived andIam only testing the microphone—একটা খুব হাসির রোল উঠল। একটু পরে জিন্সবক্তৃতা আরম্ভ করলেন। যখন যে স্লাইডখানা পড়ে পর্দায় আমি অমনি বলি ওরায়ন, নেবুলা, এটা এন্ড্রোমিডা, সিফিড ভেরিয়েবলস্-এর কথা Jeans তুলতেই সুশোভনবাবুকে বললুম। নিজের ওপর নিজের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। পেছনের সন্ধ্যার আকাশে দূরে একটা গ্রামের এক মেয়েবলেছিল—আপনার সুখ্যাতি শুনতে ভাল লাগে—সেই কথা, সেই বাঁশবন, সেই বকুলতলা, সেই ছোট এড়াঞ্চি ফুলে ভরা নির্জন মাঠ—বার বার মনে হচ্ছিল—আর মনে হচ্ছিল শিবুর বাবাকে। আজ ফি-এর টাকা পাঠিয়ে দিয়েচি—শিবুর ম্যাট্রিকের ফি, গরিব লোক, কালহাটবেলা, পিয়নে যখন টাকা দেবে, কি খুশিই হবে! পশুপতিবাবু যে কাল ফোনেবলেছিল—আপনি মিডিয়ম ভালই, তামার তার ভিন্ন কি বিদ্যুৎ চলে? খুব ভাল কথা।

বক্তৃতা-অন্তে কালিদাস নাগ ও সেই পরশুকারের অ্যালবার্ট ডেভিস্ মিডের সঙ্গে দেখা। কালিদাসবাবুবল্লেন—রবিবার দুপুরে কোনো এনগেজমেন্ট নেবেন না, বিভূতিবাবু।

আমার বোধ হয় উনি কাল পার্টি দেবেন বৈদেশিক ডেলিগেটদের।

বাইরে আসবার পূর্বে ডা. মেঘনাদ সাহার সঙ্গে দেখা। বল্লুম—মেঘনাদদাদা, ময়দান ক্লাবের কথা মনে আছে? ১৯১৪ সালের?

ট্রাম লাইনের কাছে সেনেটের সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়েই দেখি জিনস্-এর বক্তৃতার সেই কালপুরুষ উঠেচে বিদ্যাসাগরের মূর্তির মাথার ওপরকার আকাশে। এই পাশের কার্নিসে বসে মাধববাবুর বাজার থেকে ফুলুরি কিনে খেতুম যখন ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র—সে কথা মনে পড়ল। সেও এই শীতকাল। তখন কোথায় কি ? কোথায় সুপ্রভা, কোথায়খুকু, কোথায় আমি। সুপ্রভার কথা বড্ড মনে হচ্ছে। যদি এ সময়ে সে আসত! যখন যে মেয়ে হলে ঢোকে, তখনই আমিদেখি সুপ্রভা যদিতাদের মধ্যে থাকে!

নীরদবাবু ও কান্তিবাবু রাস্তা পার হচ্ছেন, বল্লেন—কত খুঁজলুম আপনাকে।সোমনাথবাবুর মুখে শুনলুম আপনি এসেছেন। কাল যাবেন ঠিক সাড়ে চারটার সময় 'বিচিত্রা' সম্পর্কে পরামর্শ আছে।

সুধীরবাবুর দোকান হয়ে রমাপ্রসন্নের বাড়িতে বসে আশু সান্ন্যাল ও রমাপ্রসন্নের স্ত্রীরসঙ্গে গল্প করে বাসায় এসে দেখি সুপ্রভা পত্র লিখেচে। সে আসচে ২৫শে জানুয়ারি কলকাতায়। কি আনন্দ যে হল! এখন যদি আসে তবে তো! তার কথার কোনো ঠিক নেই।

Eddington-এর বক্তৃতায় সেনেটে বড় কড়া ব্যবস্থা ছিল। ও দু'দিন খুব ভিড় ছিল বলেএ ব্যবস্থা এরা করেচে। দিনগুলো বড় ব্যস্ততা ও engagement-এর মধ্যে দিয়ে কাটচে। Dr. Fisher-এর সত্যেন বোসের তর্কযুদ্ধ সেদিন বেশ উপভোগ করা গেল বেকার ল্যাবরেটরিতে। আজ সকালে সজনীর বাড়ি থেকে সাড়ে ন'টার সময় আসচি, দেখি খুব ভিড় সেনেটে। ঢুকে দেখি লর্ড হারবার্ট স্যামুয়েলের বক্তৃতা হচ্ছে, বিষয় 'Basis of Philosophy'. Sir

James Jeans সভাপতিত্ব করচেন—তারপর জিন্‌সকে ভলান্টিয়ারেরা ঘিরে নিয়ে এসে গাড়িতে উঠিয়ে দিলে—ওদিকে বক্তৃতা-মঞ্চে লর্ড স্যামুয়েলকে বহুলোকে ঘিরেচে বক্তৃতা-মঞ্চের ওপরেঅটোগ্রাফের জন্য। জিনস্ অনেকক্ষণ মোটরে বসে ডা. কমল মুখার্জির সঙ্গে কি বিষয়ে কথাবলার পরে মোটর থেকে নেমে লর্ডস্যামুয়েলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। লর্ড স্যামুয়েলকেবল্লেন—Iwill see you after lunch. এইটুকু মাত্র আমার কানে গেল। তারপর লর্ডস্যামুয়েল গভর্নরের মোটরে চলে গেলেন। বহুলোক জড়ো হয়েছিল সেনেটের সামনের রাস্তায় এঁদের দেখবার জন্যে।

দু'টো বিষয়ে দু'টো অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটল দিনকয়েকের মধ্যে, তাই সেটা এখানে লিখেরাখলাম। প্রথম কথাটা আগে বলি। ১৯১৩ সালে যখন আমি বনগাঁয়ে বিধুবাবুর ওখানে থাকি, ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্র, তখন নতুন 'ভারতবর্ষ' বেরুল। মন্মথবাবু মোক্তার আমাকে তখন 'ভারতবর্ষ' পড়তে দিতেন। 'ভারতবর্ষ'-তে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন নতুনলেখকের গল্প পড়ে অল্প বয়সেই মোহিত হয়ে যাই। ভাবি, এমনধারা লেখক তো কখনো দেখিনি—কত তো গল্প পড়েচি! তারপর বহুদিন কেটে গিয়েচে, যাক্।

গত রবিবার সেই বনগাঁয়ে সেই মন্মথ মোক্তারের বৈঠকখানায় বসে গল্প করচিঅনেকে—এমন সময়ে অপূর্বর ছেলে অরুণ একখানা অমৃতবাজার পত্রিকা হাতে দিয়েবল্লে—শরৎবাবু মারা গিয়েচেন, এই যে কাগজ।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ কাগজখানায় বেরিয়েচে, রবিবারে তিনি বেলা দশটার সময় মারাগিয়েচেন।

কি যোগাযোগ তাই ভাবি। কত জায়গায় বেড়ালুম, কত দেশে গেলুম, কত লোকের বৈঠকখানায় বসলুম—কিন্তু শরৎচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ কোথায় পেলুম—না সেই বনগাঁয়ে, সেই মন্মথ মোক্তারের বৈঠকখানায়, যে আমায় অত বছর আগের শরৎচন্দ্রের লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচয় করে দিয়েচিল!

ভাববার কথা নয়?

এইবার অন্যটার কথা বলি। সেটা ঘটল আজ এখুনি, এই সন্ধ্যার সময়।

১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে আমি মীর্জাপুর স্ট্রীটের একটা উড়ে ঠাকুরের হোটেলেদিনকতক খেতুম। উড়ে ঠাকুরটার নাম সুন্দর ঠাকুর। সে এখনো আছে বেঁচে, তবে ওখানকার হোটেল সে আজ ১৫/১৬ বছর উঠিয়ে দিয়েচে। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে পথেঘাটে দেখাশোনাহয়।

এখন এই ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাস আমার জীবনে বড় শোকাবহ দুর্দিন—হাতেনেই পয়সা, মনেও যথেষ্ট অবসাদ ও হতাশা। গৌরী সেবার মারা গিয়েচে। সুন্দর ঠাকুরেরদোকানে রাত্রেগিয়ে লুচি খেতুম—কোথা থেকে যে দাম দেব না ভেবে খেয়েই যাচ্ছি, খেয়েই যাচ্ছি।

তারপর সুন্দর ঠাকুরের হোটেল উঠে গেল, সেখানে অন্য কি দোকান হল। আমিও চলে গেলুম কলকাতার বাইরে। জাঙ্গিপাড়া, হরিনাভি, চাটগাঁ, কুমিল্লা, ভাগলপুর, মুঙ্গের নানাস্থানে—কোথায় বা না গিয়েচি চাকরি নিয়ে? বহুকাল পরে কলকাতায় ফিরে আবার যখন এইখানেই চাকরি নিলুম, মীর্জাপুর স্ট্রীট দিয়ে যাবার সময় সুন্দর ঠাকুরের হোটেলের ঘরটা প্রায়ইচোখে পড়ত। ভাবতুম পুরোনো দুর্দিনের ঘটনা, ওই ঘরটায় সেদিন আমার সেই মেঘাচ্ছন্ন দিনগুলির স্মৃতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়ানো—না ভেবে পারিনে।

আজ একটা বালিশের খোলে তুলো ভর্তি করার দরকার হল। পাটনায় বক্তৃতা আছেশনিবার, সেখানে যেতে হবে, অথচ ভাল বালিশ নেই। মীর্জাপুর স্ট্রীটে এক জায়গায় একটাতুলোর দোকান। দোকানে বসে তুলো ভর্তি করে উঠতে যাচ্ছি এমন সময়ে নজর করে দেখলুমএটা সেই পুরোনো দিনের সুন্দর ঠাকুরের সেই হোটেলের ঘরটা। আজকাল সেখানে তুলোরদোকান হয়েচে।

মনে পড়ল এও জানুয়ারি মাস এবং ১৯১৯ সালের পরে আজ এই প্রথম আবার সেইঘরটাতে ঢুকে বসলুম। তারপর ফিরে আসচি হঠাৎ মনে পড়ল বালিশের খোলটা সুপ্রভা তৈরি করে পাঠিয়ে দিয়েছিল কিছুদিন আগে। কি অভাবনীয় যোগাযোগ!

কাল হাওড়া স্টেশনে ট্রেন অত্যন্ত দেরিতে এল। রাত্রে ঘুম ভাল হয়নি। একে তোবেজায় শীত, তার ওপর কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ উঠেছে দূর মাঠের মাথায়। ট্রেনের জানালা খুলেসেই শীতের মধ্যেও হাঁ করে চেয়ে আছি। সৌভাগ্যের বিষয় একটা কামরা আমরা একেবারেখালি পেয়েছিলুম, অরবিন্দ গুপ্ত নামে এক ভদ্রলোক (অত্যন্ত সুপুরুষ লোক, আমি অমন সুপুরুষ খুব কমই দেখেচি) সপরিবারে পশ্চিমের দিকে যাচ্ছেন, তারাই কেবল ছিলেন আমার কামরাতে, আর কেউ নয়। একখানা পুরোনো ডায়েরি ছিল আমার কাছে বাবার, তাতে পড়ে দেখাযায়—বাবা ১২৮৭ সালের দিকে পশ্চিম ভ্রমণে বেরিয়ে এই পাটনা, মুঙ্গের, আগ্রাতেএসেছিলেন।

ভোর হল শিমুলতলা স্টেশনে। আর বছর যখন পাটনা আসি আমি, সজনী, নীরদ, ব্রজেনদা—ভোর হয়েছিল কিউল স্টেশনে। অরবিন্দবাবুটি অতি ভদ্রলোক, আমাকে খাবার খেতে দিয়ে বল্লেন—একটু মিষ্টিমুখ করুন। অথচ তিনি আমায় জানেন পর্যন্ত না।

রৌদ্র উঠল কিউলে। বিহারের দূরবিসর্পী প্রান্তর, অড়রের ক্ষেত, সরিষার ক্ষেত, খোলারবাড়িওয়ালা গ্রাম, চালে চালে বসতি, ইঁদারা, ফণী-মনসার ঝোপ, মহিষের দল আসতে আরম্ভহয়ে গিয়েচে। শিমুলতলায় পাহাড়ের শোভা যদিও তেমন কিছু দেখলুম না তবুও শেষরাত্রের জ্যোৎস্না সাঁওতাল পরগণার উচ্চাবচ প্রান্তর ও ছোটখাটো পাহাড়রাজি দেখতে দেখতে এতবিভোর হয়ে গেলুম যে ঘুম কিছুতেই এল না।

পাটনা স্টেশনে মণি ও কলেজের ছাত্রেরা নামিয়ে নিতে এসেচে। তার আগে বক্তিয়ারপুর স্টেশনে কালী ও পশুপতি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল দেখা করবার জন্যে। অনেকদিন পরে ওদের সঙ্গে দেখা হল। মণিদের বাড়ি আসবার কালে মোটরটা বড় ঘুরে এল—কারণ একজায়গায় রাস্তায় পিচ দেওয়া হয়েচে নতুন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আজকাল পাটনাতেই রয়েচে, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেবল্লে, এ জায়গা ভাল লাগছে না, বাংলাদেশে ফিরতে চায়। তারাশঙ্কর একজন সত্যিকার ক্ষমতাবান লেখক, বাংলার মাটি থেকে ও প্রাণরস সঞ্চয় করচে, ওর কি ভাল লাগে এসবজায়গা?

মণিদের ছাদের ওপরে দুপুরের নীল আকাশের তলায় বসে এই অংশ লিখচি। সুপ্রভাকে একটা চিঠি দেব। দূরে তালের সারির মাথায় অনেকটা দূর দেখা যাচ্চে, এই নিস্তব্ধ দুপুরে সুদূর বাংলার একটি সজ্‌নে ফুল বিছানো পল্লীপথের কথা মনে পড়চে, একটি সরলা পল্লী বালিকাএসময় কি করচে সে কথাও ভাবচি।

ছাদের ওপর যোগীনবাবুর দুই নাতনি খেলতে এসেচে আর বলচে—

চু কপাটি আইয়া

যাকে পাবে ভাইয়া...

এ কি রকম খেলার ছড়া? বাংলাদেশে তো এ ছড়া কোনো ছেলেমেয়ের মুখে শুনিনি!

পাটনা কলেজের হলে মিটিং। সেখানে অনেকদিন পরে অমরবাবুকে দেখে বড় আনন্দপেলুম। সেই ভাগলপুরের অমরবাবু! ইনি শুনলুম এখন এখানে রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারি, কিছুদিন আগে এখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তারাশঙ্করও উপস্থিত ছিল, ও আজকালএখানেই থাকে মামার বাড়িতে। সভার টেবিলে বাবার পুরোনো ডায়েরিখানা পড়ে দেখছিলুমতিনি পাটনায় এসেছিলেন কবে। ঠিক সাড়ে ছ'টার সময়ে সভা থেকে উঠতে হল, তারাশঙ্করকে সভাপতির আসনে বসিয়ে চলে এলুম, সঙ্গে সঙ্গে এলেন অমরবাবু। ডক্টরবিমানবিহারি মজুমদার পিছু

পিছু এসে বল্লেন—একটা কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্চে, আপনাদেরবিরুদ্ধে অভিযোগ, আপনারা কলকাতা থেকে এসে বক্তৃতাটি দিয়েই পালান, এতে এখানকার লোকে দুঃখিত।...একটি ছেলে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলে, একবার দু'বার। একবার করলে, তখন আমি ওর দিকে চাইনি। আবার যখন করলে, তখন আমি ওর কাঁধে হাত দিয়েবাইরে নিয়ে গেলুম। বল্লুম—তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়? ও বল্লে—বাড়ি ভাগলপুরে।আমি নবীন গাঙ্গুলীর নাতি। তখন তো আমি অবাক! ওদের বাড়ি কত গিয়েচি ভাগলপুরেথাকতে সে কথা বলি। তিনকড়িকে চেনো? বলতেই বল্লে—হাঁ, তিনি আমার মেসোমশায়।

অমরবাবুর মোটরে মণিকে তুলে নিয়ে চলে এলুম মণিদের বাড়িতে। ইন্দু যে কোথায় ছেঁড়া মাদুর পেতে বসে আছে, খুকুযে ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়ে ভুগচে, কেবল এই সব কথা মনেপড়ে। মণির বাড়িতে এসে চা খেতে খেতে অমরবাবুর সঙ্গে ভাগলপুরের দিনের গল্প করি। মোটরে আসতে আসতে তিনি মণিকে ক্ষীরোদবাবুর অশরীরীরূপে ঘরে উপস্থিত থাকার সেইপেটেন্ট গল্পটি করলেন। আমি তো শুনে অবাক যে গত বছরের সেই সুদর্শন যুবক প্রীতি সেনই ক্ষীরোদবাবুর ছেলে। কি সব অভাবনীয় যোগাযোগ! এবার প্রীতি সেনকে না দেখে দুঃখিত হয়েচি।

অমরবাবুর গাড়িতেই স্টেশনে এলুম। মণি শেষ পর্যন্ত রইল। কত পুরোনো দিনের গল্প হল অমরবাবুর সঙ্গে। ওঁর সাদর আলিঙ্গনটি বড় বন্ধুত্বের চিহ্ন।

ট্রেনে বক্তিয়ারপুরে নেমে কালীদের বাড়ি এসে দেখি সে কোথায় থিয়েটারের রিহার্সেলে গিয়েচে। একটু পরেই এল। কত রাত পর্যন্ত গল্প হল। ঠিক হল কাল রাজগীর যাওয়া হবেসকালের ট্রেনে।

কালী ও কালীর মামাশ্বশুর আমার সঙ্গেই ছিল। শো স্টেশনের একটা জায়গা দেখিয়ে কালী বল্লে—ওখানে আমাদের 'রসচক্র' সভা হয়েছিল, আমি একটা কবিতা পড়লুম। আমি বল্লুম—তুমি কবিতা লেখো নাকি? বল্লে—শোনাব এখন? বাড়িতে আছে। আহা, ওরা সভা-সমিতিতে যেতে পারে না, এক-আধটু হলে কি খুশিই হয়!

lgnominous thirsts for respect—কি কথাই বলেচে ভিক্টর হিউগো!

চেরো, হরনৌৎ—এই সব স্টেশনের নাম। অপকৃষ্ট ও নোংরা বিহারের বস্তি। ধুলো, ধুলো—সর্বত্র ধুলো। ধুলো-পড়া পেঁড়া, খোয়া ক্ষীর (এদেশে বলে মেওয়া) ও তিলুয়া বিক্রিহচ্চে দোকানে। এক ঘরের দেওয়ালের গায়ে আর এক ঘর বাড়ি তুলেচে।

শো স্টেশনে বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ বলে একজন হিন্দি গ্রাম্য কবির সঙ্গে আলাপ হল।লোকটিকে এখানে সবাই পাগল বলে—তা তো বলবেই। কবিকে চিনবার মতো লোক এ সব পাড়াগাঁয়ে কে আছে? কবি আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন। আসবার সময়ে তিনি দয়া করে শো স্টেশনে আবার আমাদের কামরাতেই উঠে দেখা করেছিলেন।

রাজগীরের শৈলমালা দূর থেকে ধোঁয়ার মতো দেখা গেল। কিছু পরেই বিহার-শরিফও নালন্দা। নালন্দা থেকে ট্রেন ছাড়লে দূর থেকে স্তূপ ও বাড়িঘর দেখা গেল। এবার আরনালন্দা যাওয়ার সময় হল না।

রাজগীরে নেমে পাহাড়জঙ্গলের পথে সোনভাণ্ডার গুহায় চলে গেলুম। বুদ্ধেরচরণরজপূত এই স্থান। ওই গুহায় বুদ্ধদেব সমাধিস্থ ছিলেন, পাশের গুহায় তাঁর প্রিয় শিষ্যআনন্দ ধ্যানস্থ ছিলেন।

এই পাহাড়টার নামই গৃধ্রকূট। গৃধ্রকূটের ওপরে কাঁটাগাছপালা ঠেলে অনেকটা উঠলুম।এক জায়গায় পাথরে ঠেস দিয়ে জুত করে বসলুম। ঠিক দুপুর, নির্মেঘ, নীল আকাশ। দূরেপ্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞান দ্বারা খোদিত একটা স্তূপ বা চৈত্য দেখা যাচ্ছিল। পাহাড় থেকে নেমে আমি সেটা দেখতে গেলুম, কালী পাথরের নুড়ি কুড়ুতে লাগল। আমি চৈত্যটি দেখে ফিরবার সময়বাঁশবনের ছায়ায় ঝরনার স্রোতের ধারে খানিকক্ষণ বসলুম। ওরা ততক্ষণে চলে

গিয়েচে। এখানেই সেই করণ্ড বেণুবন, যেখানে বুদ্ধদেব মহানির্বাণ সূত্র বিবৃত করেন আনন্দকে। কালের কুয়াসায় সব ঢেকে মুছে একাকার হয়ে গিয়েচে... কোথায় কি আজ! আড়াই হাজার বছরআগেকার মতো বেণুবন কিন্তু রাজগীরের উপত্যকায় অজস্র। ব্রহ্মকুণ্ডের উষ্ণ জলে স্নান করেসারাদিনের ক্লান্তি দূর হল। তারপর আমি একটা খাবারের দোকানে কিছু খেয়ে ছায়ায় বসে দূর পাহাড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম—হঠাৎ মনে পড়ল আজ গোপালনগরের হাট, বেলা তিনটে, সাড়ে-তিনটে—এতক্ষণ বটতলা দিয়ে কত লোক হাটে চলেচে।

ফিরবার পথে সন্ধ্যার ছায়া পড়ে এসেচে বড় বড় মাঠে। একজন চৈনিক লামা আরএকজন লামাকে গাড়িতে তুলে দিতে এসে কি একটা বাজনা বাজাচ্চে ট্যাংট্যাং করে, আরকেবল ঘাড় নীচু করে প্রণাম করচে। সে ভারী সুন্দর দৃশ্য ! ট্রেনছেড়ে গেলেও অনেকদূর পর্যন্তবাজাতে বাজাতে ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে এল।

বক্তিয়ারপুর পৌঁছে একটি ছোকরা তার কবিতা শোনাতে বসল। গাড়িতে তার লেখাকবিতা দু'তিনটা শোনালে। সাহিত্যপ্রীতি ওদের বেশ প্রশংসনীয়—তবে দূর বিহারের দেহাতেকে ওদের উৎসাহ দিচ্ছে আর কে-ই বা ওদের কবিতা ছাপাচ্চে!

রাত্রের ট্রেনেই কলকাতা রওনা হলুম, দানাপুর এক্সপ্রেসে। সারা রাত্রি ঘুম এল না। একবার একটু তন্দ্রামতো এসেছিল—উঠে দেখি জসিডি স্টেশন। তারপর আবার শুয়ে পড়লুম—ভাঙা কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেচে, বেজায় ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করে বইছে, জানালা দিয়েমুখ বার করলে মুখে যেন লক্ষ ছুঁচ ফোটে। কুয়াসা হয়েছে, বনগুলো যেন ঠিক ইসমাইলপুরেরসেই বন—অনেক রাত্রে উঠে এই শীতের সময় ইসমাইলপুর কাছারিতে ঠিক যেমন বনদেখতুম তেমনি দেখাচ্চে।

পাটনা থেকে এসে মধ্যে অনেক ব্যাপার হয়ে গেল। মধ্যে সুপ্রভা কলকাতা এল ওরমা-বাবার সঙ্গে। একদিন ওর সঙ্গে 'মুক্তি' দেখতে গেলুম 'চিত্রা'তে। ভাল লাগল না কারো, সেবা ও রবি ছিল সঙ্গে। তারপর আমার পড়ে গেল বনগ্রামে সাহিত্য-সম্মেলনের হুজুগ।বিশ্বনাথ এখানে খুব যাতায়াত করলে। খগেন মিত্র মহাশয় সভাপতি হয়ে গেলেন এখানথেকে, রমাপ্রসন্ন ও গৌর পাল গেল, খুব হৈ হৈ কাণ্ড হয়ে গেল সরস্বতী পুজোর সপ্তাহে।সাহিত্য-সম্মেলন থেকে আমায় আবার দিলে একটা মানপত্র ও অভিনন্দন।

পরের সপ্তাহেই পড়ে গেল কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সম্মেলন। আমি ঈদের ছুটিতে বাড়িগেলুম। চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেচে, কোকিল ডাকচে, শীত যদিও বেশ, কিন্তু বসন্তের আমেজ দিয়েচে। বাড়ি গেলুম, পাড়ায় কেউই নেই এক ন'দি ছাড়া। নিজের খড়ের ঘরটিতে দুপুরে শুয়েখুব ঘুম দিই। আগের রাত্রে যতীনকাকার মেয়ে উষার গিয়েছে বিয়ে। তখনো বরযাত্রীরারয়েচে। যতীনকাকার মেয়ের বিয়ে দেখচি চিরকাল ওই একই চণ্ডীমণ্ডপে।

বৈকালে কুঠীর মাঠে গাছে গাছে পাকা কুল খেয়ে বেড়াই। ভূষণ জেলের ছেলের জমিতে খেজুর গাছটায় ঠেস দিয়ে বসে 'আরণ্যক'উপন্যাসের এক অধ্যায় লিখি। সন্ধ্যাবেলায় ইন্দুর বাড়িতে সেদিনকার মিটিং ও আমার মানপত্র দেওয়া সম্বন্ধে খুব কথাবার্তা হল। ইন্দুবল্লে আজ যদি আপনার বাবা-মা বেঁচে থাকতেন !

সকালে টুকোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ছেলেবেলায় টুকো খেলত আমার ছোট বোন মণিরসঙ্গে। সে আজ ১৫/১৬ বছর পরে বিধবা হয়ে গ্রামে ফিরে এসেচে। এসে আমায় নমস্কারকরলে—ওর মুখ ভুলেই গিয়েছিলুম—এখন দেখে মনে হল—হাঁ, এ মেয়েকে আগেদেখেছিলুম বটে।

পরদিন সকালে ন'টার ট্রেনে কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সম্মেলনে গেলুম। গাছে গাছে শিমুলফুল ফুটে লাল হয়ে আছে। সজনী, অমল হোম, সুনীতিবাবু, প্রবোধ সান্যাল, বিজয়লালসকলের সঙ্গে কৃষ্ণনগর স্টেশনে দেখা। অতুল গুপ্ত ও যামিনী গাঙ্গুলী একখানা মোটরে আসছিলেন, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় তাতেই আমায় উঠিয়ে দিলেন। মনোমোহন ঘোষের যেবাড়িতে আজকাল কলেজিয়েট স্কুল, ওখানেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। ঢুকেই দেখিপ্রবোধ

সান্যাল বসে খাচ্চে। আমি ও ইউনিভার্সিটির প্রিয়রঞ্জনবাবু একসঙ্গে খেতে বসে গেলুম।খেয়েই সভাস্থলে যাই। প্রমথ চৌধুরী সভাপতি। কৃষ্ণনগর রাজবাটীর নাটমন্দিরে সভা বসেচে।কখনো এর আগে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির মধ্যে ঢুকিনি—যদিও এর আগে বাল্যকালে একবারকৃষ্ণনগর এসেচি। তার অভিজ্ঞতা খুব অদ্ভুত। আর বছর দুই আগে কয়েক ঘণ্টার জন্যে যেএসেছিলুম আমার ছোট ভাইয়ের জন্যে পাত্রী দেখতে, সে ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়।

কৃষ্ণনগরে বাবার সেই মা—আমাদের আলুভাতে ভাত খাওয়ানো—আমারহতাদর—কত কথাই মনে পড়ে। সেই আর এই! সে গল্প আর একদিন করব।

কৃষ্ণনগর থেকে সেই রাত্রে রাণাঘাটে এসে খগেনমামার বাড়িতে রইলুম—তাও সেইবাল্যে ওদের বাড়ি শুয়েছিলুম, আর কখনো থাকিনি। একটা সরস্বতীঠাকুর বিসর্জন দিতে গেলশোভাযাত্রা করে অনেক রাত্রে। বেজায় শীত পড়ল রাত্রে।

পরদিন এলুম এগারোটার ট্রেনে গোপালনগরে। স্টেশনে আবার খগেন মিত্র ও প্রভাতকিরণ বসুর সঙ্গে দেখা। রেস্তোরাঁতে বসে চা খেতে খেতে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আলোচনাকরা গেল অনেকক্ষণ।

দেশে গিয়ে বেশ লাগল। তখন ন'দির কাছে একটু তেল চেয়ে নিয়ে নদীতে স্নান করেএলুম। ওপাড়ার সেই কুমুরনী ক্ষার কাচছে। শুকনো ফুল পড়ে আছে কত বনসিমতলার ঘাটে। পরশু কতক্ষণ ঘাটে বসেছিলুম, বনের কুল পেকেচে একটা ডালে, দরিদ্রা পল্লীজননী আর কি দিয়েই বা আদর করবেন? তবুও কত স্মৃতি জড়ানো রয়েছে এই বনসিমতলার ঘাটের সঙ্গে!খুকু ওখানে দাঁড়িয়ে গল্প করত নেয়ে উঠে—এই তো সেদিনও।

সেদিন এসে ঘুমুলাম দুপুরে। উঠে দেখি বেলা গিয়েচে। চড়কতলায় এসে বসলুম, মুসলমান মাস্টারটি কোথা থেকে সন্ধান পেয়ে এসে পড়েচে অমনি। চাচা এসে আগুন করলে ওবকবক শুরু করলে। ইন্দু রাত্রে একটি বিদেশী পথিক সেদিন কেমন করে শিঙেতলার মাঠে বেঘোরে মারা গিয়েছিল—সে গল্প করলে। সে কাহিনী বড়ই করুণ।

পরদিন সকালে সীতানাথ জেলের নৌকোতে বনগাঁয়ে চলে এলুম। ভেবেছিলুম খুকুদেরসঙ্গে দেখা করতে যাব—কিন্তু ঘটে উঠল না। রাত্রে খুব চমৎকার জ্যোৎস্নায় মন্মথবাবুর বাড়িবসে হরিবাবু, যতীনদা, ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া গেল। বিপ্রদাসবাবুর বাড়ি সত্যনারায়ণের সিন্নীর প্রসাদ পাওয়া গেল।

সেখান থেকে এসে কাল গিয়েছিলুম রাজপুরে।

নগেন বাগচীদের যে বাড়িটাতে থাকতুম—অনেক দিন সে বাড়ির সে ঘরটার পথ বন্ধ ছিল। আজ দুলির ছোট ছেলের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে সে ঘরটার সে বারান্দাতে গিয়ে বসি।এইখানেই আমার মা মারা যান। তারপর কতকাল এ বাড়িটাতে আসিইনি। এইখানেই বালক কবি পাঁচুগোপালের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সতেরো বছর আগে—যে আমায় প্রথমসাহিত্যক্ষেত্রে নামিয়েছিল।

ফিরে এসে ফুলিদের উঠোনে মাচাতলার উনুনে ওরা পরোটা ভাজতে বসল—আমিএকখানা বেলে দিতে গেলুম—হল না। ফুলি ও বউমা তো হেসেই কুটিপাটি। তারপর বউমা বেলে দিতে লাগল—আমি শুধু নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র। সুন্দর লেবুফুলের গন্ধ বেরুচ্ছিল।

জ্যোৎস্নার মধ্যে কাল রাত্রেই কলকাতায় ফিরি। বেগুন আমায় এগিয়ে দিয়ে গেলএকেবারে মেস্ পর্যন্ত। কত ধরনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মধ্যে দিয়ে এ দিনগুলোকাটল, না?...

সাধে কি বলি ভগবানের দান এ জীবন, যে জানে ঠিকমতো এর স্বাদ গ্রহণ করতে, সেজানে এ কি মধু।

আর বছর ঠিক এইদিনে পুরী যাওয়া হল না বলে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এবার ঠিকএই দিনেই বেশ কাটল। শনিবার সুপ্রভা আসবে বলে পত্র পেলুম, বিকেলে বেড়িয়ে এসে একটা কাগজ পেলুম তাতে জানা গেল ওরা কাছাকাছি একটা হোটেলে এসে উঠেচে। দেখা করতে গেলুম ও তারপর কার্জন পার্কে বেড়াতে গেলুম ওকে নিয়ে। পরের দিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিহয়ে ইডেন গার্ডেনে খানিকটা বসে কত গল্প করলুম। কিন্তু সকলের চেয়ে আনন্দ হল ওকেতুলে দিতে গিয়ে স্টেশনে। কেউ জানত না যে আমি স্টেশনে যাব—আমি একটি অদ্ভুত আনন্দপেলুম। ট্রেনটি ছেড়ে চলে গেলেও কতক্ষণ বেঞ্চিতে বসে বসে ভাবতে লাগলাম। কত ধরনেরসূক্ষ্ম অনুভূতি! ভাবুকতা জীবনের খুব বড় একটা সম্পদ। এ যার নেই, সে সত্যিই দরিদ্র। টাকায় কি করে?

শেয়ালদ' স্টেশনে আমার কল্যকার সেই দশ মিনিটের দাম অর্থে নিরূপিত হবার নয়।

বসন্তটা এমনভাবে ভাল করে দেখিনি অনেকদিন। শিবরাত্রির ছুটিতে এবার গেলুমবারাকপুরে। কি অপূর্ব শোভা হয়েছে চালকীর মুসলমান পাড়ার ওই কাঁচা রাস্তাটার ধারে ফুটন্তঘেঁটুফুলের বনের! তার ওপর নদীর ওপারে, ঠিক গাজিতলার পথের বাঁকে একটা চারাশিমুলগাছে ফুল ফুটেচে, আমি যখন বারাকপুরে যাচ্চি তখন দুপুর রোদ, কি অদ্ভুত যে দেখাতেলাগল সেই ঝমঝম্ দুপুরে ওপারের সেই ফুলেভর্তি শিমুলচারাটা ! অপ্রত্যাশিত ভাবে গিয়েদেখি খুকুরা ওখানে আছে। অনেক দিন পরে এখানে ওদের পেয়ে মন খুশি হয়ে উঠল। আমিন'দিদিদের রান্নাঘরের দাওয়ায় জল খেতে গিয়েচি, ও দাঁড়িয়ে আছে পুঁটিদিদিদের উঠোনে। বল্লুম—কি রে! তারপর ওদের দাওয়ায় বসে কতক্ষণ গল্প করলুম। দুপুরে ওদের রান্নাঘরে বসে পোল্যান্ড বিষয়ে একদিন বল্লম। শিবরাত্রির দিন ন'দিদিদের ঘরে ওদের কাছে শিবরাত্রির ব্রতকথা শোনালুম। ট্যাংরার মাঠে ইন্দুর সঙ্গে একদিন কুল খেতে গেলুম—বড় খোলা মাঠ, দিক্‌চক্রবাল বড় দূরবিসর্পী, একটা উইয়ের ঢিবির কাছে বসে সেদিন সূর্যাস্ত দেখলুম। ঘেঁটুফুলএখানেও খুব ফুটেচে। গণেশ মুচি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েচে, ট্যাংরার ধারে গরু চরাচ্ছিল। লেবুতলার ওই পথে অনেকদিন কেউ আসেনি, যখন রোয়াকে বসে থাকি, এইদিন দেখলাম নীল শাড়ি পরে আসতে একজনকে ওই পথটাতে বহুদিন পরে।

গত শনিবার সাউথ গড়িয়া গ্রামে বেড়াতে গেলাম বোধহয় পনেরো বছর পরে। ভূতনাথ এখানে থাকতে আমি এখানে এসেছিলুম, সে কি আজকের কথা? বড় রোদ পড়েচে, বারোটার ট্রেনে ওখান থেকে রাজপুর এলুম। দুলিদের বাড়ির পিছনে বাঁশবনের তলায় কেমনছোট ছোট ঘেঁটুগাছ। বেশ লাগে ওই বাঁশবনের মধ্যের জায়গাটা।

আজ গিয়েছিলুম নীরদবাবুদের মোটরে গড়িয়া গ্রামের একটা ভাঙা শিবমন্দিরের ধারে। জ্যোৎস্না উঠেচে খুব, ভাঙা মন্দির আর একটি প্রাচীন বটগাছ-পটভূমিকা বেশ চমৎকার। বেশলাগল আজ জ্যোৎস্নাটা। কতক্ষণ বসে গল্প করলুম।

গত সপ্তাহের শুক্রবার থেকে আরম্ভ করে কি ঘোরাই গেল ক'দিন! প্রথম তো শুক্রবারআসাম মেলে রংপুর রওনা হলুম, সেখানে সারস্বত-সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে। দুপুরেররোদ বেশ বাড়চে—পথে পথে ঘেঁটুফুলের শোভা—সারা পথেই ঘেঁটুফুল দেখতে দেখতেচলেচি। নৈহাটির কাছাকাছি এসে মনে হল আমাদের গ্রাম এখান থেকে বেশি দূর নয়—সোজা গেলে হয়তো বিশ মাইলের মধ্যে। এই দুপুর রোদে আমাদের পাড়ার সবাই যে যার ঘরে ঘুম দিচ্চে হয়তো। রানাঘাট স্টেশনে ইসাক মাস্টার উঠল ট্রেনে, ঈশ্বরদি পর্যন্ত গল্প করতে করতেগেল। ক্রমে বেলা পড়তে লাগল। আমি দূরে এক গ্রামের একটি মেয়ের জীবনযাত্রার ছবি দেখিএই ছায়াস্নিগ্ধ অপরাহ্ণে হয়তো তাদের শিউলিতলা দিয়ে পাড়া বেড়াতে চলেছিল, হয়তো নিজেদের দাওয়ায় বসে গল্প করে, কি বই পড়ে। কোথায় সার্কাস হয়েছিল, সার্কাস উঠে গিয়েচে আজ ৩/৪ মাস—বলে, একবার ভেবেছিলুম খুব বেড়িয়ে আসা যাক সার্কাসে—তাসার্কাস গেল উঠে। ওদের কথা দুঃখ হয় ভাবলে। শিলং মেলে সুধাংশু ডাক্তারের দাদাহিমাংশুর সঙ্গে দেখা, সে থাকে কুড়িগ্রামে। চমৎকার জ্যোৎস্না রাত—এবার আমার অদৃষ্টেলেখা ছিল এই পক্ষের জ্যোৎস্নাটুকু নিংড়ে খালি করে উপভোগ করব। রংপুর স্টেশনে নেমেঘোড়ার গাড়িতে প্রবোধবাবুর বাড়ি গিয়ে উঠলুম। গিয়ে শুনি ওঁরা আমায়

স্টেশনে নিতেএসেছিলেন, কারো সঙ্গে আমার দেখা হয়নি নাকি। পরদিন সকালে সভার অধিবেশন হল টাউন হলে। প্রিন্সিপ্যাল ডি. এন. মল্লিকের সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা। কলকাতা ছাড়বার পরে তার সঙ্গে আর কখনো দেখা হয়নি—সে আজ চোদ্দ-পনেরো বছরের কথা। মাথার চুল সবসাদা হয়ে গিয়েচে—এখন এখানে কারমাইকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। সভার পর দুপুরবেলাপ্রবোধবাবুর সঙ্গে মোটরে বার হয়ে কলেজ বেড়িয়ে এলাম। অত বড় কলেজের বাড়িটা বাংলাদেশের অন্য কোনো কলেজে নেই বলেই আমার ধারণা। ছাদে উঠে দুপুরবেলা চারিদিকেচেয়ে বেশ লাগল। কলেজ কম্পাউন্ড খুব ফাঁকা। তাজহাট রাজবাড়িতে বেড়াতে গিয়ে তাদের বড় বৈঠকখানায় আমরা সবাই বসে রইলুম—অনেকগুলো ভারী সুন্দর হাতির দাঁতের চেয়ার দেখলুম—যেমন অনেক বছর আগে আগরতলার রাজপ্রাসাদে দেখেছিলুম—আমার তখনচব্বিশ বছর বয়স—প্রায় আজ চৌদ্দ বছর আগেকার কথা। আবার বিকেলে টাউন হলে সভায়আসবার আগে মাহিগঞ্জে রবি মৈত্রের বাড়ি যাওয়া গেল। রবি থাকতে কতবার আসতেবলেছিল, কখনো যাওয়া হয়নি, আজ সে নেই ভেবে কষ্ট হল। রবির দুই দাদাকে দেখতে অনেকটা তারই মতো যেন। মাহিগঞ্জ থেকে আসতে পথের দু'ধারে বড় বড় পাতাওয়ালা গাছ—এখানে 'চোৎরা গাছ' বলে—বিছুটি গাছ, পাতা গায়ে লাগলে সাংঘাতিক জ্বলে।

বৈকালে সভার সময়ে যখন সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হচ্ছিল, আমি, জনৈক অধ্যাপক অমূল্য বসু টাউনহলের সামনে মাঠে ঘাসের ওপরে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বসে ছিলুম—আমি তো দূরেরআকাশ দিয়ে পূর্বদিকে সব সময়ই চেয়ে। কতদূরে কোথায় কে কি করচে, সেই চিন্তাতেই ভরপুর। সভান্তে জ্যোৎস্নারাত্রে রায় বাহাদুর বসন্ত ভৌমিকের বাড়ি চা-পার্টি।খুব গোলাপফুটেচে বসন্তবাবুর বাগানে। তিনি আমাকে তার পড়ার ঘর দেখালেন—বেশ সাজানো, আরঅনেক বই আছে। এদেশে ঘর তৈরি করার পদ্ধতি আমার বেশ সুদৃশ্য লাগল। প্রবোধবাবুরবাড়িতেও আবার অনেককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল—অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করেবসন্তবাবু মজলিশ জমিয়ে রাখলেন। পরদিন সকালে আবার সভা। দুপুরে একটু ঘুমুই।বৈকালের দিকে শহরের কয়েকটি গণ্যমান্য ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। বৈকালে সভার সময় মোটর থেকে নেমেই দেখি ভিড়ের মধ্যে থেকে জেলি ও পাগলা, আমাদের গায়ের, দেখা করতে ছুটে এল। ওরা এখানে লালমনিরহাটে রেলে কাজ করে, আমি এখানে এসেছি শুনেলালমনিরহাট থেকে দেখা করতে এসেচে। সভার পরে প্রবোধবাবুর বাড়িতে চা খেয়ে সন্ধ্যারকিছু পূর্বে স্টেশনে রওনা হলুম। শহরের কয়েকটি ভদ্রলোক আমায় তুলে দিতে এলেন। খুব জ্যোৎস্না, পূর্বদিকের আকাশও খুব উজ্জ্বল। গরম একেবারেই নেই। পার্বতীপুরে গাড়ি বদল করে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে চড়ে বসলুম। জ্যোৎস্নারাত্রে পদ্মা দেখে বড় ভাল লাগল। ভোর হল রাণাঘাট স্টেশনে—তখনো আকাশে নক্ষত্র রয়েচে।

কলকাতার বাসায় গিয়ে স্নান করে বসে আছি, এমন সময় নীরদবাবুর ড্রাইভার এসেখবর দিলে গাড়ি এসেচে। নীরদবাবু সস্ত্রীক গালুডি যাচ্ছেন, আমায় সেই সঙ্গে যেতে হবে।তখনি জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে আবার রওনা। নাগপুর প্যাসেঞ্জার বেলা তিনটার সময় গালুডিপৌঁছল। পথে খড়গ্পুরের পরে উঁচু ডাঙ্গা ও শালবনের দৃশ্য দেখবার লোভে দুপুরে একটু ঘুমএল না চোখে।

বহুদিন পরে আবার নামলুম গালুডি—আজ বছর তিন-চার আসিনি—১৯৩৪ সালের পুজোর পর আর কখনো আসিনি। তবে সে গালুডি এখন অনেক বদলে গিয়েচে। নেকড়েডুংরি পাহাড়টা ন্যাড়া, তার নীচেকার সে চমৎকার শালচারার জঙ্গলটা অদৃশ্য! কে পাথর কেটে নিয়েযাচ্চে পাহাড়টা থেকে, রোজ সকালে একদল গরুর গাড়ি এসে পাথর কেটে বোঝাই করে নিয়েযায়—পাহাড়টা এবার গেল। এদিকে কারো জ্ঞান নেই যে ওটা চলে গেলে গালুডির একটা beauty spot চলে যাবে।

অপরাহ্ণে সুবর্ণরেখা পার হয়ে কুমীরমুড়ি গ্রামের জঙ্গলে বসে রইলুম কতক্ষণ। প্রথমে যাচ্ছিলুম রাখামাইনস-এ, কিন্তু বেলা গিয়েচে দেখে ভরসা হল না। এক জায়গায় ধাতুপ্ ফুলের ঝাড় দেখে দাঁড়িয়ে

গেলাম—কাছেই একখানি বড় পাথর। হঠাৎ দেখি বনের মধ্যে একটাগোল্‌গোলি ফুলের গাছে হলদে ফুল ফুটে রয়েছে অজস্র। সেখানে ঢুকে দেখি বনে লতানে পলাশ গাছে পলাশ ফুটেছে, তা ছাড়া একরকম বন যুঁই-এর মতো কি ফুল ফুটেচে কামিনী ফুলগাছের মতো গাছে। মোরাম ছড়ানো মাটি—ঠিক যেন কয়লার টুকরো ছড়ানো পড়ে রয়েচে। বসে বসে মনে হল কাল ঠিক এসময় রংপুরে টাউনহলের ক্লাবঘরে বসে চা খাচ্ছি—আর আজএসময় সুবর্ণরেখার ধারের বনে। কোথায় ছিলুম কোথায় এসেচি! চাঁদ উঠছে ঠিক সেইগোলগোলি ফুলগাছের পেছনে। প্রকাণ্ড গাছটা—আমাদের দেশের একটা মাঝারি গোছের আমড়া গাছের মতো। ফুলগুলো অনেকটা দূর থেকে দেখতে সূর্যমুখী ফুলের মতো। কতক্ষণ বসে রইলুম, তারপর জ্যোৎস্না ফুটবার পূর্বেই লতানো পলাশের একটা গুচ্ছ তুলে নিয়েসুবর্ণরেখা পার হয়ে গালুডি চলে এলুম।

বড় সুন্দর জ্যোৎস্না। বাংলার বাইরে ভিন্ন এ ধরনের ছায়াহীন অদ্ভুত ধরনের জ্যোৎস্নাবড় একটা দেখা যায় না। বাদলবাবুর বাড়ি বেড়াতে গিয়ে কালাঝোর পাহাড়শ্রেণীর দিকে চেয়েচোখ ফেরানো যায় না যেন—জ্যোৎস্নারাত্রে অস্পষ্ট দেখাচ্চে যদিও, তবুও কি তার চেহারা!

হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েচি। চা খেয়ে ওপারের বনে বেড়াতে যাওয়ার পূর্বে গালুডির হাটে বেড়াতে গেলুম। ১৯৩৪ সালের গুডফ্রাইডের ছুটির পরে এই হাট আমি আরকখনো দেখিনি। সেই পুরানো দিনের মতো টোমাটো, শুঁটকি মাছ, মহুয়ার তেল, বাজে লাড্ডু আর তেলের খাবার বিক্রি করচে। সাঁওতাল মেয়েরা গল্প করচে, পাঁচ গ্রামের লোকের সঙ্গেআলাপ করচে। কাল ঠিক এই সময়ে কিন্তু রংপুরের সভাতে বসে আছি।

পরদিন ভোর ছ'টাতে আমরা চারখানা গরুর গাড়ি করে দীঘাগড়া পাথর খাদানে রওনাহই। প্রথমে তো যাবার রাস্তা এরা ভুল করলে। ফুলকাল ও বনকাটি দিয়ে না গিয়ে প্রায় চলেগেল ঘাটশিলার কাছাকাছি। কালাঝোর পাহাড়টা প্রায় সেখানে শেষ হয়েচে। বাদলবাবু কেবলই বলে, এখনো পথটা আসিনি, আরো আছে। এমনি করে অনেকটা গিয়ে তারপর বাঁ-ধারে পথপাওয়া গেল। ঝাঁপড়িশোল বলে একটা সাঁওতালি গ্রামের প্রান্তে গাছতলায় সবাই শতরঞ্জি বিছিয়ে চা খেতে বসা গেল। মেয়েরা চা করতে লাগলেন। ভিক্টোরিয়া দত্ত খাবার দিলেন সবাইকে। বেলা ন'টা। সামনে কালাঝোর পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশে ঘন বন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দূরের গ্রামের এক পল্লী বালিকা এতক্ষণ বকুলতলায় কি করচে মনে হল। চা-খাওয়া শেষ করে একটা সাঁওতাল ছোকরার সঙ্গে দেখা। আমি তখন গরুর গাড়ি ছেড়ে একটু এগিয়ে চলেছি। সেবল্লে—দীঘার চেয়ে বাসাডেরায় বন খুব বেশি। কিছু পয়সার লোভে সে আমাদের বাসাডেরা নিয়ে যেতে রাজী হল। নীরদবাবু কেবলই কালকার জ্যোৎস্না রাত্রির কথা বলছিলেন। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেই তিনি আমার হাতে হাত দিয়ে অঙ্গীকার করিয়ে নিলেন আর একদিন জ্যোৎস্নায়আমরা আবার এখানে আসব। বনের শোভা বড় সুন্দর। প্রথম বসন্তে শৈলসানুর বনে অজস্র গোলগোলি ফুলের গাছে ফুল ফুটেছে, পলাশ ফুটেছে, সাদা সাদা এক ধরনের ফুল, গাড়োয়ানেরা বললে, বুররা। লোহাজালির ফুলে বেশ সুগন্ধ—আর যেখানে সেখানে প্রস্ফুটিতশালমঞ্জরীর তো কথাই নেই—সুবাসে দুপুরের বাতাস মাতিয়েচে। বনের মধ্যে একটা কুয়া এক জায়গায়, সাঁওতালেরা জল নেয়। আমরা সেই কুয়ার জল খেয়ে নিলাম। ডাইনে বেঁকে বনেরমধ্যে বুরুডি গ্রাম। একটা পাথরের কারখানাতে পাথরের গেলাস, থালা, বাটি, খোরা তৈরি হচ্ছে, মেয়েরা নেমে কারখানা দেখতে গেলেন—আমরাও গেলুম সঙ্গে। বেলা সাড়ে দশটা।খুকু এতক্ষণ ওদের রান্নাঘরে মায়ের সঙ্গে রাঁধতে বসেচে। ক্রমশই বন গভীর হয়ে এল।পথের ধারে বন্য হস্তীর পদচিহ্ন গাড়োয়ানেরা দেখালে। গাইড ছোকরা বল্লে—বনে খুব মজুরআছে। মজুর? মজুর কি? একজন গাড়োয়ান বলে, বাবু, আপনারা যাকে ময়ূর বলেন। এ বনেযেখানে সেখানে পলাশ গাছ, লতার মতো জড়িয়ে উঠেছে অন্য বড় গাছের গায়ে—ফুল ফুটেরয়েচে। গোলগোলি গাছটা এ বনে তত দেখচিনে। একস্থানে উঁচু ঘাট, অনেকটা শিলং-সিলেটরোডের মতো, ডাইনে নীচু খাদ—গরুর গাড়ি খুব কষ্টে উঠতে লাগল। বাসাডেরা গ্রামের চারিধারেই পাহাড়, মধ্যে একটা উপত্যকায় একটি সাঁওতাল বস্তি। গ্রামের লোকেরা আমাদেরগাড়ির দিকে অবাক চোখে চেয়ে দেখচে। বাসাডেরা গ্রাম পার হয়ে কি একটা বেগুনি রংয়েরবড় ফুলগাছ

দেখলুম জঙ্গলে—খুব জঙ্গল এদিকটাতে। এখানে ঝাটি-ঝরনা বলে একটা জায়গাআছে, সেখানে জঙ্গল আরো অনেক বেশি। ঘন জঙ্গলের মধ্যে কত গ্রাম রয়েচে। পাহাড়ি ঝরনা তাদের জল যোগাবার একমাত্র স্থান। বাসাডেরা গ্রাম ছাড়িয়ে এমন হল যে জল কোথাওপাওয়া যায় না—আমি একটি উপলাকীর্ণ শুষ্ক নদীখাতের পাশের জঙ্গলে একটা মোটা লতারওপর উঠে বসে রইলুম। একটু পরে গাইড এসে জলের সন্ধান দিলে। পাহাড়ি ঝরনা বেয়ে একজায়গায় জলাশয় সৃষ্টি করেছে। আমি সাঁতার দিয়ে সেই জলাশয়ে স্নান করলুম। মেয়েরা রান্না চড়িয়ে দিলেন। আমি ও কনক ডান দিকের পাহাড়টাতে উঠলুম। কনক কিছুদূর গিয়ে আর উঠতে সাহস করলে না—আমি একটা মসৃণ পাথর বেয়ে উঠে গেলুম। খুব ওপরে প্রায় পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকের পাহাড়গুলো চেয়ে চেয়ে দেখলুম। সব পাহাড়ের মাথাতেইবন। বনে আগুন লেগেছিল কিছুদিন আগে, এখনো এ পাহাড়ে একটা মোটা শেকড় ধোঁয়াচ্ছে। একটা শিবগাছের রেণু হাতে মেখে মুখে দিলাম, যেন পাউডার মুখে মাখচি এমনি সাদা হয়ে গেল।নামবার সময় মসৃণ পাথরখানা বেয়ে আর নামতে পারিনে, মাঝামাঝি এসে আটকেগেলাম—অবশেষে একটা শেকড় ধরে এসে নামলুম কনক যেখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমারঅবস্থা দেখে কনকের ভয় হয়ে গিয়েছিল। আরো নেমে এসে তবে সেই জলাশয় ও সেইপ্রস্তরাকীর্ণ উপত্যকা, যেখানে মেয়েরা রান্না করবেন। নেমে এসে দেখি রান্না হয়ে গিয়েচে।

খাওয়া-দাওয়া সারতে ও বিশ্রাম করতে বেলা গেল। রওনা হবার সময়ে দেখি আমারপায়ের আঙ্গুলে পাহাড়ে ওঠবার সময়ে যে চোট লেগেছিল, তার দরুন দস্তুরমতো ব্যথা হয়েচে। সুতরাং গরুর গাড়িতে চিৎপাত হয়ে শুয়ে সুন্দর অপরাহ্ণ নষ্ট করে ফেলতে হল বাধ্যহয়ে—কেবল পাহাড়ের ঘাট পার হয়ে ঘন জঙ্গলের পথে খানিকটা খালি পায়ে হেঁটে এসেছিলুম। পথে জ্যোৎস্না উঠল। এক জায়গায় বনের মধ্যে গাছতলায় আমরা শতরঞ্জি পেতে বসে চা করে খেলাম, গল্পসল্প করলাম। তারপর ক্রমেই পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ফুটল। অপূর্ব জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। আর সেই বনভূমি, অজস্র গোলগোলি ও পলাশ যেখানে ফুটে রয়েছে, যদিও জ্যোৎস্না-রাত্রে এখন ফুল আদৌ দেখা যাচ্ছে না। বন-কাটি নামে একটা খুব বড়সাঁওতালি গ্রামের মধ্যে দিয়ে একটা বড় শাল-বনের পাশ কাটিয়ে রাত এগারোটার সময়ে গালুডি এলাম। আমরা যখন এলুম, তখন মেল ট্রেনের ঘণ্টা পড়ল স্টেশনে।

পরদিন দোল। ভিক্টোরিয়া দত্তদের বাড়ি রং খেলা হল—আমি শালমঞ্জরী ভেঙে নিয়েআজ প্রায় চার বৎসরের পরে বলরাম সায়েবের ঘাটে নাইতে গেলাম। বিষ্ণু প্রধান নাইচে, দোলখেলার রং সাবান দিয়ে তুলে ফেলচে। স্নান করবার সময়ে কালাঝোর পাহাড়শ্রেণীর দৃশ্য আরসেই একটা গাছের আঁকা-বাঁকা সীমারেখা যেন ঠিক একটা ছবির মতো মনে হচ্ছিল। দুপুরে খুবঘুমিয়ে উঠে চা খেয়ে সুবর্ণরেখা পার হয়ে ওপারের জঙ্গলে বেড়াতে গেলুম। একটা গাছে ঠেসদিয়ে কতক্ষণ বসে রইলুম। পায়ে ব্যথা ছিল। কিন্তু বেশি হাঁটতে হয়নি। কালকার গাড়োয়ানসুজন গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল, তার আগে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল পঞ্চুবাবুর বাংলোয় আমাদের পুরোনো চাকর কেষ্ট। সুজন আমায় গাড়িতে উঠিয়ে নিলে—তারা পাথর আনতে যাচ্চেসুবর্ণরেখার ওপারে।

কতক্ষণ বসে থাকার পর চাঁদ উঠল। ছোট শাল-চারার জঙ্গল—অপূর্ব শোভা হল চাঁদেরআলোতে। কতক্ষণ জঙ্গলে এখানে ওখানে বসি, কখনো বা শুকনো শালপাতার রাশির ওপরশুই। সুবর্ণরেখার নদীগর্ভে কতক্ষণ ওপারের পাহাড়ের আলোর মালার দিকে চেয়ে বসেরইলুম। জ্যোৎস্না পড়ে নদীখাতের শুকনো বালির রাশি চক্‌চক্ করচে, দূরে মৌভাণ্ডারেরআলো—ডাইনে টাটার আলো। ওপারের জঙ্গলের রেখা মুসাবনীর দিকে বিস্তৃত—অল্পক্ষণেরজন্যে মনে হল ঠিক যেন ইসমাইলপুরে ঘোড়া করে জ্যোৎস্নারাত্রে বনঝাউয়ের বনের পাশ দিয়ে কাছারি ফিরচি ভাগলপুর থেকে। বাড়ি ফিরে এসে দেখি গালুডিসুদ্ধ মেয়েপুরুষ একত্র হয়েচে—দোলের ভোজ হচ্চে, মাংস পোলাও কত কি আয়োজন! আমায় দেখে সবাই হৈ হৈকরে উঠল—Leader-এর এ কি ব্যাপার! এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলেন?...ইত্যাদি।

খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত বারোটায় রাঁচী এক্সপ্রেসে কলকাতা রওনা হই। আজ এত রাত পর্যন্ত বাইরে জেগে বসে থেকে জ্যোৎস্নাময়ী মুক্ত প্রান্তর ও দূরবর্তী শৈলমালার কি শোভাই যে দেখলুম, তা বর্ণনা করতে গেলেই ছোট হয়ে পড়ে। সে মহিমা ও সৌন্দর্য বর্ণনা করে বোঝাবার না। রাত্রে সারারাতই জ্যোৎস্নালোকিত শালবনের শোভা দেখতে দেখতে এলাম। খড়গ্‌পুর ছাড়িয়ে একটু ঘুমিয়েছিলাম।

সেদিন স্কুলের পর ভাটপাড়া গেলাম। রাত আটটার সময় ঘোড়ার গাড়ি করে ঘোষপাড়ায় দোল দেখতে গেলুম—সঙ্গে ছোট মামিমা ও মাসিমা। বাল্যদিনে গরিফা হয়ে হালিশহর হেঁটেদু'একবার গিয়েচি, সে অনেককালের কথা। তারপর কতকাল পরে আবার গরিফা দেখলুম, হাজিনগর মিল দেখলুম, হালিশহরের পাম্পওয়ালা বাঁধা ঘাট ও ঈশান মিত্রের বাড়ি দেখলুম। হালিশহরের বাজারের সেই সব সুপরিচিত গলি ও রাস্তা দেখতে দেখতে কাঁচরাপাড়া ছাড়িয়েরাত প্রায় সাড়ে ন'টার সময়ে ঘোষপাড়ার মেলাস্থানে পৌঁছে গেলাম। মেলার স্থান, ডালিমতলাইত্যাদি হয়ে পালেদের বাড়ির মধ্যে গেলুম, গোপাল পাল সেখানে মোহান্ত সেজে বসেযাত্রীদের কাছে পয়সা আদায় করচে। নলে পালের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম—সে এক সাহার কাপড় সংক্রান্ত কি মোকর্দমার মীমাংসা আমায় করতে দিলে। আমি বল্লুম—ও সব এখন পারবনা।

মামার বাড়ি নিয়ে নিচুতলার দিকে দরজা খুলে ছাদের ওপর গিয়ে বসলুম। জ্যোৎস্না ফুটফুট করচে ছাদের ওপরে। নীচের ছোট ঘরটা বা যে ঘরে গৌরী বসে পান সাজত— সে সব ঘর বেড়িয়ে এলুম। খুকুদের বাড়ির ছাদের মতো—এই তো সবে রাত দশটা হয়তোন'দিদিদের বাড়ি সবাই গল্প করচে, কি তাস খেলচে। ছোটমামিরা চা করচে, আমরা গল্প করতেকরতে চা পান করলুম। পটলমামার এক ছোট মেয়ে বেড়াতে এল। রাত এগারোটার সময় মেয়েদের আলাপ শেষ হল, সবাই মিলে আবার এলুম দোতলায়। কোথায় কাল এ সময়েগালুডিতে দোলের ভোজ চলচে, দূরে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি ও কালাঝোর শৈলমালা ফুটফুটেজ্যোৎস্নায় অস্পষ্ট দেখাচ্চে—আর আজ কোথায় কোন্ পুরোনো স্মৃতি জড়ানো রাজ্যের বুকেরমধ্যে এসে পড়েচি! রাত অনেক হয়েচে। শান্তিদের দোকানে গিয়ে ওকে জাগিয়ে কদমা কিনেসবাই ঘোড়ার গাড়িতে এসে উঠলুম। রাত দুটোতে ভাটপাড়া পৌঁছাই।

ভাটপাড়া থেকে এলুম শুক্রবার সকালে, শনিবার গেলুম বনগাঁ। এই সপ্তাহটা অদ্ভুতধরনের বেড়ানো হল, নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। বনগাঁ পৌঁছেই চলে গেলুমখয়রামারির মাঠে ও রাজনগরের বটতলাটাতে। মনে পড়ল আজ যখন বটতলায় ঝুরিতে ঠেসদিয়ে বসে, সেদিন এমনি সময় কুমীরমুড়ির জঙ্গলে সুবর্ণরেখার ওপারে ঠিক এমনি একটা গাছে ঠেস দিয়ে বসেছিলুম—কিংবা তারও আগের দিন বাসাডেরার বন্যপথ দিয়ে গরুর গাড়ি করে গালুডি ফিরচি। ওখানে কতক্ষণ বসে তারপর মাঠের মধ্যে এসে বসলুম। হু হু হাওয়া বইছে, রোদ-পড়া মাটির সোঁদা গন্ধে বাতাস ভরপুর।

পরদিন সকালে উঠে বারাকপুর চলে গেলুম। খুকু রান্নাঘরে রাঁধচে, বেলা দশটা, আমিইন্দুদের বাড়ি একটু বেড়িয়ে তারপরখুকুদের রান্নাঘরে গিয়ে ডাকচি, ও খুড়িমা, খুড়িমা!—খুকু আমায় দেখে অবাক হয়ে গিয়েচে। বল্লে—আপনি কখন এলেন? বললুম, এই তো খানিক আগেআসচি। দু'জনে গল্প করচি, তখন খুড়িমা এলেন। আমি একটু পরে বরোজপাতার বাঁশবনেঘেঁটুফুলের বন দেখে স্নান করতে গেলুম আমাদের ঘাটে। তিত্তিরাজ ফলের বীচির গন্ধ, মাটিরগন্ধ, শুকনো পাতা ও ডালের গন্ধ, ঘেঁটুফুলের গন্ধ, কঞ্চির গন্ধ—নানা প্রকার জটিল ও বহুদিনের সুপরিচিত, বহুদিনের কত পুরোনো কথা মনে-আনিয়ে-দেওয়া গন্ধের সমাবেশ।তাই আমাদের ঘাটে স্নান করে উঠে কুলতলাটা দিয়ে যখন আসি, মন যেন এক মুহূর্তে নবীন হয়ে বাল্যদিনে চলে গেল বাল্যদিনের পরিচিত গন্ধে। গালুডি ও সিংভূমের বনের সঙ্গে কোনোস্মৃতি নেই, কাজেই তা রুক্ষ ও বন্য—

বাংলাদেশের এই প্রকৃতি মায়ের মতো নিতান্ত আপন, নিতান্ত ঘরোয়া, এর প্রতি ভঙ্গিটি আমার পরিচিত ও প্রিয়।

চলে আসবার সময় সন্ধ্যার গাড়িতে চলে এলুম—খুকুওদের দাওয়ার পৈঠেতে দাঁড়িয়েচেয়ে রইল। চুমরি বাগানে কি অজস্র ঘেঁটুবন, আর কি তার মিষ্টি গন্ধ! আমার মনে ভারীআনন্দ, আর তার সঙ্গে ঘেঁটুফুলের গন্ধটা মিশে আনন্দ ঘনীভূত করে তুললে। বেলা পড়েএসেচে, হাট থেকে লোক ফিরচে। নানা রকম গাছ, লতাপাতার সুগন্ধ বেরুচ্চে—শুকনোজিনিসের গন্ধই বেশি—শুকনো ফল, শুকনো মাটি, শুকনো রডাফলের বীজ, শুকনো ডালপাতা—এই সব গন্ধ।

রাত সাড়ে দশটায় এসে কলকাতায় পৌঁছাই, গত শুক্রবার রংপুর যাওয়া থেকে আরম্ভ করে নানা রকম বেড়ানোর অভিজ্ঞতা এ সপ্তাহে যা হল, সচরাচর ঘটে না। রংপুর থেকে এসেই গালুডি ও বাসাডেরার জঙ্গল—অমনি সেখান থেকে ফিরেই পুরোনো বাল্যদিনের হালিশহর, শ্যামাসুন্দরীর ঘাট, বল্‌দেকাটা বাগ ও কাঁচরাপাড়ার মধ্য দিয়ে ঘোষপাড়ার দোল ও মুরারিপুরের বাড়ির ছাদে জ্যোৎস্না-রাত্রে বসে চা খাওয়া—অমনি সেখান থেকে পরদিন রাজনগরের বটতলা ও বরোজপোতার বাঁশবন ও ঘেঁটুবন, এ সত্যিই অতি দুর্লভ আনন্দ।

প্রায় একমাস লিখিনি। অনেক রকম ব্যাপার গেল মধ্যে। একদিন রাজপুরে রিপন লাইব্রেরির উৎসবে কৃষ্ণধন দে, অপূর্ব বাগচি, রমাপ্রসন্ন ও গৌরকে নিয়ে এখান থেকেগিয়েছিলুম। ভাঙা রাসমঞ্চে বসে ভোম্বলের সঙ্গে সেদিন খুব আনন্দ করা গিয়েছিল।মাচাতলায় বসে ফুলির সঙ্গে অনেক গল্প করি। ফুলিদের বাড়ি আবার ওরা চা খেলে। জ্যোৎস্নারাত্রে ওদের বাড়ির সামনে মাঠে বসে বেশ লাগছিল।

তারপর ইস্টারের ছুটির আগে একটা শনিবারে বনগ্রামে গেলুম এবং ছোটমামার ছেলেরপৈতের জন্যে বৈকালের ট্রেনে রানাঘাট হয়ে এলুম। সেদিনটাতে নিজের মনের চিন্তা নিয়েভারী আনন্দ পেয়েছিলুম। মামার বাড়িতেও সন্ধ্যার সময় অনেকের সঙ্গে আলাপ হল।

ইস্টারের ছুটিটাও এবার বেশ কেটেচে। খুকুরা ওখানে আছে। আমি বসে কাগজদেখতুম। খুকু এসে ডাকত ওদের উঠোন থেকে—বলত এদিকে আসুন না। গিয়ে গল্প করতুম। ওদের রান্নাঘরে বসে কত গল্প করেচি।

বনগাঁয়ের সরকারি ডাক্তার ও তার স্ত্রী একদিন গ্রামোফোন নিয়ে গিয়ে আমাদের বাড়িহাজির। খুব গান হল।খুকুরা ছাদ থেকে শুনলে।

আমি ও ইন্দু জ্যোৎস্নারাত্রে রোজ নদীর ধারে বেড়াতে যেতুম—একদিন তেঁতুলের নৌকোতে পার হয়ে ওপারের উলুটি বাচড়ায় বসে কত রাত পর্যন্ত গল্প করি।

খুকু একদিন বল্লে—চা খাওয়াব, সন্দেবেলা আসবেন। গেলুম সন্ধ্যাবেলা, কিন্তু সেদিন কি একটা কাজ পড়াতে চা খাওয়া আর হল না।

সেদিন মরগাঙের ধারে বেলেডাঙায় পাঠশালার নীচে গিয়ে বসেছিলুম ইন্দুর সঙ্গে। ইস্টারমনডের দিন রত্নাদেবী দেখা করতে এলেন। তাঁদের সঙ্গে টাওয়ার হোটেলে খুব গল্প-গুজব করি। তিনি তার হাতেআঁকা ছবি একখানা দিলেন আমায়।

আজ বহুদিন পরে গিয়েছিলুম নন্দরাম সেনের গলিতে সেই প্রসন্নদের বাড়ি। বাল্যেএখানে কিছুকাল কাটিয়েচি। আমার তরুণী মায়ের মুখের শাঁখ যেন এই সন্ধ্যায় এ অঞ্চলেকোথায় আজও বাজচে। প্রসন্ন বসে অনেকক্ষণ গল্প করলে। প্রসন্নের মা মারা গিয়েছেন গত ফাল্গুন মাসে। সেই মাখম বুড়ি এখনো বেঁচে আছে।

গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে এসেচি। বেশ লাগছে এবার। ছুটি হবার দু'দিন আগেই এসেছিলুম, বনগাঁয়ে প্রথমদিন দুপুরবেলা খয়রামারির মাঠে বেড়াতে গিয়ে বিল্বফুলের সুগন্ধ আর দুপুরের খর রৌদ্র, নীল আকাশ আমায় স্মরণ করিয়ে দিলে একঘেয়ে কলকাতার সংকীর্ণ জীবন ছেড়ে মুক্ত প্রকৃতির কোলে এসে পড়েচি। দু'দিন পরেই বারাকপুর এলুম, খুকুএখানেই আছে, সেসকালে শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে গল্প করে—বনসিমতলার ঘাটে আবার সেদিন ওর সঙ্গে দেখানাইবার সময়ে, আজ দুপুরে যখন ঝড় উঠল, ও এল ছুটে আম কুড়ুতে, আমি বিলবিলের ধারেরআম গাছটার দুটো আম ওর কাছ থেকে চেয়ে নিলুম— দুটো মোটে পেয়েছিল—দুটোই দিয়ে দিল আমাকে। স্নান করে এসে রোয়াকে দাঁড়াতেই ছুটে ওদের সামনের উঠোনে এসে জিগ্যেস করলে—বনগাঁয়ে যে বিয়েতে গিয়েছিলেন বর কেমন হল তাদের ?...এসব ১৯৩৪/৩৫ সালের সুন্দর গ্রীষ্মাবকাশ মনে এনে দেয়।

সত্যিই এবার ভারী ভাল লাগচে এখানে এসে। একদিন কুঠীর মাঠে বৈকালে বেড়াতে গিয়েচি, দেখি দু'জন লোক খাঁচা নিয়ে ফাঁদ পেতে ডাক পাখি আর গুড়গুড়ি পাখি ধরচে।গুড়গুড়ি পাখি ডাকে কেমন সুন্দর! আমি ও-ডাক অনেক শুনেচি, কিন্তু ও যে গুড়গুড়ি পাখির ডাক তা জানতুম না।

কাল বৈকালে আদিত্যবাবুর মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণে বিকেলে গেলুম বনগাঁ। সঙ্গে ইন্দুর ছেলে গুটুকে গেল। চাকীপাড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে কি চমৎকার গ্রাম্যছবি— চাষার মেয়েরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খাইয়ে হাত মুখ ধুইয়ে দিচ্ছে, কেউ বা কাঁথা সেলাই করচেঘরের দাওয়ায় বসে। সারা পথ বেশ ঝড়ের মতো হাওয়া—দুপুরের অসহ্য গুমোটের পরেশরীর যেন জুড়িয়ে গেল। চাঁপবেড়ের কাছে ভীষণ মেঘ ও কালবৈশাখীর ঝড়। ডালপালাধুলোকুটা উড়িয়ে নিয়ে আসছে, পথ দেখবার জো নেই—ঢংঢং করে ছ'টা বাজল। আমি একটা শিশুগাছের গুঁড়িতে ছেলেটাকে নিয়ে বসি। বাসায় পৌঁছে ওকে কিছু খাবার খাওয়ালুম।মন্মথবাবুর লিচুতলার আড্ডায় খুব গল্প করে আদিত্যবাবুর বাড়ি নিমন্ত্রণ খাই। গরমে কিন্তুরাত্রে ঘুম হল না। জলপাইগুড়ি ছাত্র-সমিতি থেকে সেখানে যাওয়ার নিমন্ত্রণ পেয়েচি, কিন্তু এখন যাওয়া অসম্ভব।

আজ সকালে দু'জনে দিব্য হেঁটে বারাকপুর এলুম। পথে চালকী দিদির বাড়ি গেলুম। দিদি যত্ন করে বেলের পানা, চা, ক্ষীর, কাঁটাল খাওয়ালেন।

বাড়ি আসবার একটু পরেই নামল বৃষ্টি। সেই থেকেই বাদলা চলচে—এখন বেলা পাঁচটা, বৃষ্টি গুঁড়িগুঁড়ি পড়চে। কাল গিয়েচে যেমন অসহ্য গরম, আজ তেমনি ঠাণ্ডা।

সুপ্রভাকে পত্র দিয়েচি, তার চিঠিও এরই মধ্যে পাব আশা করচি। ইতিমধ্যে পিরোজপুর থেকে যে নিমন্ত্রণ এসেচে, তারই বা কি করা যায় ভাবচি। সভাসমিতি করে বেড়ানো এসময়টা মোটেই ভাল লাগে না।

আজ সকালে গোপালনগরে গিয়ে অনেকগুলো চিঠি ডাকে দিলুম। বাড়ি এসে আমতলায়চেয়ার পেতে বসে অনেক দিন পরে Cleopatra পড়চি, এমন সময়খুকুআমার কাছ দিয়েন'দিদিদের বাড়ি থেকে গেল। ইচ্ছে করেই গেল, কারণ সুপ্রভাকে চিঠি লিখতে চাইনি, সেই রাগটা নরম করাতে যে এল, এটি বেশ বোঝাই যায়। ওদের দাওয়ার এধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত গল্প করলে।

বিকালে আমি The Croxley Master বলে Conan Doyle-এর একটা গল্প পড়তে পড়তে বেলা গড়িয়ে ফেললাম। উঠতে আর পারিনে—এমন কৌতূহল। Conan Doyle ছোট গল্পে ভাল শিল্পী ছিলেন। তাঁর A Straggler of 13 এবং আরো দু'একটা গল্পের মধ্যে দেখেচিবড় শিল্পীর কৌশল বর্তমান। এত খুঁটিনাটি বর্ণনার ওপর দখল (অদ্ভুত দখল!) নিম্নশ্রেণীরশিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সামান্য একটু-আধটু সেকেলে claptrap টেক্‌নিক্ আছে—তাধর্তব্যের মধ্যে নয়।

তারপর কুঠীর মাঠ দিয়ে আইনদ্দির বাড়ির পেছনকার উঁচু মরগাঙের পাড় পর্যন্ত গিয়ে সেখানে খানিকটা বসে রইলুম। বেলা একেবারে গিয়েচে। সেই যে রাখাল ছোঁড়া আমায় তামাকখাওয়াত, গত কার্তিক মাসে যখন কুঠীর পেছনের বনঝোপের ধারে বসে 'আরণ্যক'লিখতুম—সেই ছোকরা দেখি পুলের নীচের ঘাট থেকে নেয়ে উঠচে। বল্লে, ভাল আছেনদাদাবাবু? কবে এলেন?

একটু পরে প্রমথ ও তার ভাই-এর সঙ্গে দেখা। সাইকেলে গোপালনগর থেকে ফিরচে।সে বনগাঁ স্কুলের মাস্টার। তার জানবার দরকার দেখলুম ওদের স্কুলের ছেলেরা বাংলায় কতনম্বর পেয়েচে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। বেলেডাঙায় গোয়ালাদের দোকানে বসে একটু গল্প করে মাঠের মধ্যেদিয়ে এসে যখন আমাদের ঘাটে নাইতে নামলুম—তখন অন্ধকার আকাশ তারায় তারায় ভরে গিয়েচে। সাঁতার দিয়ে গেলুম ওপারে। এপারের ঘন অন্ধকার বনঝোপে কি জোনাকি পোকারমেলা!

ফিরে এসে খুকুদের দাওয়ায় বসে কতক্ষণ গল্প করলুম—হীরাবাঈ ও কেশরীবাঈ-এর গানের সম্বন্ধে, Life of Emile Zola'ফিল্ম সম্বন্ধে।খুকুবল্লে—সেই যে কি একটা ফিল্ম দেখেছিলেন—পাহাড় থেকে পড়ে গেল, কি একটা চমৎকার কথা আছে তাতে?

আমি তখনই বুঝতে পেরেচি, ও A Tale of Two Cities'-এর কথা বলচে।

বল্লুম—কথাগুলো কি? Iam the Resurrection and the Life, said the Lord :He that believe in Me'-এই পর্যন্ত বলতে ও বলে উঠল—হাঁ, হাঁ—ঠিক।

বল্লুম—পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া তো নয়—গিলোটিনে যখন ওদের প্রাণদণ্ডহচ্ছে—সে সময়।

ও বল্লে—ঠিক, এবার সব মনে হয়েচে।

মনে এবার কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের আনন্দ ও উত্তেজনা।

কাল পচার সঙ্গে বিকেলে কুঠীর মাঠের দিকে বেড়াতে বেরিয়ে যখন বেলেডাঙায় কামারদোকান পর্যন্ত গিয়েচি, আইনদ্দি চাচা ডাক দিলে।

—কি চাচা, কেমন আছ?

চাচা বিদ্যাসুন্দর ও মহাভারত দিব্যি মুখস্থ বলে গেল। বল্লে, একখানা বিদ্যাসুন্দর আমারছেল, কে যে নিয়ে গেল!

তারপর আমরা গিয়ে কলাতলার দোয়াতে বসলুম। ভারী সুন্দর জায়গা। অনেকখানি জলআছে। জলের একধারে ফুল ফোটা হিঞ্চের ক্ষেত। জলের ধারে দীর্ঘ দীর্ঘ জলজ ঘাস। বেশসুন্দর ঠাণ্ডা জায়গা। দূরে বট-অশ্বত্থের সারি।

আজ বৈকালে কলাতলার দোয়াতে বেড়াতে গেলুম। চমৎকার ঝিঙের ফুল ফুটেছে।অনেকক্ষণ কাটালুম বৈকালে—এদের সকলের কথাই মনে হল। ঘর সংক্রান্ত একটা গোলমাল হয়েচে, মটকা কাল ঝড়ে উড়ে গিয়েচে—ভগবান এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

অনেকগুলো চিঠি নানা জায়গা থেকে আজ এসেচে। প্রকাশকদের নিকট থেকে, সভাসমিতি সংক্রান্ত ইত্যাদি। সুপ্রভার চিঠিও ছিল। কলাতলার দোয়াতে জলের ধারে বসে কত কথা মনে এল। রেণুর একখানা পত্রও পেয়েচি আজ অনেকদিন পরে। চাটগাঁয় গিয়েছিলুম সেই কতদিন আগে—এখন আমাদের দেশের এই খেজুরের কাঁদিভরা খেজুর গাছ, ওল গাছ, ঝিঙেরক্ষেত, ধানক্ষেত, বট-অশ্বত্থের গাছ, ওপারে আরামডাঙ্গার বাঁশবনে অস্তসূর্যের হলদে রোদেরদিকে চেয়ে সে কথা ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যাই।

গোপালনগর যাচ্চি, দারিঘাটার পুল থেকে বাঁওড়ের ওপারের কি একটা গাছ, অনেকখানিনীল আকাশ—দেখে মনে হল এই অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পিছনে যে শক্তি আছেন, সেই শক্তি মানুষের সুখ-দুঃখে সাড়া দেন এবং benevolent নিশ্চয়ই—ওবেলা একটা বিশেষঘটনায় তার প্রমাণ পেয়েচি। মনে একটা অপূর্ব অনুভূতি জাগলো এই কথাটি ভেবে। বস্তুত এইভাগবতী শক্তি—যে মুহূর্তে আমরা জীবনের পথে মেনে নেব—এর বাস্তবতা অনুভবকরব—সেই মুহূর্তে আমরা আধ্যাত্মিক নবজীবন লাভ করব।

সন্ধ্যার পরে ইন্দুদের বাড়ি বেড়াতে গেলুম। ফণীকাকা ছিল বসে—১৩০৫ সালেরামাচাঁদ মারা যান, সে কথা হল। যুগলকাকার মা আর সরোজিনী পিসিদের, ত্রিনয়নী পিসিমা (তখন বালিকা) ফণীকাকাদের বাড়ি থাকত সারাদিন, খেত—কারণ খুব গরিব তখন ওরা—সেইসব গল্প শুনলুম।

রোয়াকে বসেচি। তারাভরা আকাশ। গভীর রাত্রি। পাশের বাড়িতে সবাই ঘুমিয়েপড়েচে। আবার সেই সক্রিয়, হৃদয়বান, (পার্থিব ভাষায়) benevolent শক্তির কথা মনে এল।এই শক্তিই ভগবান। যে মনে মনে একে মানে, এই শক্তির বাস্তবতা অনুভব করে প্রাণে প্রাণে, সে সকল বিপদ, সংকীর্ণতা, মলিনতাকে জয় করে।

বৈকালে সাজিতলার ঘাটে টিনের চালায় আমি আর পচা গিয়ে বসলুম। সারাদিন ঝড়চলচে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, মাঝে মাঝে বৃষ্টি আসচে।

বাল্যে আমি আর ভরত এমন দিনে এই গ্রীষ্মের ছুটিতে দিগম্বর পাটনীর খেয়ানৌকোতে মাধবপুরের হাটুরে লোকদের পার করতুম—সে কথা মনে পড়ল। একবার আমারপাঠশালার সহপাঠী বন্ধু পার্বতী আর তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে কি আনন্দেরদিনই গিয়েচে!

শম্ভু কি করে মারা গেল ইন্দু সেই গল্প করছিল। ওখান থেকে উঠে আমরা কুঠীর মাঠের দিকে গেলুম, সন্ধ্যার কিছু আগে মেঘান্ধকার আকাশের নীচে এপার-ওপারের শ্যামল মুক্ত মাঠ ওবনানীর, ক্ষুদ্র নদী ইছামতীর কি শোভা! পচাকে আর সঙ্গে নিয়ে যাব না— কথা বলে সব মাটি করে দেয়।

ভীষণ ঝড়বৃষ্টি সকাল থেকে। এক মুহূর্তের জন্যে বিরাম নেই। খুড়িমা এলেন বৃষ্টি মাথায় চা নিয়ে। বল্লেন—খুকুকরেচে, বলছিল, বিভূতিদা'কে একদিন চা করে খাওয়াব বলেছিলাম, তাআজ করি। একটু পরে চায়ের বাটি ওদের বাড়ি দিতে গিয়েচি, খুকু বল্লে—জল খাবেন না? মাজিগ্যেস করল। অর্থাৎ মুড়ি দিয়েছিল চায়ের সঙ্গে তাই জল খাব কিনা জিগ্যেস করচে। জলেরঘটি ওর কাছেই ছিল, নিয়ে জল খেলাম। তারপর গোপালনগর এলাম 'আরণ্যক'-এর প্রুফ ডাকে দিতে। মাঝের গাঁয়ের জিতেন সাধু দেখি তেরোখানা মোটর নিয়ে চলেছেন। চালকীর 'জিতেনদা' একখানা মোটরে ছিলেন সেখানায় দেখি মোটেই স্থান নেই। কাজেই তখন রেললাইন দিয়ে হেঁটেই পাঁচ মাইল রাস্তা চলে গেলুম। পূর্ব দিকের আকাশ চমৎকার নীল দেখতে হয়েচে। আমি স্টেশনে পৌঁছেচি, অন্ধকারও নামল। অমূল্যবাবুদের বাড়ি গিয়ে সারারাত জাগা, বিজয় মুখুজ্যে আর অনাথ বোসের গান হল। রাত চারটে যখন বেজেচে তখন বীরেন সামনেরএকটা বাড়ির দোতলায় শোয়াতে নিয়ে গেল আমায়। তখনঘুম হওয়া সম্ভব নয়, একটু পরে ফর্সা হয়ে গেল। আমি মিনুদের বাড়ি চলে এলুম। সেখানে ওরা ছাড়লে না—খাওয়া-দাওয়া করিয়ে তবে ছেড়ে দেয় বেলা দুটোর পরে। আড়াইটার ট্রেনে জিতেন ঠাকুরের দলবলের সঙ্গে গোপালনগরে নামি। ওরা মোটরে কলকাতা চলে গেল। তারপর নামল বৃষ্টি। আমি এখানেওখানে বসে গল্প করে সন্ধ্যার আগে বাড়ি এলুম। খুড়িমা ডাকছেন ও-বাড়ি থেকে, বিভূতি এলেনাকি? বল্লুম—হ্যাঁ খুড়িমা। তারপরে ওদের ওখানে ঘরে গিয়ে কাল রাত্রের ঘটনা বর্ণনা করি।

সকালে বিশেষ কাজে গোয়াড়ি যেতে হয়েছিল। একটা বড়চমৎকার অভিজ্ঞতা হল।আজ প্রায় ৩৩ বছর পরে আমাদের বাল্যের চাটুয্যেবাড়ির ঠাকুরমায়ের নাতনি লীলাদিদির সঙ্গে দেখা হল। গোয়াড়ির মধ্যে এক সময়ে যদু চাটুয্যে বিখ্যাত উকিল ছিলেন, লীলাদিদির সঙ্গে তাঁর বড় ছেলে হরি চাটুয্যের বিবাহ হয়েছিল। লীলাদিদি এক

সময়ে খুব সুন্দরী ছিলেন—আমি ৩৩ বছর পূর্বে বাবার সঙ্গে একবার সেখানে গিয়েছিলাম, বছর সাতেক বয়স তখন। লীলাদিদি কড়ায় করে মাছ ভাজছিলেন—সেকথা আমার মনে আছে। এখন তিনি বৃদ্ধা!

কাল ওঁদের বাড়ি গিয়ে দেখি যদুবাবুর বাড়ির পূর্বের সে সমৃদ্ধি কিছুই নেই। চাকরে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গেল, গিয়ে দেখি এক বৃদ্ধা বসে আছেন—এই বৃদ্ধা যে ৩৩ বছরপূর্বের সেই সুন্দরী লীলাদিদি (এখনো আমার একটু একটু মনে আছে বাল্যে দৃষ্ট তাঁর সে অপূর্বরূপ), তা বুদ্ধি দিয়ে বুঝলেও মন দিয়ে গ্রহণ করা শক্ত।

লীলাদিদির এক ছোট বোন, তার নাম যোগমায়া—ছেলেবেলায় আমার খেলার সাথীছিল। লীলাদিদিই বল্লেন—যোগমায়া আমার মেজমেয়ের বয়সী। সুতরাং যোগমায়া লীলাদিদিরচেয়ে অনেক ছোট। আমার চেয়ে বছর চারেকের বড় ছিল যোগমায়া। খুকুদের বাড়িতে বাঁশেরও থলের দোলায় করে খেলা করেছিলুম মনে আছে। কার কাছে যেন শুনেছিলুম—সেও আজ১৫/২০ বছর আগে, যে যোগমায়া মারা গিয়েচে। মনে দুঃখ হয়েছিল। কাল হঠাৎ লীলাদিদির কাছে যোগমায়ার নাম করতেই তিনি বল্লেন— যোগমায়াও এখানে আছে, খোড়ের ধারে তারবাসা।

আমি তো অবাক!

সেই যোগমায়া...বিশ বছর আগে শুনেছিলুম যে মরে গিয়েচে—আজ বিশ বছর ধরেইমনে মনে ঠিক করে রেখেচি যোগমায়া নেই, সে যদি আজ হঠাৎ বেঁচে আছে শোনা যায় তবেসেটা যেন পুনর্জন্মের মতো রহস্যময় শোনায়।

যোগমায়ার সঙ্গে দেখা করা কিন্তু ঘটে উঠল না। ট্রেনের সময় ছিল না। লীলাদিদি চা ও খাবার খাওয়ালেন। দেখা করে বিদায় নিলুম।

এই তো গোয়াড়ি—একদিন দেখা করব যোগমায়ার সঙ্গে।

সুপ্রভার পত্র শ্যামাচরণদাদা দিলে হাজারির দোকানে, আমি তখন স্টেশনে যাচ্ছি। ট্রেনেপত্রখানা পড়তে পড়তে গেলুম। বেশ আনন্দ পাওয়া গেল পত্রখানা পড়ে।

আজ মনে বড় আনন্দ ছিল, কারণ অনেকদিন পরে মেঘ দূর হয়ে রৌদ্র উঠেছিল। খুকুকতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের শিউলিতলায় বন্দী করলে। বল্লে, ভবিষ্যতের কথা ভাবলে কষ্টহয় না? আমি বল্লুম—সময়ের সার বর্তমান, ভবিষ্যতের ভাবনা মিথ্যে।

বৈকালে পরিষ্কার আকাশের তলা দিয়ে পচার সঙ্গে কলাতলার দোয়া পার হয়েসুন্দরপুরের কাছাকাছি গেলুম বেড়াতে—এক জায়গায় জলের ধারে দুজনে বসে ওর পঞ্চাননমামা কি করে ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করেছিল সে গল্প শুনি। এক গরিব ভদ্রলোকের মেয়ে ছিলপরমা সুন্দরী, তার বাপকে ওদের সে বখাটে মামা শোনালে যে সে পচাদের বিষয়ের আট আনার অংশীদার। বিয়ে হয়ে গেল—তারপর মেয়েটার কি দুর্দশা! গল্পটা শুনে মনে বড়ই কষ্টহল।

জলের ধারে ঝিঙে ফুল ফুটেছে। পরিষ্কার আকাশ, খেজুর গাছে গাছে স্বর্ণবর্ণ খেজুরের কাঁদি। একপাশে সবুজ উলুটি-বাচ্‌ড়া, বড় বড় বট-অশ্বত্থ, শিমুলগাছ। ওর মুখে গল্প শুনি আর ওবেলার মনের সে আনন্দটা আবার মনে আনবার চেষ্টা করি। কত গাছ, লতা মোটামোটা—একটাতে কেমন দুলবার সুবিধে আছে। বিল্বপুষ্পের বাস এখনো আছে দু-একটা গাছে।বাঁওড়ের ওপারে কি সুন্দর ইন্দ্রনীল রংয়ের আকাশ হয়েচে!

আইনদ্দি চাচার বাড়ি এসে বসি। আমার মনের আনন্দের সঙ্গে আইনদ্দির বাড়ির একটাযোগ আছে। চাচা বসে খালুই বুনচে। ওর সেই নাতি বসে বসে গল্প করতে লাগল। বেশছেলেটি। আমি বসে বসে ওপারের বট-অশ্বত্থের

সারির দিকে চেয়ে রইলুম। কি সুন্দর আকাশ, কি চমৎকার সবুজ বনশোভা, কত কথা মনে আসচে, সুপ্রভার কথা, সে লিখেচে, এবার আর দেখা হবে কবে, সে কথা।

দেখা ওর সঙ্গে করব শ্রাবণ মাসে, ঠিক করেই রেখেচি। সে সময় চেরাপুঞ্জিতে আনারস খুব সস্তা হবে। যে সময় চেরাপুঞ্জির বাজারের সেই খাসিয়া মেয়েটার দোকান থেকে আরবছরের মতো একটা গোটা আনারস কিনে খেতে পারব, সে সময় যাব শিলং।

এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে যেমন অপূর্ব দিনগুলো কাটচে, এমন সত্যিই অনেক দিন কাটেনি।সেবারের বড়দিনকেও ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েচে, রসের ও আনন্দের অভিনবত্বে ওপ্রাচুর্যে।

এদিন বিকেলে পচা রায়কে সঙ্গে নিয়ে যাইনি। ওর সঙ্গে বেরুলে কেবল বাজে বকে। প্রকৃতির মধ্যে কিছুক্ষণ নিরিবিলি চুপচাপ বসে চিন্তার আনন্দ উপভোগ করার জন্যে একাই গিয়েমরগাঙের উঁচু পাড়ে আইনদ্দির বাড়ির পিছনদিকে রাস্তার ধারে বসলুম সঙ্গে সুপ্রভার চিঠিখানাছিল। ডাইনে মরগাঙের বাঁকে বাঁশঝাড় ও নতুন পাড়ায় গোয়ালাদের বাড়ি, ওপারেআরামডাঙায় ঝিঙেফুল দু'একটা ঝিঙে ক্ষেতে, পেছনে একটা কাঁটাল গাছে কাঁটাল ঝুলচে, খেজুর গাছে কাঁদি কাঁদি স্বর্ণবর্ণ খেজুর—সত্যিকার ট্রপিক্যাল দেশের দৃশ্য! কলকাতা থেকে কতদূরে, কত নিভৃত, শান্ত পল্লী অঞ্চল আমাদের এ দেশ—কেমন একটা অপরূপ শান্তি মাখানো।ভগবান যে Romance ও Poetry-র উৎসমূল, তার মধ্যে যে শুধুই Poetry ও Romance এ আমি বেশ অনুভব করলুম। কোথায় বিরাট দ্যুতিলোকের সৃষ্টি, আর কোথায় এই কাঁদি কাঁদিখেজুর, ওই বেগুনী রং-এর জলকচুরির ফুল, সুগন্ধ বেলফুল সবই তার মধ্যে কল্পনারূপেএকদিন নিহিত ছিল। "কল্পনা সৃষ্টিবীজঞ্চ"। কল্পনাই সৃষ্টির বীজ। "যা সৃষ্টি স্রষ্টুরাদ্যাঃ"— কালিদাস কবি হলেও দার্শনিকের দৃষ্টি তাঁর ছিল। আমরা সকল কবিই অল্পবিস্তর ভাবে দার্শনিক তো বটেই। অনেক সময় তারা যা দেখেন, দার্শনিকেরাও তা দেখতে পান না।

এখানে ক'দিন ভয়ানক বর্ষা চলচে। সকালে উঠে বেড়াতে বার হয়েচি পিরোজপুর বলে একটা গ্রামের দিকে। পাশে একটা ছোট খাল। বাঙাল মাঝিরা নৌকো চালাচ্চে। নারিকেল সুপারির বাগান চারিদিকে প্রত্যেক লোকের বাড়ির উঠানে, ঝুপসি বনে অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে মাটি। টিনের চালাওয়ালা দরমার বেড়া দেওয়া সব ঘর—তার বাইরে টিনের সাইনবোর্ডঝুলচে, "মোজাহার আলি মোক্তার" কিংবা "আজাদ আলি, বি-এল, প্লীডার"।বাড়ির পাশেছোট ছোট ডোবা মতো পুকুর—সুপুরির বাক্‌লো দিয়ে ঘেরা বেড়ায় আবরু। আবর্জনা, পচাপাতার জঞ্জাল বাড়ির পাশেই, নীচু আর্দ্র উঠোনে বা মেঝেতে। এক জায়গায় লেখা আছে 'রসিকলাল সেন নায়েবের বাসা'। তারপর একটা সরু খালের ধারে ধারে নারিকেল সুপুরির ছায়ায় ছায়ায় কতদূর বেড়াতে গেলুম, ফিরে এসে একটা কাঠের পুলের ওপরে বসলুম। দুটি ছোট ছোট মেয়ে মাছ ধরছে। কতক্ষণ পুলটাতে বসে রইলুম। কি বিশ্রী জায়গা এই পিরোজপুর! পাঁচশো টাকা মাইনে দিয়ে যদি কেউ বলে তুমি এখানে এক বছর থাক—তা আমি কখনোথাকিনে। এমন জায়গায় মানুষ থাকতে পারে? রত্না দেবী ও তাঁর স্বামী সত্যিই বড় কষ্টেথাকেন, অমন আমুদে লোক বেশি দেখা যায় না। রত্না দেবী বড় গল্পপ্রিয়—দিনরাত মুখের বিরাম নেই। আর কি সেবা-যত্ন ক'দিন! নিত্য নতুন খাবার তৈরি হচ্ছে আমায় খাওয়ানোরজন্যে। বৈকালে বার-লাইব্রেরিতে মিটিং হল, আমার সাহিত্য-জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে একঘণ্টা বক্তৃতা করা গেল। জ্যোৎস্না রাত্রে বাইরে বসে গল্প করি রত্নাদেবীর সঙ্গে।

পিরোজপুর থেকে এসে মনে কোথায় একটা অযুক্তির দৈন্য ছিল। সেখানকার সেইনারকোল সুপুরি বনের ঝুপসি ছায়ায় স্যাঁতসেঁতে ভিজে উঠোন আর সুপুরির বাকলোর আবরুরকথা, সেই রসিকলাল সেন নায়েবের কথা মনে হলেই মনে একটা অস্বস্তি আসত। আমাদেরদেশে আসবার সময় ঝিকরগাছা ঘাটে পৌঁছেই মনে হল স্বদেশে পৌঁছে গেচি। নাভারনেরকাছে যশোর রোড ও বিলিতি চটকার ছায়া দেখে মনে হল আমরা একেবারে বাড়ি

পৌঁছেগেচি। বাড়ি এলুম ন'টার গাড়িতে। এসেই খুকুর সঙ্গে দেখা। ও দেখি ওদের দাওয়ায় বেড়াচ্চে, আমায় দেখে প্রথমটা পিছু হটে সরে গেল, তারপরই চিনতে পেরে ছুটে এল। পিরোজপুরেরগল্প হল অনেকক্ষণ। ওর জন্যে যে কেক্ পাঠিয়েছিল তা দিয়ে এলুম।

পরদিন এল সুধীরবাবুরা। ওদের নিয়ে হৈ হৈ করে দিন কেটে গেল। মোটরখানা ওদের রইল আমাদের আমতলায়। আমাদের ঘাটে স্নান করিয়ে আনলুম সবাইকে। নদীতে স্নান করেসব খুব খুশি।

ওরা চলে গেল বৈকালে। পরদিন এল কালী চক্রবর্তীর ঘোড়া আমাকে সিমলে নিয়েযাবার জন্যে—অনেকদিন পরে ঘোড়ায় চড়া গেল। গোপালনগর স্টেশনের কাছে ছাতি সারিয়েনিলুম—তারপর গণেশপুরের পাশ দিয়ে পাকা রাস্তা থেকে মাঠের রাস্তায় নেমে সোজাহাতিবাঁধা বিলের পাশ দিয়ে চললুম। কত গাছপালা, বটতলা, ঝোপঝাপ পার হয়ে যে চলেচি!আসবার সময়েও তাই। তখন বৈকালের ছায়া পড়ে এসেচে, হাতিবাঁধা বিলের চমৎকারশোভা হয়েচে—কতদূর জুড়ে প্রশান্ত চক্রবালরেখা দূরত্বের কুয়াসায় অস্পষ্ট। হে ভগবান, আমি আপনার এই মুক্ত রূপের উপাসক। যদি কখনো আসেন, তবে এই রূপেই আসবেন। নভোনীলিমা যেখানে মেঘলেশশূন্য, দিকচক্রবাল যেখানে মুক্ত, উদার—ধরার অরুণোদয়যেখানে নিবিড় রাগরক্ত, সে রূপেই আপনি দেখা দিন—রসিকলাল সেন নায়েবের বাসা থেকেআমায় মুক্তি দেন যেন।

সিম্‌লে থেকে ফিরে যখন নদীতে যাচ্চি গা ধুতে—বেলা খুব পড়ে গিয়েচে, ছায়ানিবিড়হয়েছে বাঁশবন। খুকুওদের সঙ্গিনীদের সঙ্গে ঘাট থেকে ফিরচে, বাঁশবনের পথে দেখা ঠিকপুঁটিদিদিদের বাড়ি থেকে নেমেই। ওরা সঙ্কুচিত হয়ে এক পাশে দাঁড়াতে যাচ্চে, বল্লুম—চলেআয়। ও আমার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে হাসতে হাসতে গেল, কি সুন্দর হাসতে পারে! একতরুণ মুখের প্রসন্ন হাসিতে সারাদিনের মানসিক দৈন্য যেন এক নিমেষে ঘুচে গেল।

গিরিনদাদাদের কলাবাগানের মাঠে কতক্ষণ বসলুম, আকাশ রঙীন মেঘস্তূপে ভরা— সবুজ মাধবপুরের চর, বাঁশবনের দুলুনি কেমন সুন্দর! কত বছর চলে যাবে, ওই বনসিমতলার ঘাটে অনাগত দিনের তরুণী বধূ ও মেয়েদের জলসিক্ত পদচিহ্নে আঁকা থাকবে একটি অপূর্ব প্রণয়-কাহিনী—হয়তো কেউ কখনো বলবে, ছিল এরা দু'জন অতি প্রাচীনকালে—গ্রামের স্নিগ্ধ বসন্ত দিনের বাতাসে তার মূর্ছনা থেকে যাবে।

সকালে যখন বসে লিখচি, তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল, একটু পরেই এল বৃষ্টি।একবার দেখিখুকুবিলবিলে থেকে উঠে গেল, কিন্তু বোধ হয় খুবই ব্যস্ত ছিল, তাই চেয়ে দেখলনা এদিকে। স্নান সেরে এসে যখন গেল, তখন বোধ হয় মনে পড়ল, তাই চেয়ে হেসে গেল। কালোর সঙ্গে বাঁওড়ের ধারের বটতলায় বেড়াতে গেলুম। একটা গাছে উঠে বসেচি, এক বৃদ্ধতার দুই ছেলেকে নিয়ে বেলেডাঙায় কুটুমবাড়ি যাচ্চে। আমার গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কতক্ষণগল্প করে গেল। স্নান করতে জলে নেমে দেখি ভারী চমৎকার দৃশ্য ওপারের মাধবপুরের সবুজ উলুবনের চরে। দুপুরে যখন ঘরে শুয়ে আছি, তখন খুব বৃষ্টি এল। বৈকালে বেড়াতে গেলুম বেলেডাঙার জলে—আবার ওবেলার সেই বেলেডাঙার ছেলেটার সঙ্গে দেখা। নদীজলে স্নানকরে আনন্দ হল, জ্যোৎস্না এসে পড়েচে নদীজলে। চমৎকার দেখাচ্চে।

রোয়াকে খুব জ্যোৎস্না। চেয়ার পেতে বসেচি, খুকু ডাকলে—প্রথমে ওদের শিউলিতলার উঠোনে দাঁড়িয়ে হাসচে হিহি করে, তারপর ডাকলে—বল্লে, আসুন না! গিয়ে বসেচি, ও উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করচে। আমার ছুটি ফুরিয়ে এল শুনে বলচে—আমিও ছ'ঘরেযাব। মা এখানে থাকবে। আপনি আর সেখানে যেতে পারবেন না, মজা হবে।

বল্লুম—মজা বেরিয়ে যাবে, বুঝবি তখন।

বল্লে—তা বটে।

বসে গল্প করচি, একবার বৃষ্টি এল। আমার চেয়ার পাতা রয়েচে রোয়াকে, উঠতে যাচ্চি, ও উঠতে দেবে না। বল্লে—বসুন, বসুন, বৃষ্টি ওই থেমে গেল! বল্লে, কালঅত সকালে উঠেগেলেন কেন? বল্লুম—পাঁচু কাকার ছেলের আশীর্বাদ হচ্ছিল, তাই। একটা ছোট গল্প বলতেবল্লে। কিন্তু সাধক-দাদার বাড়িতে একজন গায়ক এসেছিল, তার গান শুনতে বড় ইচ্ছে হলবলে চলে এলুম।

বনগাঁয়ে যেতে হল নৌকোতে পচা রায় ও তাদের দুই ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে।বারলাইব্রেরিতে প্রফুল্লর কাছে বিশেষ দরকার ছিল, সেখান থেকে বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা করে মন্মথবাবুর লিচুতলা ক্লাবে বসে ফিরোজপুর ভ্রমণের গল্প করি। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যার পর নৌকো ছাড়া হল। মেঘলা আকাশে চাঁদ উঠেছে, ঝিরঝিরে বাতাস, পচা বেশ নানারকম গল্প করতে করতে এল। সুখপুকুরের ঘাট থেকে সয়ারামকে উঠিয়ে নেওয়া হল।

খুকু আজ এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে ওদের শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে। আমি তখন স্নানকরে এসে সবে বসেচি, ঝমঝম্ রোদে ও খাড়া দাঁড়িয়ে রইল উঠোনে, আমিও রোয়াকে চেয়ারপেতে বসে রইলুম। একবার দুপুরের পরে খুড়োদের বাড়ির দিক থেকে এল। কতক্ষণ দাঁড়িয়েগল্প করলে। তারপর আমি Cleopatra পড়ে, তাতেই মশগুল হয়ে বেড়াতে গেলুমবেলেডাঙায় বড় বটতলা ছাড়িয়ে সুন্দরপুরের পথে। রাত্রে খুকুদের দাওয়ায় বসে Cleopatra-র ইতিহাস বলি। ওর ভারী ভাল লেগেচে। বললে,—আজ এত দেরি করে এলেন যে? বল্লুম—খুড়ো এসে বসে গল্প করছিল, তা কি করি? পরদিনও Cleopatra-র গল্প শুনেখুকু ভারী খুশি, হেসে বলছে—আহা, বলবার কি ভঙ্গি! কচুকাটা করচে! ওর হাসি আর থামে নাযখন বলেচি হারম্যাকিস্ কি করে মার্ক এন্টনির সেনাপতিদের Caesar-এর দলে যোগদেওয়ালে।

সন্ধ্যার জলে নেমে বনসিমতলার ঘাটের দিকে চেয়ে, পয়লা আষাঢ়ের নবনীল নীরদমালার দিকে চেয়ে, ওপারের শ্যামমাধবপুরের চরের দিকে চেয়ে আনন্দে মন ভরে উঠল।এই বনসিমতলার ঘাট কত ভাবে সার্থক হল!

এবারকার গ্রীষ্মের ছুটির মতো আনন্দ কোনোবার হয়নি।

বনসিমতলার ঘাট থেকে যখন স্নান করে আসচি, সুয়োথলী আমগাছটার তলায় মাথা মুছবার জন্যে দাঁড়িয়েচি, ঘন মেঘান্ধকার সন্ধ্যা—অস্তমেঘের রাঙা আভা ভূষণ জেলের জমিরএকটা ময়নাকাঁটা গাছের গুঁড়িতে পড়ে কি অপূর্ব শোভাই হয়েচে!

বাদলা-বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মশা বেড়ে গেচে। বিলবিলে জলে টইটুম্বুর, বকুলগাছ ও আমগাছগুলোর ভিজে ভিজে কালো গুঁড়ি, কাঁটাল গাছে কাঁটাল ঝুলচে। এই আর্দ্র, মশকসঙ্কুল, অতি নিরানন্দ স্থান কিন্তু অপূর্ব কবিতাময়। অন্তত আমার কাছে এ সমস্তটা মিলে এক অফুরন্ত, চিরনূতন কবিতা।

বসে পড়চি রোয়াকে, চেয়ারটা খুড়োদের বাড়ির দিকে ফেরানো, হঠাৎ যেন মনে হল বিলবিলের জলে ঝুপ করে একটা আম পড়ল। তাকিয়ে দেখচি, আর একটা ঝুপ করে শব্দ হল।

তারপর আবার একটা।

আশ্চর্য হয়ে ভাবচি এত আম পড়চে কোথা থেকে, তখন দেখি কে যেন বিলবিলের ওঘাট থেকে কি একটা ডাল ছুঁড়ে জলে মারচে।

আমি চেয়ে দেখতেই খুকুহাসতে হাসতে উঠে এল—বল্লে, কবির তন্ময়তা ভেঙে দিয়ে কি খারাপ কাজই করেচি!

...সুন্দর কবিতা।

কিংবা এ যদি কবিতা না হয়, তবে কবিতা কি, তা আমার জানা নেই।

যেখানে জীবন, যেখানে আনন্দ, যেখানে প্রাণের প্রাচুর্য ও নবীনতা—তাই Testament of Beauty—কবিতা।

একদিন বিকেলের দিকে মেঘের সৌন্দর্য ভারী চমৎকার ফুটচে সূর্য অস্ত যাবার সময়।পচা রায় মাছ ধরতে বসেচে কুঠীর নীচে—তার ওখানে গিয়ে বসে গল্প করি। আর এপারওপারের শ্যামল সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে দেখি—কয়টি উলুবন, খেজুর গাছ, পটল ক্ষেত, ঝিঙের ক্ষেত, শান্ত কালো নদীজল, কাঁটাশেওলার দাম, নলে ভেলের ডিঙি নৌকা—ওপরেনীল আকাশ, রাঙা মেঘ—সব সুদ্ধ মিলিয়ে চমৎকার ছবি।

আজ দিনটা বেশ চমৎকার। সারা ছুটির মধ্যে এমন পরিষ্কার দিন আসেনি। বল্লার ভাঙনের কাছে একটা চারা শিমুল গাছ আছে, তার চারিপাশে সবুজ কচি ঘাস বন, নিকটেউলুখড়ের রাশি রাশি ফুল ফুটেছে, ঝলমলে রোদ, নীল আকাশ। রৌদ্রে ঘাসের ওপর শুয়েথাকতে বেশ মজা। স্নান করে এসে বসেচি, খুকু এসে অনেক গল্পগুজব করলে। বিকেলে কি চমৎকার রোদ! এমন রোদ এবার সারা জ্যৈষ্ঠ মাসে দেখিনি। পচা রায় মাছ ধরতে গেল। কুঠীরনীচেই জলের ধরে ঘন বন, তার মধ্যে ঢুকে খানিকটা বসি। এমন ঘন বন যে এদিকে আছে তাজানা ছিল না আমার। জলের ধারে কতক্ষণ বসে গল্প করি পচার সঙ্গে। আকাশের বড় বড়মেঘস্তূপ ক্রমে রাঙা হয়ে এল বেলা পড়লে। আমি উঠে মাঠের মধ্যে বেড়াতে গেলুম। এদিকেরমাঠ ওদিকের চেয়ে অনেক ভাল। কুঠীর নীচে সেই জলটার চারিপাশের দৃশ্য বড় সুন্দর।আমাদের ঘাটের ওপরে ডাক্তারদের কলাবাগানে একদল গোয়ালা গরু চরাতে এসে রান্নাবান্নাকরছে। তাদের কাছে বসে খানিকটা গল্প করলুম। ওদের বাড়ি ঝিকরগাছার কাছে। ও-দেশ জলে ডুবে গিয়েচে বলে এখানে গরু চরাতে এসেচে।

আজ আকাশের রং অদ্ভুত রকমের নীল, এমন নীল রং সেই আর বছর আষাঢ় মাসেরপরে আর কখনো দেখিনি, বৃষ্টি-ধৌত আকাশ না হলে এমন নীল রং বুঝি ফোটে না। মদের নেশার মতো কেমন নেশা লাগিয়ে দিল এই আকাশের নীল রংটা। রোদের রং হয়েচে অদ্ভুত—প্রখর সাদা নয়, যেন হলদে ধরনের। গাছপালা ঘাসের রং যেন হয়েচে হলদে।আমাদের ঘাটে নাইতে যাবার আগে মাঠে বেড়াতে গিয়ে দূরের বাঁশবন, কাঁদি কাঁদি খেজুরঝোলানো খেজুর গাছ, অন্যান্য গাছগুলোর রৌদ্রালোকিত পত্রপুঞ্জের দিকে চেয়ে চোখ আর ফেরাতে পারিনে। আমাদের ঘাটের ধারে ফুলভর্তি বা গাছ, সাদা-ডানা প্রজাপতিউড়চে—সে দৃশ্যটা মনে অপূর্ব ভাব নিয়ে এল। এই নীল আকাশ থাকবে আরো ষাট বছর পরে, এই বনসিমতলার ঘাট থাকবে তখনো, ওপারের চরে এমনি উলুর ফুল ফুটবে, এমনিসাঁইবাবলার পত্রশীর্ষ বৃষ্টি-ধোয়া নীল আকাশের তলে সূর্যের আলোর দিকে খাড়া হয়ে রইবে, কত অনাগত তরুণী বধূরা জলসিক্ত পদচিহ্ন অঙ্কিত করে ঘাটের পথে যাওয়া-আসা করবে, আমি তখন আর থাকব না এ গ্রামে জানি—তবুও আমার কথা গাঁয়ের আষাঢ় দিনের হাওয়ায়, নির্মল নীল আকাশের আনন্দের মধ্যে অদৃশ্য অক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে, সেই দূর ভবিষ্যতেরকথা মনে হয়ে চলমান জগতের রূপ আমার মনে আনন্দের বাণী বহন করে আনলে।

আজ সন্ধ্যায় কি অপূর্ব শ্রী! অস্তমান সূর্যের রঙে সমস্ত মাঠ, বন মায়াময় হয়েগিয়েচে—সারা পৃথিবীটা কি অপরূপ শিল্প তাই ভাবি। আকাশের রং নীল নয়—সে কি রংতার বর্ণনা দেওয়া কঠিন—ওরকম রং-এর কি নাম তা আমার জানা নেই। সন্ধ্যায় নদীজলেনেমে স্নান তো যেন দৈনন্দিন উপাসনা।

আজ এখানে বেড়াবার শেষ দিন। কারণ কাল শুঁটোর বিয়েতে যদি বরযাত্রীদের সঙ্গেযেতে হয়, তবে কাল আর আসতে পারব না। পচা রায়কে সঙ্গে নিয়ে যাব, তার একটু আগেখুকু উঠোনে দাঁড়িয়ে গল্প করে গেল, তাতে হয়ে গেল একটু দেরি। আমি পচাদের বাড়ি গিয়েদেখি সে নেই। গাজিতলার পথে সে অনেক দূরে চলে গিয়েচে, তাকে সেখান থেকে ডেকেনিয়ে গেলুম বেলেডাঙার বাঁকের মাথায়। কতক্ষণ সেখানে অর্ধচন্দ্রাকৃতি মরগাঙের ওপারেরচর, খেজুর গাছ, বাঁশবন, জলি ধানের ক্ষেতের দিকে চেয়ে বসে পচা রায়ের সঙ্গে গল্প করি।বেলা যখন যায় যায়, তখন উঠে আইনদ্দির বাড়িতে এসে দেখি সে বাড়ি নেই। বেলেডাঙারপুলের ওপর কতক্ষণ বসে রইলাম শ্যামল সবুজের বন্যার দিকে চেয়ে। কি দিগন্ত-প্রসারী ধানক্ষেত, বট-অশ্বত্থের বীথি, নতিডাঙার গ্রামপ্রান্তর বাঁশ-বনের সারি, কি বিচিত্র মেঘস্তূপ নীলআকাশে! সন্ধ্যা প্রায় যখন হয়ে এল, তারপরে আমরা ওখান থেকে উঠে আসি। পচা

একটাকলার বাগান থেকে কলা সংগ্রহ করলে। আমি বনসিমতলার ঘাটে এসে নাইলুম। আকাশেঅনেক নক্ষত্র উঠেচে, বনের মধ্যে জোনাকির ঝাঁক জ্বলচে, অন্যদিনের চেয়ে আজ বেলা গিয়েচে। সন্ধ্যায় খুকুদের বাড়ি বসে অনেক রকম গল্প করলুম, তারপর উঠে গেলুমপাঁচুকাকাদের বাড়ি, ওদের বাড়ি কাল বিয়ে, অনেক কুটুম্ব-কুটুম্বিনী এসেচে—পাঁচুকাকার ভাইফণীকাকা এসেছেন জলপাইগুড়ি থেকে একবার সব দেখাশুনো করে সামাজিকতা রক্ষা করতে যাওয়া দরকার।

আজ চলে যাব। বেলা তিনটের সময় আমার ঘরে ঘুম থেকে উঠলুম—তারপর বেড়াতেগেলুম নদীর ধারে মাঠে। বেজায় গুমোট গরম, আকাশে সাদা মেঘ। একটু পরে পাঁচুকাকার ছেলেশুঁটো বিয়ে করে নববধূ নিয়ে গ্রামে ঢুকল। সানাই বাজচে, ঢোল-বাজনার শব্দ শুনে কল্যাণী, খুড়িমা, খুকুএরা সেজেগুজে ছুটল। আমতলায় দেখি সব চলেচে। খুকুএকবার চেয়ে দেখলেআমার দিকে। ওই ঘোড়ার গাড়িতেই আমি চলে এলুম বনগাঁ স্টেশনে। সারা পথ ট্রেনেআকাশের দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল কি অপূর্ব সুন্দর গ্রীষ্মের ছুটিই আজ শেষ হয়ে গেল।

কলকাতায় এসে ক'দিন বড় ব্যস্ত ছিলুম। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে বেড়াচ্চি—সাঁতরাগাছি ও রাজপুরেও গিয়েছিলুম। পরশু হঠাৎ এলাহাবাদ থেকে উষা এসেছিল—দেখা করতে এসেছিল মেসে। আমি তখন সবে চুল কাটতে বসেচি। তাড়াতাড়ি যেতেও পারিনে বসতে বলে যত শীঘ্র হয় চুল ছেঁটে দেখা করে এলুম। ঊষার নির্দেশমতো বালিগঞ্জে গেলুমদুপুরের পর। অনেকগুলি মহিলা ছিলেন সেখানে— সাহিত্যিক আলোচনা হল অনেকক্ষণধরে—সকাল থেকে বার হয়ে বিকেলের দিকে ইন্দিরা দেবীর বাড়ি গেলুম রেডিওর বক্তৃতারনকলটিকে আনতে। কাল রাত্রে রাজপুরে বেগুন, আমি ও ফুলির দুই ছেলে এক মশারীর মধ্যেশুয়ে প্রাণ যায় আর কি—গরমে আর মশায়! সারারাত চোখের পাতা বোজেনি।

এরই মধ্যে একদিন আয়েলীর সঙ্গে দেখা হল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে গত মঙ্গলবারে।আমি আয়েলীর কথা বলছি নীরদবাবুদের বাড়ি যে ওই একটি মেয়ে, যার সঙ্গে আর দেখা হবে —কারণ ওর মা ওকে নিয়ে সিঙ্গাপুরে বাপের বাড়ি চলে গিয়েচে। হঠাৎ সেদিন প্রবাসীঅফিসে গিয়েচি, সেখানে দেখা ডা. প্রমথ রায়ের সঙ্গে। অনেকদিন পরে দেখা, কেউ কাউকে ছাড়তে পারিনে। অনেকক্ষণ ওখান থেকে বার হয়ে একটা চায়ের দোকানে বসে গল্প হলপুরোনো দিনের—যখন 'শনিবারের চিঠি'র আপিস ছিল মানিকতলায়। প্রমথ এখন বেনারসহিন্দু ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক—ভারী বন্ধুবৎসল, ছেড়ে দিতে আর মন চায় না।

প্রমথ এসে আমায় উঠিয়ে দিয়ে গেল হ্যারিসন রোডের মোড় পর্যন্ত। আমিকর্পোরেশনের কয়েকজন কাউন্সিলারের লিস্ট দিতে গেলুম নীরদবাবুদের বাড়ি—সেখানেড্রয়িংরুমে ঢুকবার আগেই মেমসাহেবের গলা শুনে আমি অবাক হয়ে ভাবছি কোন মেমসাহেবএখানে এল! ঢুকেই দেখি আয়েলী ও মিসেস অ্যান্টনি বসে। আয়েলীও আমায় দেখে খুব খুশিহল—ওরা সিঙ্গাপুর থেকে দু'একদিন হল এসেচে শুনলুম। এখন কলকাতাতেই থাকবে। ভারীআনন্দ পেলাম ওকে দেখে—আয়েলী বড় ভাল মেয়ে। ও এখানে পড়ত লা মার্টিনিয়ারে। এদিনপড়া বন্ধ ছিল, সেইজন্যেই ওর মা মিসেস্ এন্টনি ওকে আর ওর ছোট ভাই পিটিকে এখানেএনেচে।

কাল বালিগঞ্জে এক ভদ্রলোকের ওখানে রাত্রে ছিল নিমন্ত্রণ। মিসেস দে বলে যেমহিলাটির সঙ্গে ঊষার ওখানে সেদিন দেখা হয়েছিল—তিনি চিঠি লিখেছিলেন তাঁর স্বামীর সঙ্গে যাতে আমার আলাপ হয় তার খুব ইচ্ছা। ভদ্রলোকটির নাম কে সি দে—কিরণচন্দ্র দে। কাল সন্ধ্যাবেলা তাদের বাড়ি অনেকক্ষণ কাটানো গেল। বড় অমায়িক লোক স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই।ভূরিভোজন হল অবিশ্যি, আইসক্রিম পর্যন্ত বাদ গেল না। মনীষা সেনগুপ্তা বলে একটি মেয়ে উপস্থিত ছিল, মেয়েটি ছেলেমানুষ। এবার বি-এ অনার্সে ইংরিজিতে প্রথম হয়েচে, কিন্তু এতলাজুক ও মুখচোরা—রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে বললুম, সবাই পড়চে—মেয়েটি লজ্জায় একেবারে দুমড়ে পড়ল—কিছুতেই পড়বে না। তারপর মিসেস্ দে অনেক করে একটা ছোট কবিতা পড়ালেন।

বেশ কাটল সন্ধ্যাটি, সাহিত্যিক আলোচনাতে, গল্পে, আবৃত্তিতে, খাওয়া-দাওয়ায়। অনেকরাত্রে বাড়ি ফিরি।

পরশু ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে হেস্টিংসে গিয়েছিলুম। কলকাতার মধ্যে অমন চমৎকার ফাঁকাজায়গা বেশি দেখিনি। ওর সন্ধান পেয়ে মনে আনন্দ হল। নীল আকাশ, ফাঁকা সবুজ মাঠ, দূরেভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মার্বেল চূড়াটা দেখা যাচ্চে নীল আকাশের পটভূমিতে, যেন আকাশেভাসচে বলে মনে হচ্চে। কূলে কূলে ভরা গঙ্গা, সবুজ ঘাসে ঢাকা তীরগুলি জল ছুঁয়েচে। জলেরধারে নাটা ঝোপ, কালকাসুন্দা ও বনবেড়ালী—ঠিক যেন পাড়াগাঁ। অথচ জলের ধারে ধারে বড়ছায়াতরু, সেখানে বেঞ্চি ফেলা রয়েচে—সত্যিই বড় ভালো জায়গা—বেশ নির্জন—খুবলোকজন বা মোটরগাড়ির ভিড় নেই।

বাড়ি এসেই সেদিন ঊষার পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। সুরেশবাবু বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বড় যদিও, কিন্তু ভাগলপুরে থাকবার সময়ে মিশতেন ঠিকযেন সমবয়সীর মতো। অমরবাবুর বাড়ির আড্ডাতে দিনের পর দিন আমাদের কত চা-পানের মজলিশ বসত। সুরেশবাবু একজন ভাল শিকারীও ছিলেন। শিকারের গল্প করে জমিয়ে রেখে দিতেন। একবার বাবারিঘাটে আমি স্টিমার থেকে নামচি—আজিমগঞ্জ থেকে আসচিঅনেককাল পরে ভাগলপুরে—সেই স্টিমারে সুরেশবাবুও আসছেন—উনি তখন বনেলি রাজস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার—আমায় দেখে বললেন—এই যে ম্যানেজারবাবু, কোথা থেকেআসচেন? আর কি সে হাসি, কি সে মনখোলা বন্ধুত্বের স্পর্শ!

পরশু বাড়ি ফিরে ঊষার চিঠিতে জানলুম সুরেশবাবু আর ইহলোকে নেই। উষারাযেদিন এখান থেকে গেল মজঃফরপুরে, তার পরদিনই সুরেশবাবু মারা গিয়েছেন বলে ঊষালিখেচে। অত্যন্ত দুঃখ হয়েচে চিঠিখানা পড়ে। ভগবান তার আত্মার সদ্‌গতি বিধান করুন।

কাল সায়েন্স কলেজের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে আচার্য পি. সি. রায়ের সঙ্গে দেখা করতেগেলুম অনেককাল পরে। বয়স হয়েচে, কোন্ দিন মারা যাবেন—আর অনেকদিন যাওয়াহয়নি—এইসব ভেবেই দেখা করতে গেলাম। ভারী আনন্দ পেলাম বসে কথা কয়ে ওঁর সঙ্গে।বললুম—মাঠে যান এখনো? বল্লেন—ও বাবা, না গেলে কি বাঁচি?..বল্লুম—ফিলজফার আসেন? বল্লেন—রোজ আসেন, তোমার কথা যে সেদিন বলছিলেন, তুমি আর যাও না কেন? তারপর আলামোহন দাস বলে একজন বড় ব্যবসায়ীর গল্প করতে লাগলেন—তিনি নাকি প্রথম জীবনেমুড়ি-মুড়কি বিক্রি করতেন। এখন ক্রোড়পতি লোক। চার-পাঁচটা মিল আছে।

বললেন—গ্রিন বোট করেচি, শ্রীপুরের ঘাটে বাঁধা রয়েচে। একবার তোদের বারাকপুরেযাব গ্রিন বোটে করে, ইছামতী দিয়ে।

বললুম—বেশ, আসুন না।

অনেকদিন পরে বুড়োর সঙ্গে গল্প করে বড় আনন্দ পেলুম। বুড়ো কবে মরে যাবে, একটা অনুতাপ থেকে যাবে মনে।

গত শুক্রবারে অর্থাৎ ২৯শে জুলাই গ্রীষ্মের ছুটির পরে প্রথম বাড়ি গিয়েছিলুম। ভারীভাল লেগেচে এবার। খুকুদের দাওয়ায় বসে ক'দিনই সন্ধ্যার সময় কত গল্পগুজব করি। ওরা একদিন খাওয়ালো। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে খুকুরান্নাঘর থেকে জিনিসপত্র নিয়ে এল। আমি গেলেই শতরঞ্জিখানা ঘরের মধ্যে থেকে এনে বড় করে পেতে দেবে—আর ওর মা বলবে, ছোট করে পাত, ছোট করে পাত! কালীঘাট বেড়াতে গেলুম পচা রায়ের সঙ্গে। রবিবার হাটে গেলুম। বকুলতলা দিয়ে হাট করে ফিরি।খুকুদাঁড়িয়ে আছে, আমি বলচি, খুড়িমা, কাউকে তোদেখতে পাচ্চি নে? ও বলচে, কেন হাতির মতো দাঁড়িয়ে আছি, দেখতে পাচ্ছেন না? তাড়াতেপারলে তো সব বাঁচেন!

আমি তারপর নদীর জলের একেবারে ধারে গিয়ে বসলুম। লম্বা শীষ ও ফুল ফুটেচে, এপারে ঘন সবুজ গাছপালা, নদীর জল আবর্ত করে ঘুরছে—বেশ লাগচে। দিলীপের সঙ্গে সেদিনকার সেই তর্ক মনে পড়ল। থিয়েটার রোডে ওর বাড়ি বসে তর্ক করেছিলুম ওর বইনিয়ে। একজন চাষা আজ হাট থেকে ফিরবার পথে গল্প করছিল—লতা যদি বেশি হয়েচে, তবে আর ঝিঙে তাতে ফলবে না। তার সেই গল্পটা মনে করচি। এই গ্রামের সত্যিকারজীবন—মাটির সঙ্গে সব সময়েই এদের যোগ। মাটির সঙ্গে যোগ হারালে, গাছপালার সঙ্গে যোগ হারালে এরা বাঁচবে না।

বড় বড় বাঁশঝাড়, কত কি বৃক্ষলতা, ষাট বছর পরে যখন আমি থাকব না, তখনো ওরা থাকবে, হয়তো খুকুও অতি বৃদ্ধা অবস্থায় থাকতে পারে। তখনো ইছামতীতে এমনি ঘোলার ঢল নামবে, বনসিমতলার ঘাটে নতুন মেয়েছেলে কত ফুল নিতে আসবে, হাসবে, খেলবে, জল ছুঁড়বে—যেমন একদিন আমরাও করেছিলুম।

খুকুদের হাসাতুম 'ভাল কি মন্দ? মন্দ হইলে তো গন্ধ হইত!'এই কথাটা পূর্ববঙ্গের সুরেবলে। এবার গিয়ে মনে হল এমন বর্ষা-সজল দিনের গভীর আনন্দ কোনো বছর এর আগে পাইনি। এ যেন একটা স্বপ্নের মতো কেটে গেল—এত সুন্দর সকাল-সন্ধ্যা !

ফাল্গুন মাসে যখন শালমঞ্জরী নিয়ে গিয়েছিলুম, বা যেবার গিয়ে দেখি উড়েরা তত্ত্ব বয়েনিয়ে গিয়ে ভাল খাচ্ছে, সেসব দিনের ঘটনা তো এখন পুরোনো মনে হয় না– Fresh, ever young! দিনগুলির মধ্যে তাজা আনন্দ তো থাকা চাই-ই, আনন্দের নব নব সৃষ্টি স্রষ্টার মনেরপ্রাণশক্তিরই পরিচয় দেয়।

এই সব দিনের সঙ্গে দশ-বিশ বছর আগেকার পুরোনো, ছাতা-পড়া, ভঙ্গুর দিনগুলিরযদি প্রতিযোগিতা হয়, তবে স্মৃতির ও আশার দরবারে সম্মান লাভ করতে পারে না, তা হেরেযেতে বাধ্য। সেইজন্যেই সেই সব অসহায়, নিরপরাধ, নিরুপায় দিনগুলোর জন্যে মমতাআসে।

নিজের ঘরে বারাকপুরে সেদিন শুয়েচি শুক্রবার রাত্রে, শুনচি ন'দিদিদের ঘরে খুব গল্প ও হাসির শব্দ। বোধহয় খুকু কোনো গল্প করচে ওদের কাছে। এই ঘরে শুয়ে শুয়ে ১৯২৪সাল থেকেআজ ১৯৩৮ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত এই গল্প তো শুনে আসচি- এ একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা। তাই কলকাতা থেকে হঠাৎ এসে একরাত্রে বারাকপুরের খড়ের ঘরে নির্জনরাত্রে শুয়ে সে অভিজ্ঞতাটি হঠাৎ হওয়াতে খানিকটা এমন অবান্তর বলে মনে হল যে,অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চৈতন্যটাকে এর মাটিতেনামিয়ে এনে তবে সে অভিজ্ঞতাটুকু গ্রহণ করতে পারলুম।

তারপর আর একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা।

অনেক রাত্রে চৌকিদার হাঁকতে বেরিয়ে আমার ঘরের মধ্যে লণ্ঠন বাড়িয়ে দেখচে। আমিবল্লুম...কিরে, ভাল আছিস? চৌকিদার বল্লে—হাঁ বাবু, আছি। কবে আলেন বাবু?

তারপর সে নিজের নিমোনিয়া হয়েছিল, সে গল্প বলতে শুরু করলে। আমার তখন সত্যই মনে হল আমি এই গ্রামেরই লোক—থাকি প্রবাসে কলকাতায়, আসলে আমার বাড়িএখানেই। সে যে কি একটা অদ্ভুত অনুভূতি! গ্রামের মাটির সঙ্গে এক মুহূর্তে সেই গভীর রাত্রে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়ে গেল সুরেন চৌকিদারের একটা কথায়—বাবু বাড়ি আলেনকবে?

রবিবার (১৫ই শ্রাবণ) হাট করতে গিয়ে গোপালনগরের দোকানে দোকানে বেড়িয়েও ঠিক ওই রকম অনুভূতি হল। একজন লোকে তো বল্লে—আপনি কি সেই থেকেই বাড়িআছেন ?

বর্ষা-সজল প্রাতে সোমবারে হেঁটে বনগাঁ এসেও কি তৃপ্তি! ওদের উঠানেখুকুদাঁড়িয়ে রইল। যখন আসি দরজার কাছেও দাঁড়াল একবার।

বনগাঁয়ে খয়রামারির মাঠে যেখানে সেই মটরলতার ঝোপ, সেখানে এ বছর প্রথমবেড়াতে গেলুম একদিন। ছোট এড়াঞ্চির জঙ্গল বড্ড বেশি বেড়েচে।

সত্যিই, অপূর্ব আনন্দ পেয়েছিলুম দেশে গিয়ে এই বর্ষামুখর শ্রাবণ দিনে। শুক্রবার দিনছিল ১৩ই শ্রাবণ, আমার ছেলেবেলার ওই দিনটি আমার কাছে ছিল একটা বড় উৎসবের দিন।মনসার ভাসান বসত ওই দিনটিতে, আর তিন-চার দিন ধরে নাচ-গান চলত জেলেপাড়ায়পুরোনো মনসাতলায়। বন্য মটরলতার সবুজ ফলের থোলো যখন দুলত ঝোপে ঝোপে এই শ্রাবণমাসে, তখনকার দিনগুলির সঙ্গে মনসার ভাসানের সুরেন জেলের নাচ আর গান জড়িয়ে রয়েচে আমার মনে—কতকাল পরে আবার সেই তেরই শ্রাবণ, সেই মনসার ভাসানের উৎসবের সময়।বাড়ি গিয়েচি, ঝোপে ঝোপে তেমনি দুলচে মটরলতার কচি সবুজ ফল, মেয়েরা তেমনি নতুন শাড়ি পরে নাগপঞ্চমীর উৎসবে যোগ দিতে চলেচে নৈবিদ্যির রেকাবি হাতে—কেমন করে বাল্যের সেই স্বপ্নজগতে হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলুম অতর্কিতে! কিন্তু স্বপ্ন সেটা নয়, কারণখুকুছিল। আর হলইবা স্বপ্ন, জীবনের কতখানি স্বপ্ন দিয়ে গড়া তা কি সবাই জানে?

বাংলাদেশের মর্মকাহিনী লুকোনো আছে এই সব নিভৃত পল্লী-প্রান্তের আম-বকুলবাঁশবনের আড়ালে, যিনি লেখক হবেন, যিনি লেখনী ধারণ করবেন বাংলার কথা শোনাবারজন্যে, তাঁকে আসতে হবে এখানে, মিশতে হবে এদের সঙ্গে, যোগ দিতে হবে এদের এই সবশান্ত উত্তেজনাহীন, তুচ্ছ, অনাড়ম্বর, অখ্যাত গ্রাম্য জীবনের উৎসবে, এদের বুঝতে হবে, ভালবাসতে হবে। খ্যাতি-যশের জন্যে বা টাকার জন্যে কেউ লেখে না জানি— Jules Lemaitre-এর সেই কথা—The end is nothing, the road is all—প্রত্যেক আর্টিস্টের মনে রাখা উচিত।

হাঁ, পচা রায়ের সঙ্গে শনিবারের বিকেলে (১৪ই শ্রাবণ) কাঁচিকাটার পুলে বেড়াতে গিয়েছিলুম—কি অজস্র সোঁদালি ফুল কুঠীর মাঠের প্রায় প্রত্যেক গাছে! আমি তো অবাক, শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি সোঁদালি ফুল জীবনে তো কখনো দেখিনি।

ভালবাসা জিনিসটা কখনো কখনো কারো গায়ে পড়ে করার মতো ভুল আর কিছু নেই।কারণ যাকে তুমি ভালবাসচ অত করে, সে তোমার ওই ভালবাসাকে 'ভালবাসা' বলে গ্রহণযদি করতে না পারে, তাহলে তোমার ভালবাসার ফল কি? ভালবাসা pity নয়, করুণা নয়, charity নয়, সহানুভূতি নয়, এমন কি বন্ধুত্বও নয়—ভালবাসা ভালবাসা। এখন সেই জিনিসের সূক্ষ্ম মহিমা ও রসটুকু না বুঝে যে নষ্ট করে ফেলে অযাচিত ভাবে দিয়ে, অপাত্রে দিয়ে—তার চেয়ে মূর্খ আর কে ?

যারা বলে "এ তো স্বার্থপর ভালবাসা হল"—শ্রীধর কথকের সেই গান বাবা গাইতেন—"ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে" ইত্যাদি—এ সব কথার কোনো মানে হয় না। ভালবাসার নিয়মই এই, না পেলে দেওয়া যায় না, বা না দিলে পাওয়াও যায় না। এখানে এই কথায় খুব গভীর অর্থ আছে। ভালবাসা না পেয়ে যে ভালবাসা দেওয়া—যে পেলে তার কাছে তা আর ভালবাসা রইল না, সে তার উপযুক্ত মূল্য দেবে না—সে গভীর, সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়, অপরূপ আনন্দ পাবে না ভালবাসা থেকে, পাবে একটা সাময়িক উত্তেজনা বা egoistic satisfaction, তাতে ভালবাসার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হল। আর না দিলে নেওয়াও যাবে না—আমি যাকেভালবাসিনে, তার কাছে যদি আমি ভালবাসা পাই তাকে আমি ঘাড়ে-পড়া-বালাই বলে ভাবি।তার উপযুক্ত মূল্য ও সম্মান আমি দিতে কখনোই পারব না। যে যত গভীরভাবে আমায়ভালবাসবে, আমার দিকে attention দেবে—ততই আমি ভাবব আমার দিকে ঝুঁকচে, বিরক্তহয়ে উঠব। সে প্রাণপণে ভালবাসচে, অথচ যাকে ভালবাসচে, সে এ থেকে কিছুই আনন্দ পাচ্চেনা—এর চেয়ে বিড়ম্বনা আর কি আছে? ভালবাসা পাওয়ায় যে সত্যিকার অপূর্ব অনুভূতি যা এধরনের পাওয়ার মধ্যে থাকে না—সুতরাং এ রকম ভালবাসা এ ক্ষেত্রে না দেখানোই ভাল।

ভালবাসা জিনিসটা দেওয়া-নেওয়ার, আমি যে অর্থে ভালবাসা ব্যবহার করচি সে অর্থে।যারা ভালবাসা কি কখনো জানে না, সত্যিকার ভালবাসা কখনো পায়নি তারা নিঃস্বার্থইত্যাদি বাজে কথা ব্যবহার করে। ভালবাসা মনের এক অদ্ভুত রসায়ন—উভয় মনের সমানযোগ ভিন্ন এ দিব্য, অপূর্ব, অতীন্দ্রিয়, দুর্লভ রসায়ন তৈরি হয় না। যে হতভাগ্য এ আস্বাদ করেনি—সে শাস্ত্র থেকে, দর্শন থেকে, পাঁজিপুঁথি থেকে বড় বড় নিঃস্বার্থতার বুলি আওড়ায় গিয়ে—কিন্তু যে জীবনে এর আস্বাদ পেয়েচে সে জানে, ওসব লম্বা লম্বা কথা কতঅন্তঃসারশূন্য ও ফাঁকা, অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অর্থহীন।

ভগবান এইজন্যই বোধহয় মানুষকে ধরা দেন না—অনেক সাধনা যে করে সে তার ধরা দেওয়ার মূল্য দেয়—সহজভাবে ভগবান আমাদের গায়ে এসে ঢলে পড়লে, তার চেয়েমহকুমার তুলসী দারোগার বন্ধুত্বের মূল্য আমাদের কাছে বেশি দাঁড়াত।

ওপরের কথা যে বলা হল এটা কিন্তু ভালবাসার অবস্থার প্রথম দিকের কথা নয়। অত্যন্তপ্রাইমারি স্টেজে আলাদা কথা। সেখানে অনেক সময় ভালবাসা দিয়ে ঈপ্সিত বস্তুকে পাবারচেষ্টা করতে হয়—সে অন্য কথা। যখন কেউ কাউকে ভাল জানে না, সে অবস্থায় কেউ কাউকে খুব খারাপ বা গায়ে-পড়াও ভাবে না—তখন দু'জনেই দুজনের কাছে খানিকটা রহস্যমণ্ডিত থাকে কিনা—কেউ কাউকে খুব খারাপ ভাবতে পারে না। কিন্তু খানিকটা ভালবাসার পরে যখনদেখবে যে সে তোমার ভালবাসা নিতে পারচে না, নানা রকম চেষ্টা করেও যখন তার মধ্যেভালবাসার প্রেরণা দিতে পারবে না, তখন তার ঘাড়ে পড়ে ভালবাসা দিতে যেও না—তাতেসে বিরক্ত হয়ে উঠবে, তোমাকে ঘৃণা করবে, তোমার ভালবাসার মূল্য সে দিতে পারবে নাবরং উল্টোই হবে—তখন তাকে ছেড়ে দিয়ো।

[এই ডায়েরিটা লিখলাম কেন? কোনো ব্যক্তিগত কারণ আছে। কিন্তু সেটা আজ আরলিখলুম না।]

বিষ্ণুপুরে গিয়েছিলুম অনুকূলবাবুর নিমন্ত্রণে। কি অমায়িক ভদ্রলোক! কি আতিথেয়তাও সৌজন্য! সত্যি, অমন ব্যবহার, অমনি একটি প্রীতিশুভ্র পারিবারিকতার আবহাওয়া কতকাল ভোগ করিনি!

বিষ্ণুপুরে জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন মন্দিরগুলি আমার মনে এক অদ্ভুত ভাব জাগিয়েচে। প্রসিদ্ধ দলমাদল কামান এখন লালবাঁধ বলে প্রকাণ্ড দীঘির একপাশে বসানো আছে। অনুকূলবাবুরকাছারির জনৈক পেয়াদা আমায় নিয়ে গিয়ে দেখালে। জোড়াবাংলা বলে একটি মন্দিরেরপাথরবাঁধানো চাতালে আমি ও অনুকূলবাবু বসে রইলুম সূর্যাস্তের সময়ে। বড় ভাল লাগল।

বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার মাটি রাঙা, সব শাল ও কেঁদ বন-বড় চমৎকার দৃশ্য, কাঁকুড়ে মাটি, কাদা নেই—খটখটে শুক্‌নো।

দেখে ফিরবার সময়ে দূরপ্রসারী সবুজ মাঠের প্রান্তে দিকচক্রবালের শোভায় বৈকালের দিকে কত কথাই মনে এল। দূরে আমার গ্রাম—আজ রবিবার, এতক্ষণে সকলে হাটে যাচ্চে, যুগল ময়রার দোকানের সামনে ফণীকাকা দাঁড়িয়ে আছে, খাজনা আদায় করচে—এই ছবিইকেবল যেন মনের চোখে ভাসছিল।

বন্যার জল অতি ভীষণভাবে আমাদের গ্রামের চারিদিক ঘিরেচে। আজই সকালে চালকীথেকে এখানে এসেচি। প্রথমে মধু পাগলা (আদাড়ি জেলেনীর নাতি) মাছ ধরচে পাকা রাস্তার ধারে, সে পথ দেখিয়ে দিলে। সাজিতলার বাঁকে দাঁড়িয়ে নদীর দৃশ্য যেন পদ্মা কি সমুদ্রের মতো। থৈ থৈ করচে জলরাশি। আমাদের পাড়ায় রামপদর ঘরে বন্যাপীড়িত মানুষেরা আশ্রয়নিয়েচে। ন'দিদি তেল দিলে—আমাদের বাড়ির পিছনে, শ্যামাচরণদাদাদের চারা গাবতলায় স্নানকরলাম। বরোজপোতার ডোবা দিয়ে তরতর করে স্রোতচলেচে। ইন্দু রায়ের সঙ্গে জেলেরনৌকো

করে খুকুদের চারা আমবাগান দিয়ে গেলুম বেলেডাঙ্গায় আইনদ্দির বাড়ি। সেখানেএকটু গল্প করে এপারে এলুম। বট-অশ্বত্থের শ্যামবীথির কি শোভা! সর্বত্র জল, বটতলায়সাঁতার-জল, কিন্তু অপূর্ব শোভা হয়েচে বটে!

চড়কতলার বাগানে নৌকো চড়ে গোঁসাইবাড়ির রাস্তা দিয়ে পাকা রাস্তায় এসে নামলুম।হেঁটে সাড়ে তিনটার সময় বনগাঁ, সন্ধ্যা পর্যন্ত খুকুদের বাসায় বসে গল্প করি।

পূর্ণিমার রাত্রে ব্রজেন বাঁড়ুয্যে, সজনী, আমি, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, দেবপ্রসাদ ঘোষ এবংসুবল একসঙ্গে বম্বে মেলে খড়গপুর এলুম। হাওড়া স্টেশনে প্রথমেই হাসির ব্যাপার। একজন উঠে বল্লে, আপনারা কে লন্ডন যাবেন? আমরা তো হেসে বাঁচিনে। যাচ্চি মেদিনীপুর, বলে কে।যাবে লন্ডনে! সজনী তো হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি!

খড়গপুরে নেমে মোটরে মেদিনীপুর গেলাম কসাই নদী পার হয়ে। S.D.O. ধীরেনবাবুএসেছিল আমাদের নামিয়ে নিতে। স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন সভাপতি, তিনি ও অমূল্যবিদ্যাভূষণ এক গাড়িতে গেলেন—আমি, ব্রজেনদা, তারাশঙ্কর এক গাড়িতে।গিয়েই জ্ঞান চৌধুরী উকিলের বাড়ি ডিনারের নিমন্ত্রণ। প্রায় আশি জন লোক নিমন্ত্রিত। ডিনারের পরে ধীরেনবাবুর বাড়িতে আমরা অতিথি হয়ে রইলুম।

সকালে সভা হল। রাধাকৃষ্ণণ বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করলেন, আমি সে সময়টা একটা তেঁতুল গাছতলার ছায়ায় বসেছিলুম। তারপর দেবপ্রসাদবাবু ও চৈতন্যদেবেরসঙ্গে নাড়াজোল রাজার গোপপ্রাসাদ দেখে পুরোনোগোপপ্রাসাদে একটা প্রাচীন বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখতে গেলাম। বেশ সুন্দর জায়গা এই গোপ, খুব উঁচু মালভূমির মতো স্থান, সেগুন ও কেলিকদম্বের বন, বেশ ভাল লাগল। ওখান থেকে কাঁসাই নদীর এনিকাট দেখতেগিয়ে আমাদের ফটো নেওয়া হল।

ধীরেনবাবুর বাড়ি দুপুরে ব্রজেনবাবু, সজনী সবারই নিমন্ত্রণ। বৈকালে আবারমিটিং-তারপর বার হয়ে ঝুনু দাসগুপ্ত বলে একটি মেয়ের গান শুনতে যাওয়া গেল ওদেরবাড়িতে। ঝুনুর বাবা এখানকার D.S.P.

রাত্রি দুটোর ট্রেনে স্টেশনে এসে ট্রেন ধরলুম, ধীরেনবাবু ট্রেনে তুলে দিয়ে গেলেন।

মহালয়ার আগের সোমবারে রেজিস্ট্রি আপিসে বারাকপুরের বাড়িটা রেজেস্ট্রি করেনিলাম। রামপদ ও পুঁটিদিদি এসেছিল। মহালয়ার দিন খুকু ও খুড়িমাকে কলকাতায় আনলুম।অন্নপূর্ণার ঘাটে নেয়ে, মদনমোহন ঠাকুর দেখে, Zoo, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও রূপবাণী দেখে রাত দশটার গাড়িতে ওদের নিয়ে ফিরলুম। সেই শনিবার আবার বাড়ি গেলুম খুকুদের বাসায় রাত্রে খেয়ে সকালে চালকী। ইন্দু এল। তার সঙ্গে বারাকপুর যাই। এখনো বন্যার জল থৈথৈ করচে। সমুদ্রের মতো। এমন দৃশ্য কখনো দেখিনি।

একমাসে অনেক ঘটনা ঘটল। আমি গালুডি গেলুম পুজোর ছুটিতে, সেখান থেকে জ্বর নিয়ে ফিরলুম। বারাকপুর গিয়ে আট-নয় দিন ছিলুম। বড় নির্জন, বিশেষ করে আমাদেরপাড়াটা। সেখান থেকে রোজ রোজ মাছ ধরা দেখতে যেতুম নদীর ধারে। ইন্দু মাছ ধরত—ওরএকটা ভাঁড় আছে, সেটাতে মাছ পড়বেই পড়বে। গুটকে থাকত। মাছ খুব সস্তা হয়েছিল।সম্প্রতি কালীপুজোর আগে কলকাতায় এসেচি।

চূড়ামণি যোগ গেল গত সপ্তাহে। রাত তিনটের সময় উঠে জগন্নাথ ঘাটে ও তারাসুন্দরীপার্কে গিয়ে ভলান্টিয়ারি করলুম, কত ছেলেমেয়ে হারিয়ে যেতে লাগল, তাদের যথাস্থানেপাঠালুম। আমাদের স্কুলের রামচন্দ্র দত্ত তার সেবা-সমিতির সেক্রেটারি, সে-ই আমায় যেতে বলেছিল।

সকালে ফিরে বনগাঁ গেলুম। খুকুদের বাসায় গিয়ে দেখি খুড়িমা গঙ্গাস্নানেগিয়েচেন—খুকুর সঙ্গে গল্পগুজব করলুম প্রায় সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত, খাওয়া-দাওয়া করলুমওখানে।

সম্প্রতি নুটুচাকুরি পেয়ে কাল রাত্রে বেলডাঙ্গা চলে গেল। জাঙ্গিপাড়ার বৃন্দাবনবাবুঅনেক দিন পরে এসেছিলেন—কাল তার সঙ্গে বসে অনেক কথা হয়, অনেক কাজ করা গেলওয়েলিংটন স্কোয়ারে বসে।

ঈদের ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলুম, পরশু এসেচি। প্রথমেখুকুদের নতুন বাড়িতে গিয়ে দেখি ওরা সেই দিনই এসেচে। ও ঘর ঝাঁট দিতে এল আমার ঘরে—কত গল্প হল। রাত্রেঅন্নদাশঙ্করের স্ত্রী লীলার গল্প ও চিরপ্রভা সেনের গল্প করলুম। ভোরে উঠে চাল্‌কী। সেখানথেকে বারাকপুর ইন্দুদের বাড়ি। হরিপদদাদা সেখানে উপস্থিত, সে কাঠের ব্যবসা করচে। ইন্দুগল্প-গুজব করলে, সে কচুগাছ পুঁতছিল। আমার বাড়ি গিয়ে চাবি খুলে জিনিসপত্র রেখে স্নানকরতে গেলুম। অনেকদিন পরে কুঠীর মাঠে ভূষণের ক্ষেতে বেড়াতে গিয়ে ভারী আনন্দ হল।তবে বন্যার জলে ছোট এড়াঞ্চির গাছ সব মরে গিয়েচে দেখলুম। স্নান করে বাড়ি গিয়ে রোয়াকে বসে লিখলুম হোটেলের গল্পটা। গুটকে এল—সে ভারি খুশি আমি যাওয়াতে। তাকে নিয়ে বিকেলে হাটে যাই। বিজনের ডাক্তারখানায় গল্প করলুম, নুটুর চাকরির কথা বলে। তারপর মাছ কিনে সন্ধ্যার অন্ধকারে চাল্‌কী এলুম। পথে লণ্ঠনটা ধরিয়ে নিলুম একজন লোককে দিয়ে। বনের মধ্যে সাঁইকাটাতে কতক্ষণ বসে। চাল্‌কী এসে তারাপদর সঙ্গেগল্প—দিদির বাড়ি গিয়ে কতক্ষণ কথা বলি। সকালে উঠে লিখি। দুপুরের পরে বনগাঁয়খুকুদের বাসায় এলুম। খুকু একটু পরে এসে বল্লে—একেবারে গা ধুয়ে এলুম—আপনারপাল্লায় পড়লে আর তো যেতে পারব না। তারপর কমলের চিঠি, সুপ্রভার কবিতা পড়লে। বেলা পড়ে এল। বল্লে—চলুন, ছাদে যাই, দেখিয়ে আনি। ছাদে গিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তাবললুম। মেরি এন্টয়নেট ছবির গল্প করি। নিস্তব্ধ বৈকাল, ছায়া পড়ে আসচে খয়রামারিরদিকে। বেশ লাগল। চোদ্দো বছর বয়সে কি দেখেছিল সে সম্বন্ধে কথা। তারপর চা খেয়ে ওখান থেকে বার হয়ে লিচুতলায় এলুম। আগের দিন যখন রাত্রে থাকি, বেরুবার সময়বল্লে—সকাল করে আসবেন, দেরি করবেন না। লিচুতলায় বিশ্বনাথের সঙ্গে সাহিত্য সম্মেলন সম্বন্ধে আলোচনা, রাত আটটার ট্রেনে কলকাতা।

আজ নীরদবাবুর বাড়িতে সোমনাথবাবুর সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে নানা কথা হল। তারপর পার্ক স্ট্রীট দিয়ে চৌরঙ্গী পর্যন্ত হেঁটে এলুম। বেশ লাগছিল শহরের এই জনস্রোত। মেট্রোরসামনে খুব ভিড়। Marie Antoinette ছবি দেখানো হচ্ছে, নর্মাশিয়ারার নেমেচে প্রধান ভূমিকায়। রাস্তায় রাস্তায় সাধনা বোস,কাননবালার ছবিওয়ালা বিজ্ঞাপন।

পঞ্চাশ বছর পরের কলকাতা কল্পনা করলুম। কেউ নেই এরা। কেউ নেই আমরা। সাধনা বোসপ্রাচীনা বৃদ্ধা হয়ে হয়তো বেঁচে আছে। তখন নতুন একদল উঠেচে, তাদের নাম কেউজানে না। জীবনের চিত্রনাট্যপটে কত অদ্ভুত পরিবর্তন। গিরিশ ঘোষের স্কুলের প্রবীণা অভিনেত্রী বিনোদিনী আজও আছে, গঙ্গার ধারে বসে মালা জপ করে।

এই তো জীবন—এই যাওয়া, এই আসা, এই পরিবর্তন। দেখতে বেশ লাগে।

আমি সবটা মিলিয়ে দেখি—একটি চমৎকার সিনেমার ছবি।

এই খুকু, এই সুপ্রভা, বনসিমতলার ঘাট, আমি—কে কোথায় মিলিয়ে যাব।

নুটুর বিয়ে হয়ে গেল গত বুধবারে ১৬ই অগ্রহায়ণ। জাহ্নবীকে আনতে গিয়েছিলুম—খুকুদের বাড়িতে গেলুম, কতক্ষণ গল্প করার পর বাইরে জ্যোৎস্না উঠেচে দেখে বাইরেএলুম—ও বল্লে, ছাদে চলুন। ছাদে গেলুম, খুড়িমা এল না দেখে ও বল্লে—মা এল না। দু'জনেকত গল্প করলুম, নতুন ব্লাউজের গল্প, কি করে সেটা ছিঁড়ে গেল তাই নিয়ে হাসাহাসি। পরদিনদুপুরে গিয়েচি, কত গল্প, কেবল বলে, বসুন বসুন। তারপর গাড়ি এসেচে, জাহ্নবীকে নিয়েযাচ্চি, ও দেখি ছাদের ওপরে উঠেচে। আমি ওদের বাড়ি যাচ্চি দেখে নেমে এল। বাইরের দোর খুলে দিয়ে চলে গেল। তারপরেই পান হাতে করে এল। চায়ের কাপ যে আলমারিতে থাকে, সেখান থেকে টাকা দিলে। ও খুঁজে পায় না—আমি খুঁজে বার করলুম।

সারাপথ ট্রেনে কি আনন্দেই গেলুম! আনন্দেই ভোর, সে আনন্দের ভাবনা আর শেষহয় না। জ্যোৎস্না-ভরা গত রাত্রির ছাদের কথা, ইছামতীর দৃশ্য, ওর সেই নতুন ব্লাউজের গল্পকেবলই মনে হয়।

মামার বাড়ি যাবার আগে জাহ্নবীদের কলকাতা নিয়ে ঘোরালুম। মামার বাড়ি গেলুম সন্ধ্যার সময়। ভোররাত্রে দধি-মঙ্গল হল। তখনো ঘুম ভেঙে উঠেই কি সুন্দর ভাবনা! আনন্দেরচিন্তাতেই ভোর। সারাদিন ওই একই চিন্তা, অন্য চিন্তাই নেই। সেই রাত্রি, সেই জ্যোৎস্না-ভরাছাদ, সেই ব্লাউজের গল্পের স্মৃতি। বিয়ে হয়ে গেল। তার পরদিন এক রকম কাটল। শুক্রবার বউ-ভাত। খুব জাঁকজমকেই বউ-ভাত হল। বিভূতির মা এলেন, বিষ্ণু এল বারাকপুর থেকে। শনিবার ওদের নিয়ে আবার বনগাঁ। আবার কত কথা, কত গল্প। ও বল্লে, যা কিছু শিখেচি আপনারই জন্যে, আপনি কত বিদ্বান, আমি তো কিছুই জানিনে, কি করে যে আপনার সঙ্গেএমন হল! দেখুন সংসারের কোনো কাজে মন বসাতে পারিনে মন হু হু করে, কেবল ওইসব কথা ভাবি।

আমি দেখলুম—আমারও তো ওই রোগ। অদ্ভুত! অদ্ভুত! বল্লে, কোথাও তার আগে নিয়ে চলুন। জীবনে অনেক বেড়াব কিন্তু আপনার সাহচর্য তো আর পাব না।...

ভগবানের অতি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ দান এই জীবনের অমৃত-ধারা। পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডেতা অনুভব করচি—আজ সাত বছর ধরে, ১৯৩৪ সাল থেকে। এর তুলনা নেই। এ আনন্দের বর্ণনা করতে পারি এমন ভাষা নেই। কতকাল চলে যাবে—তখনখুকুও থাকবে না, আমিওথাকব না—কে জানবে ইছামতী তীরের এক ক্ষুদ্র গ্রামে শেফালি বকুল গাছের নিবিড় ছায়ায় ছায়ায়, কত হেমন্তের দিনের সন্ধ্যায়, কত শীতের দিনের জ্যোৎস্নায় দুটি প্রাণীর মধ্যে কি নিবিড়প্রীতির বন্ধন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল।

আকাশে তার বার্তা লেখা থাকবে, সে গ্রামের বাতাসে তার গানের ছন্দ অশ্রুত সুরে ধ্বনিত হবে, সেখানকার মাটির বুকে তাদের চরণচিহ্ন অদৃশ্য রেখায় আঁকা থাকবে চিরকাল অনাগত যুগের প্রণয়ীদের উৎসাহ ও আনন্দ যোগাতে।

কাল বৈকালে বিশ্বনাথ ও আমি বৈকালের ট্রেনে এলাম। এসেই সারারাত মিউজিক কনফারেন্সে গান শুনেচি। এসেচি রাত চারটার সময় বিখ্যাত কেশরীবাঈ ও বরোদার লছমীবাঈয়ের গান শুনে। বেনারসের পুরস্কার মিশ্র ও বিলায়তুর সানাই বাজনা সত্যিকার উপভোগকরবার জিনিস। কেশরীবাঈ যখন বসন্ত-বাহার আলাপ আরম্ভ করলে তখন আমাতে যেনআমি নেই মনে হল—যেন শৈশবে আমাদের গ্রামের শতমধুর বাল্যস্মৃতির মধ্যে ফিরে গেলুমএক মুহূর্তে। কত মধুর অপরাহ্ণের ছায়ায় অতীত দিনের জীবনের ঘটনাগুলির মধ্যে দিয়ে।আমার অতি প্রত্যক্ষ বর্তমান যেন অস্পষ্ট হয়ে এল—বুঝলুম না কোন্‌টা অতীত, আর কোন্‌টাবর্তমান। কেবল এইটুকু বুঝলুম, গান শুনতে শুনতে আমার মন আরো একজনের জন্যে খুব খারাপ হয়ে উঠল—আজই তাকে ছেড়ে এসেচি, কেবলই মনে হচ্ছিল এত মেয়ের মধ্যেকনফারেন্সের সভায়, আমার যেন কেবল তার কথাই মনে পড়চে, অবশ্য সেই বয়সের মেয়েদেখলে। এবার বড়দিনের ছুটি কি আনন্দেই কেটেচে ওকে নানা রকম গল্প করে ও কতরকমের কথা বলে। সে সব এমন চমৎকার যে সারা বড়দিনের ছুটি কেমন যেন নেশার মতোআনন্দের ঘোরে কেটেচে। সকালে দেখা করতে যেতুম—একদিন 'বাজার করব' বলে তাড়াতাড়ি করচি, বল্লে—কেন এখুনি যাবেন? বল্লুম—বাজার না করলে বাড়িতে বকবেজাহ্নবী। ও বল্লে—আপনি একটু বকুনি সহ্য করতে পারেন না? আর আমি যে আপনার জন্যে কত বকুনি সহ্য করেচি মা'র কাছে? আপনার তো ছোট বোনের বকুনি।

খুড়িমা দু'দিন ভাগবত শুনতে গেলেন—আমি ওর সঙ্গে বসে গল্প করলুম কত ধরনের।বেশ কাটল ছুটিটা। কোনো ছুটি এত আনন্দে কেটেচে কিনা এর আগে বলতে পারিনে।ভালবাসার প্রকৃত রূপ কি, তার কতকটা যেন বুঝলুম।

হাওড়া টাউন হলে ওরা আমায় সম্বর্ধনা করে মানপত্র দিয়েছিল ছুটির আগেই, তাতেরবীন্দ্রনাথ আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন।

একদিন আশিস গুপ্তের মোটরে রাজপুরে ফুলিদের ওখানে গিয়েছিলুম, সেও বড়দিনেরআগে। ১৯৩৮ সালটা সবদিক দিয়ে বড় অদ্ভুত বছর আমার জীবনে।

এবারকারের আর একটি চমৎকার ঘটনা, ভাগলপুরে সুরেন গাঙ্গুলী মশায়ের সেইচেকভের Cook's Wedding বইখানা—যা পড়ে মুঙ্গেরে কোম্পানির বাগানে, বড় বাসায়গঙ্গার ধারে আজ চোদ্দো বছর আগে কি অদ্ভুত আনন্দ ও প্রেরণা পেয়েছিলুম—তা পড়লাম বসে—সেই বইখানাই (সুরেন গাঙ্গুলীর কাছ থেকে এনেচি, বইখানা শরৎচন্দ্রের) বারাকপুরের বাড়ির রোয়াকে বসে পড়লুম। আশ্চর্য—না!

সুপ্রভা এবার একটা ভাল ক্যালেন্ডার পাঠিয়েচে।

মনে আছে এই শীতকালে পাটনার ডিস্ট্রিক্ট জজের বাড়ি গঙ্গার ধারে বেঠোফেনেরমিউজিক শুনতে গিয়েছিলুম গ্রামোফোন রেকর্ডে, নীরদ চৌধুরীর সঙ্গে সকাল বেলা। ওপারে ধূ ধূ গঙ্গার চর, শীতের নদী, বড় বটগাছটা—আমাকে কেবলই মনে এনে দিয়েছিল একটি মেয়েরকথা। সে যেন কোথায় দূরে আছে, শিউলি বকুলের ছায়ায় ছায়ায় তাকে মাঝে মাঝে দেখা যায় দুপুরে, সকালে, বৈকালে, সন্ধ্যার ছায়াঘন হয়ে যখন নামে। যখন চা-পার্টি বসল পাটনায়গভর্নমেন্ট উকিলের বাড়ি সন্ধ্যাবেলা—তখনো রাঙা রোদ মাখানো বাইরের গাছপালার দিকেচেয়ে ওর কথাই ভেবেচি। আর কি আনন্দেই মন ভরে উঠত!

বনগ্রাম সাহিত্য-সম্মেলন শেষ হল পরশু, সরস্বতী পুজোর দিন। সজনীবাবু, ব্রজেনদা, তারাশঙ্কর সবাই গিয়েছিল আমার বাসায়। সজনীবাবুর সঙ্গেখুকুর দেখা করিয়ে দিলাম। দুলুরমা, মাধব ঘোষাল, রমাপ্রসন্ন, গৌরবাবু সব সকালে গিয়েছিল মোটরে। ওদের নিয়ে গেলুমবারাকপুরে। খুকুদের বাসায় চা খেয়ে গেল সবাই। বারাকপুরে আমার ঘরের মধ্যে বসল। ইন্দুদের বাড়ি সব গেল চা খেতে। আমাদের পুরোনো ভিটে দেখলে। মায়ের কড়াখানাদেখলে—তারপর বরোজপোতার বাঁশবাগানে গিয়ে সবাই পড়ল শুয়ে। কিছুক্ষণ পরে মোটরমেয়েদের নিয়ে এসে পৌঁছল। দুলুর মা আরখুকুদেখি বাঁশবাগান দিয়ে চলেচে নদীর ঘাটে।দুলুর মা বাঁশবাগানে এসে দাঁড়াল। তারপরে আমরা যখন নদীর ঘাটে যাচ্চি, তখন দেখি খুকুআর দুলুর মা আর উমা আসচে। আমরা কুঠীর মাঠে গেলুম, ভাঙা কুঠীটা দেখলুম। তারপর মেয়েদের রেখে প্রথম আমরা এলুম বনগাঁয়ে। মেয়েরা পরে এলেন। সজনী, ব্রজেনদাকে নিয়েগেলুম খুকুদের বাড়ি। খুকুর সঙ্গে কথা হল। তারপর বিরাট সাহিত্য-সম্মেলন স্কুলের হলে।সত্যবাবুর পার্টির পরে সবাইকে রওনা করে দিয়ে খুকুদের বাড়ি এসে গল্প করলুম। খুকু কাছের চেয়ারে বসে কাদম্বরী পড়লে। ও আর আমি দু'জনে গ্রামে কেমন বেড়ালুম।

বীরভূম সাহিত্য-সম্মেলনে তারাশঙ্করদের বাড়ি এসে ক'দিন বেশ কাটালুম। কাল পরিপূর্ণজ্যোৎস্না-রাত্রে বীরভূমের উদার, উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে এক জায়গায় বসলুম। জ্যোৎস্নালোকিতমাঠের মধ্যে বসে দূরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেখুকুর কথা ভাবলুম। ওর দ্বারা আমার যে অভাবপূরণ হয়, তা আর কারো দ্বারা যে হয় না তা বলাই বাহুল্য। ওর স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, হাসি, চোখের চাহনি, ছাদে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা—এ সবই আমার জীবনের একটা মস্ত অভাব পূর্ণ করেচে। এই কথাটাই লাভপুরে এসে পর্যন্ত মনে হয়েচে—বিশেষ করে কাল ওই নির্জন মাঠেরমধ্যে বসে দূর দিগন্তের জ্যোৎস্না-প্লাবিত তালীবনের দিকে চেয়ে চেয়ে—আজ স্তব্ধ রৌদ্রদগ্ধদুপুরের মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়ে ওই কথাই মনে হয়েছে যা কাল নির্মল শিববাবুদের বাড়িরপেছনে সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন প্রান্তরের মধ্যে একা বসে ওর যে ছবিটি মনে এসেচে সেটি হচ্চে—এইশনিবার, ছাদে দাঁড়িয়ে ও প্রত্যেক ঘোড়ার গাড়িখানা সাগ্রহদৃষ্টিতে দেখচে।

মধ্যে এখানে সুপ্রভা এসেছিল—তার সঙ্গে একদিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গেলুম।তারপর সে চলে গেল। একদিন আমার মেসে এল সকালে প্রীতি সেন বলে একটি মেয়েরসঙ্গে। ওকে শেয়ালদ' স্টেশনে তুলে দিয়ে এলুম। তারপর বাড়ি গিয়েখুকুদের সঙ্গে এসব গল্পকরি। খুড়িমার অসুখ হয়েচে। খুকুও আমি বসে অনেক গল্প

করি। মনোরমা ও তার বরের সঙ্গেঘোড়ার গাড়িতে বারাকপুর গেলুম। প্রচুর আমের বউল হয়েচে দেশে, বউলের ঘন গন্ধ সর্বত্র।ন'দিদির সঙ্গে গল্প করি। কিশোর বোষ্টুম রোয়াকটা ঝাঁট দিয়ে দিলে। বরোজপোতার বাঁশবনে ডোবার ওপারে কি চমৎকার একটা চারা শিমুল গাছে ফুল ফুটেচে। শ্যামাচরণদা'র সঙ্গে গল্পকরি।খুকুদের বাড়ির দিকে কেউ নেই—যেন শূন্য! খুকুর কাছে সে গল্প করি দুপুরে গিয়ে। খুকুবলে, 'বসুন জিরিয়ে যাবেন। তারপর মাধব ঘোষাল একদিন তার বউদিদি, মাসিমাকে নিয়েবারাকপুরে গিয়ে বাঁশবনে বসল—মায়ের কড়াখানা দেখে এল। ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে একদিন Salt Lake দেখতে গেলুম।

পরশু গিয়েছিলুমনুটুর কর্মস্থলে বেলেডাঙা। আজ ফিরেচি। কাল এমনি সময় মাসিমা, বউমাকে নিয়ে বহরমপুর গিয়েছিলুম। জ্যোৎস্নারাত্রে গঙ্গার ধারে ঠিক যেন ইসমাইলপুরেরমতো মনে হল। তারপর জীবনের কত পরিবর্তন হয়ে গেচে ভাবলুম!

আজ ফিরেচি তিনটের ট্রেনে। দুপুররোদে সারাপথ ঘুমিয়েচি—তবে বীরনগরের কাছে ঘেঁটুফুল দেখেচি খুব। দূরে এই ফাল্গুন-দুপুরে একটি মাত্র গ্রাম এত গ্রামের মধ্যে, যেখানে একটিমাত্র মেয়ের কথা মনে হয়। শিউলিতলায় ডোবার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। স্কুল কমিটির মিটিংছিল, মিটিং-এর পরে স্কুলের ছাদ থেকে বড় অনুভূতি হল অনেকদিন পরে। 'জনতার মাঝেজনগণপতি' গানটি বহুদিন পরে গাইলুম—সঙ্গে সঙ্গে সেই অপূর্ব অনুভূতি আবার মনের মধ্যে ফিরে পেলুম। তখনখুকুছিল না—যখন গাইতুম পঞ্চানন মান্নাকে পড়াবার সময়ে।

ট্রামে আসতে আসতে ভাবছিলুম, সেই যে নাগপঞ্চমীর দিন, শ্রাবণ মাসে বারাকপুরেগিয়েছিলুম, খুকুদের বাড়ি যেতুম, ওদের হাসাতুম, 'ছোড় দি, ভাল কি মন্দ' বলে—তারপর যেন আর কখনো বারাকপুর যাইনি—ওকে আর দেখিওনি। ও চলে যেত কাছ দিয়ে, আমি হাতবাড়িয়ে চালের বাতা থেকে কাপড়ের ফালি পাড়তুম—ও বলত, মা রেখেচে তুলে, হাত দেবেননা। তারপর যেন এই দীর্ঘ সাত-আট মাস ওর সঙ্গে দেখা হয়নি।

খুকুএকরকম ঠেলেই বারাকপুরে পাঠালে এবার। মহরম ও দোলের ছুটি আর বছর কেটেছিল গালুডি, এবার বনগাঁ। খুব আনন্দে কাটিয়েচি। চারদিন খুকুও আমি একবার সকালে একবার সন্ধ্যায় বসে গল্প করতুম। একদিন ওকে নক্ষত্র সম্বন্ধে আমার Radio talk-টা পড়ে শোনালুম।

ঝনঝন্দুপুরে গেলুম বারাকপুরে। সারাপথ ঘেঁটুফুলের কি সুগন্ধ! বিশেষ করে চাল্‌কীআর বনগাঁ থেকে বার হয়েই। চাল্‌কী মুসমলান পাড়ার মধ্যে, গাজিতলার রাস্তায় বাঁশবনে একা চুপ করে মাঝের বাড়িখানার সামনে বসে রইলুম। বাঁশপাতায় আগুন ধরিয়ে দিলাম। কোকিল ডাকছে অনবরত। সেদিন মাধব ঘোষালের মোটরে বেড়াতে এসে ওর বউদিদি ও মাসিমাকেনিয়ে এই বরোজপোতার বাঁশবনে বসেছিল।

কাল শনিবার বেলেডাঙা গিয়েছিলুম নুটুর কাছে। সারাপথ ঘেঁটুফুলের শোভা যা দেখলুম, তাতে মন মুগ্ধ হয়ে গেচে। এই ফুলটা বেশি আছে মদনপুর ও শিমুরালি স্টেশনের কাছে এবং রাণাঘাট পর্যন্ত রেল লাইনের দু ধারে, আর আছে বীরনগরে স্টেশনের সামনের মাঠে। কেমন একটা মিষ্টি অথচ ঈষৎ তেতো গন্ধ বার হয় ফুল থেকে! মুর্শিদাবাদ লাইনে ঘেঁটুফুল নেই, বেলেডাঙা ছাড়িয়ে বহরমপুরের পথে কিছু আছে, আর আছে 'পাগলাচণ্ডী' বলে স্টেশনেরকাছে।

সন্ধ্যার আগে বেলেডাঙা থেকে ফিরলুম মামিমাদের নিয়ে, সারাপথ ধরে একটি ঘেঁটুফুলের বনের কথা চিন্তা করেচি, তার বনসিমতলার ঘাট, তার শিউলিতলা, আমতলা এইবসন্তে কি মধুর হয়েচে! একটি মেয়ের কথা মনে হয় ঝন্‌ঝন্ দুপুরে তেতো ঘেঁটুফুলের গন্ধেরমধ্যেসে শিউলিতলার পথ দিয়ে লেবুতলার পাশ দিয়ে আমতলার উঠানে আসচে চুপিচুপি!...এ একটা ছবি, যা এ সময় বড় মনে আসে...

গত শনিবারের আগের শনিবার মাধব ঘোষাল একটা গ্রামোফোন দিলে। তাই নিয়ে বনগাঁ গেলুম। খুকুকে গান শোনালুম, 'খনা' ছবি দেখাতে নিয়ে গেলুম ওদের সকলকেই। খুকু একখানা পাপোশ বুনেছে দড়ির। সেখানা আমায় হাসিমুখে নিয়ে এসে দেখাতে লাগল—দোরের কাছে দাঁড়িয়ে।

—দেখুন, কেমন বুনেছি, ভাল না ?

—বেশ ভাল, চমৎকার।

—না, সত্যি বলুন!

—না না, বেশ।

তবুও পাপোশখানা হাতে নিয়ে সাগ্রহ মুখে দাঁড়িয়েই রইল দরজার কাছে।

তার সেই হাসি হাসি মুখখানা বেশ মনে পড়চে এখনো। সুন্দর উজ্জ্বল মুখখানা।

গতকাল রামনবমীর হাফ ছুটি পেয়ে রাজপুরে ফুলিদের বাড়ি গেলুম। ওরা সত্য মজুমদারের ভেতরের বাড়িতে আছে। অনেকদিন পরে সত্য মজুমদারের ভেতরের বাড়িতেগেলুম। সেই পুকুরধারটিতে কতকাল পরে আবার দাঁড়ালুম। আমার সাহিত্য-জীবনের আরম্ভহয় এই পুকুরপাড়ের ওই দেবদারু গাছটা দেখে। কি অপূর্ব ভাবই হত মনে!

এই শনিবার (২রা) বাড়ি গিয়ে মুখুজ্যেদের ওখানে খুব গ্রামোফোন বাজানো গেল। গতঈস্টারের ছুটিতে খুকুকে গ্রামোফোন শোনাব বলে বনগাঁয়ের ডাক্তারবাবুকে কত বলেবারাকপুরে নিয়ে গিয়েছিলুম। এবার ও নিজেই একটা গ্রামোফোন পেয়েচে মাধব ঘোষালেরকাছ থেকে। আমায় রেকর্ড চেয়ে আনতে বলেছিল। ওরাও দেখি দিলীপ রায়ের আর বছরের ভাল গান 'এই পৃথিবীর পথের পরে' প্রভৃতি ভাল গানগুলো পেয়েচে। সেদিন রবিবারে রাতেএগারোটা পর্যন্ত আমায় উঠতে দেয় না—কেবল বলে—"এইটে শুনে যান না। লাইলি মজ্নুর পালাটা শুনে যান।" বহু লোক এসেচে, চা করচে খুব, আর বলছে—"রবিবার দিনটাই কি সবযত ভিড়! অন্য দিনও তো আসলে পারত গান শুনতে!" ওর জন্যে প্রাণপণে ঘুরে রেকর্ডসংগ্রহ করেচে ওর দাদা, বনগাঁর সব জায়গা ঘুরেচে, আমায় বলেছিল—আমিও অপূর্ববাবুরবাড়ি থেকে, দেবাশিসের কাছ থেকে, গণপতিবাবুকে বলে নানা জায়গা থেকে অনেক রেকর্ড যোগাড় করেচি। বীণা চৌধুরীর গান, দিলীপের, জ্ঞান গোঁসাই-এর গান ইত্যাদি। ভারী উৎসাহলেগেচে রেকর্ড সংগ্রহ নিয়ে ও গান বাজানো নিয়ে। সেদিন বল্লে—এবার টিপ্ আনবেন আমার জন্যে।

বল্লাম—বেশ।

—আর কি আনবেন?

—কলকাতায় আর একবার যেতে হবে।

—যেও, ভালই তো।

—টিপ আনবেন ঠিকই।

মধ্যে গেলুম রাজসাহী। নওগাঁ। রাত্রে মোটর নিয়ে গেলুম মহাদেবপুরে জমিদারবাড়ি।সেখান থেকে পাহাড়পুর। প্রায় সত্তর মাইল মোটরে বেড়ানো গেল। এ শনিবারে বনগাঁ গিয়েচি—পান্নারা নিয়ে গেল বাসে। যখন যাচ্চি তখনখুকুদেখি জানলার কাছে বসে গ্রামোফোন বাজাচ্চে। সকালে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করেছিল—আমায় বল্লে, টিপ ফুরিয়ে গিয়েচে, টিপ আনবেন কিন্তু।

আজ একুশ বছর পরে বারাকপুরে কালীর সঙ্গে বেলেডাঙ্গা বেড়াতে গিয়ে মরগাঙেরধারে সেই উঁচু জায়গাটাতে বসলুম। ১৯১৮ সালের মে মাসে প্রথম শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেওকে নিয়ে ওখানে বসে গল্প করেছিলুম। আজ আবার

এত বৎসর পরে ওর সঙ্গে মরগাঙেরধারে বসেচি সেই মে মাসেই। জীবনের কত ঘটনা তারপর ঘটে গেল— গৌরী এখানে এল, তাকে নিয়ে পানিতরে গেলুম—সে মারা গেল—তারপর জব্বলপুর, হরিনাভি, চট্টগ্রাম, ঢাকা, আবার কলকাতা, ভাগলপুর—আবার কলকাতা, (১৯৩৩-৩৯)- কত কি, কত কি! আবারএতকাল পরে ও এসেচে, ওর সঙ্গে বিকেলে বেড়াতে এসেচি বেলেডাঙ্গায়। ওর সঙ্গে অনেক গল্প করে আইনদ্দির বাড়ি গিয়ে দু'জনে বসি। ওবেলা আমগাছে পরগাছা হয়েছিল, তাই তুলেএনেছিলুম। খুকু তাই পরে এসে দেখালে কেমন দেখাচ্চে।

গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হয়ে গিয়েচে—এতদিন পরে বেশ লাগচে। আবার শুরু হয়েচেশিউলিতলার উঠোনে আসা-যাওয়া—নারকোল গাছের পাতায় লণ্ঠনের আলো পড়া সেইসব প্রতি বছরের মতো।

বিকেলে একটা সোঁদালি গাছে ঠেস্ দিয়ে কুঠীর মাঠে অনেকক্ষণ বসেছিলুম। তারপরবনসিমতলার ঘাটে এসে দেখি খুকুঘাট থেকে পথে উঠেচে। খুড়িমা তখনো জলে। ওরা উঠে চলে গেল, আদাড়ি এসে নামল জলে। আজ কি চমৎকার কালবৈশাখীর কালো মেঘ করে এল কাঁচিকাটার দিকে। জলে দাঁড়িয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলুম। তারপরে শিমুলতলায় এসে দেখি উত্তর মাঠে কালবৈশাখী আরো নিবিড় হয়ে আসচে। কত কথা মনে করিয়ে দেয় এই বারাকপুরের কালবৈশাখী—এমন আর কোথাও যেন দেখিনি। জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে আসা সার্থক এইকালবৈশাখীর অপূর্ব সৌন্দর্য দেখতে পাওয়া যায় বলে। বারাকপুরে আজকাল জীবনটা নানা সুখে-দুঃখে হর্ষবেদনায় স্পন্দমান, পুরোনো দিনের স্মৃতির পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়—তাই হয়েছিল কিন্তু দিনকতক, ১৯২৩-১৯৩৩ সাল পর্যন্ত। অদ্ভুত ধরনের জীবন্ত দিন আজকাল—তবে বোধহয় এইবার যেন আরো বেশি। পরশু সুপ্রভার পত্র পেয়েচি—রত্নাদেবীর চিঠিতে তিনিলিখেচেন তাদের ওখানে যেতে। দেখি কতদূর কি হয়।

আজ সকালে যখন কুঠীর মাঠে গিয়েচি, তখনই দূরে কোথাও আকাশের কোলে মেঘডাকচে। কি সোঁদালি ফুলে-ভরা মাঠের শোভা! ওপাড়ার ঘাটে যখন নেমেচি জলে, তখন ঝোড়ো মেঘের কি শোভা! ঘন কালো মেঘপুঞ্জ ঘুরে ঘুরে ওলট-পালট খেতে খেতে মাধবপুরের মাঠেরদিকে উড়ে চলেচে—তারপরেই এল ঝমঝম বৃষ্টি। খানিক পরে উঠল রোদ। খুকু ওই অতবেলায় উঠে যাচ্চে ন'দিদির বাড়ি থেকে—আমি বসতে বলতেই হেসে চলে গেল। তারপরসারাদিনের মধ্যে কতবার এল গেল—নানা ছুতোয়। আমতলায় চেয়ার পেতে বসে আছি—দু'বার এসে খানিকক্ষণ করে রইল। বলে—এক পা এগিয়ে যাই তো দু পা পিছুই—কেন তা কি জানি! সে কথাটা ওদের দাওয়া থেকে নেমে ছুটে এসে আমতলায় বলেচলে গেল। বিকেলে গোপালনগর থেকে এসেচি—ও অমনি এল শিউলিতলায়। খানিকটা পরেনাপিত-বউ আসাতে আমি চলে গেলুম গা ধুতে। ভূষণ মাঝির জমির ওপরে সোঁদালী ফুলফুটেছে—সেদিকে চেয়ে আমার কি আনন্দ—এমন অপূর্ব আনন্দের অনুভূতি কোথাও হয় নাকেন তাই ভাবি। জলে গা ধুতে নেমেও যেন আর উঠতে ইচ্ছে করে না। বনসিমতলার ঘাট, একফালি চাঁদ আকাশে, কুঁচি-কাঁটার জঙ্গল—ঘাটে স্নানরতখুকুর দিদি—বিশেষত ঘাটের পথে—এই সব মিলে কি আনন্দই এল মনে! অপূর্ব আনন্দে কাটচে গ্রীষ্মের ছুটিটা। রোজ সকালে উঠে মনে হয় আজ না জানি কি ঘটবে!খুকুথাকে বলেই আনন্দটা ঘনীভূত হচ্চে।আনন্দের উৎসমূল তো ওই-ই।

আজ ভারী চমৎকার কালবৈশাখী হয়ে গেল বিকেলটাতে। কালবৈশাখীর যে কি অপূর্ব প্রকাশ এখন সন্ধ্যার কিছু আগে! একটা চাপা রাঙা মেঘ হয়েচে এমন অপরূপ! কাল চাটগাঁথেকে রেণুর পত্র পেয়েচি। সে লিখেচে—বাবা, আপনি একবার এখানে চলে আসুন। লিখতেলিখতে মেঘটা অতি অপরূপ রাঙা রং ধরেচে। বারাকপুরে এবার অতি সুন্দর কাটচে—তবেঝড়-বৃষ্টি অতি কম—ক'দিন তো বেশ গরম গেল।

আমি আর কালী কুঠীর গাছে ডুমুর পাড়লুম। তারপর বেলেডাঙা যেতে যেতে ভীষণ কালবৈশাখীর ঝড় পেলুম। ঘোষেদের দোকানের মধ্যে আমি, কালী, আইনদ্দির নাতি আর দোকানদার মনু ঘোষ। ঝড়ের বেগে দোচালা জীর্ণ ঘর উড়ে যায় আর কি—সবাই মিলে বাঁশধরে থাকি—তবে রক্ষা হয়। তারপর দেখি বড় অশ্বত্থ গাছটা পড়ে

গিয়েচে। আমার নারকোল গাছটাও পড়েচে। খুকুরা নারকোল কুড়িয়ে রেখেচে সব।খুকুসন্ধ্যার সময় আমায় লণ্ঠন ধরে ওদের বাড়ি নিয়ে গেল। বল্লে, আজ খুব ভাল গল্পের দিন, যাবেন না আমাদের বাড়ি? ও রোজসন্ধ্যার সময় আমায় নিতে আসে—ছুতো করে ন'দিদিদের বাড়ি আসে আমায় নিয়ে যেতে।যাবার সময় বলে—যাবেন নাকি?

আজ বিকেলের দিকে অপূর্ব কাজল মেঘ করে এল—থমকে রইল, বৃষ্টি হয় না। খুকুআজসকাল থেকে কতবার যে এল! আমি বেলেডাঙ্গায় বেড়াতে গেলুম, পুলের এধারে ঘাসেরওপরে বসি। খেজুরগাছে কাঁদি কাঁদি খেজুর, শিমুল বাঁশবনের মাথায় কালো কাজল মেঘ(খুকুকে দুপুরে বলছিলুম আমতলায় যখন সে দিলীপ রায়ের 'তরঙ্গ রোধিবে কে?' বইখানা দিতে এল—তুই বলতিস—কা-লো-কাজল মেঘ) সবসুদ্ধ মিলে বড় অপূর্ব লাগল।

এই পল্লীগ্রামের যে জীবনযাত্রা, শতাব্দীর পর শতাব্দী এই রকম, এই বাঁশ, শিমুল বনেঅপরাজেয় শোভা এমনি ধারা দেখা যায়—ঝিঙে ক্ষেতে এমনি ফুল ফোটে—কত বনসিমতলারঘাট, কত গ্রাম্য মেয়ে, কত হাসি কান্না প্রেম বিরহ—এই রকম চলবে। এদের নিয়ে একটা বড় উপন্যাস লিখব আজ মাথায় এসেচে। পৃথিবীর ঊর্ধ্বে এই শ্যামল মেঘ-স্তূপ যেমন শান্ত, স্থির, তেমনি নির্বিকার। মহাকাল যেন এই উপন্যাসের পটভূমি— নায়ক-নায়িকা গ্রাম্য নরনারী। Da Vinci-র শেষ জীবনের মতো গম্ভীর তার আকৃতি। সন্ধ্যায় স্নান করে ফিরে এলুম—খুকু মনোরমার মার সঙ্গে বাঁশতলার পথে ঘাটে যাচ্চে। তাকেও এই উপন্যাসের মধ্যে স্থান দেব।

আজ দিনটি সব দিক দিয়ে ভারী চমৎকার। বেশ মেঘ করে এল, ঘন আমতলায় চেয়ার পেতে বসে দাওয়ার কোণে দণ্ডায়মানা খুকুর সঙ্গে কথা বলচি। দুপুরের পর ইন্দু, আমি, গুটকেকুঠীর মাঠের পথ দিয়ে মোল্লাহাটি গেলুম। ইন্দু গেল আমডোবে। আমি ও গুটকে মোল্লাহাটিকুঠী ও নীলের হাউজঘর দেখি এতকাল পরে। কি সুন্দর শ্যাম শোভা, অনুন্নত খেজুর গাছ, জলিধানের ক্ষেত পথের দু'পাশে! একটা সমাধি দেখলুম বাঁওড়ের ধারে মোল্লাহাটিতে। ফিরবার পথে খুব জামরুল পাড়লুম দু'ধারের গাছ থেকে। বেলা পাঁচটার সময় ফিরে রোয়াকে এসে বসেচি, খুকু এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে।

আজ সকালে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েচি, অপরূপ নীল মেঘ ওপারের চরের ওপরেঝুলে পড়েচে। তাড়াতাড়ি এসে খুকুকে ডাকলুম—খুক, খুকু, উঠে মেঘের অপূর্ব রূপ দেখে যা ! ও ঘুম ভেঙে উঠে ঘুম-চোখে মশারীর বাইরে মুখ বার করে বলল, আজ এতকাল পরে বর্ষানামল বোধ হয়। পথেঘাটে কালো এত ধুলো যে একখানা গরুর গাড়ি গেলে ধুলোয় সর্বাঙ্গভরে যায়। শেষ জ্যৈষ্ঠে এমন শুকনো খটখটে রাস্তা, এমন ধুলো কখনো দেখিনি। আজও ধুলোভেজেনি পথের, এ বৃষ্টিতে দিনটা ঠাণ্ডা হল মাত্র।

এবার গ্রীষ্মের ছুটির প্রতি দিনটি যে আনন্দ বহন করে আনে, তা মনের আয়ুকে যেনবাড়িয়ে দিয়েচে। দেহের যৌবনের ন্যায় মনের একটা যৌবন আছে, মনের যৌবন চায় নব নবআনন্দ, নব নব ভাবরাজি, আশা, উৎসাহ, সৌন্দর্যময় চিন্তা, কল্পনা, ভক্তি, বিরাটত্বের স্বরূপউপলব্ধি। এবারকার মতো সোঁদালি ফুলের মেলা, তুঁত ফুলের ও বিল্বপুষ্পের সুগন্ধ অন্যবারদেখা যায়নি, কারণ এবার ঝড়-বৃষ্টি-বাদলা নেই বল্লেই হয়। খুকুএখানেই আছে, সে সর্বদাইআসচে, গল্প করচে। গোপালনগরে বারোয়ারির যাত্রা হবে, আমার বাল্যবন্ধু কালী অনেকদিনপরে গ্রামে এসেছিল, এই সব নানা কারণে গ্রীষ্মের ছুটিতে এমন আমোদ অনেক দিন হয়নি। খুকু এই সবে ন'দিদির ঘর খুলবার ছুতো করে এসে গল্প করে গেল উঠোনে দাঁড়িয়ে। এই সববিরাট আকাশের তলে, বন-গাছের ছায়ায় যেসব সুখ-দুঃখের ক্ষুদ্র প্রবাহ চলেচে—তার সঙ্গে অল্প দিনের মধ্যেই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েচি যেন, ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। ১৯২৯ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রথম আসি বারাকপুরে, এটা ১৯৩৯ সাল। এই এগারো বছরকি চমৎকার কাটল! কত বর্ষার শ্যামল-মেদুর আকাশ, কত হেমন্ত, জ্যোৎস্না রাত্রি, কত শীতেরঅপূর্ব সন্ধ্যা নানা অনুভূতিতে মধুর হয়ে উঠল। আমার জীবনের ১৯২৯-১৯৩৯ সাল পর্যন্তএই যে সময়টা চমৎকার সময়।

ছুটি ফুরিয়ে এল। আর দশ-এগারো দিন। কিন্তু এবার যেমন বৃষ্টি তেমন একদিনওহয়নি—ব্যাঙ-ডাকানি বর্ষা, সারারাত ধরে বৃষ্টি-ঝড়; সে সব হয়নি বা নাইবার সময়ে ঘাটেরপথে খাপরা কুচির ওপর দিয়ে জলের তোড় চলে যায়—কেঁচোর দল জলে বুকে হেঁটে যায়এ-ও এবার হয়নি। মাস ফুরিয়েচে। হাজী পাগলার মাকে সেদিন পর্যন্ত আমবাগানে আমকুড়ুতে দেখেচি—আজকাল আর দেখিনে।

ক'দিন বারোয়ারির আসরে গোপালনগরের গণেশ অপেরা পার্টির গান হল। রোজ শুনতে যেতুম—একদিন তো বনগাঁ থেকে ন'টার ট্রেনে নেমে যাত্রা শুনে রাত দু'টোতে ফিরি।শেষদিন যাত্রা হল হাজারি প্রামাণিকদের বাড়ি। সুধীরদা, জিতেন, আমি—তাস খেলা হলসন্ধ্যাবেলা। কারণ খুব মেঘ ছিল আকাশে, টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছিল বলে যাত্রা আরম্ভ হতে পারেনি।

ছুটি শেষ হয়ে এল প্রায়। বাঁশবনে পিপুললতার বন দেখা দিয়েচে। ভেদ্‌লা ঘাসের কুচোসাদা ফুল মাঠে অজস্র ফুটতে শুরু করেচে। কোকিলের ডাক অনেক কমে এসেচে। তবেবউ-কথা-কও ডাকচে বেশি। এই যে লিখচি, জানালার উপরে বসেহরি রায়ের বড় খেজুরগাছটা থেকেডাঁসা খেজুরের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসচে। আজ ও বেলা খুকুকে একটা কবিতালিখে শোনালুম সকালে।

আজও সকালে বাঁওড়ের ধারের বট-অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় ছায়ায় বেলেডাঙ্গা পর্যন্ত গিয়েচি। ছুতোর ঘাটার কাছে দেখি, রাখাল বাঁড়ুয্যের স্ত্রী স্নান করে আসছেন। বল্লুম, ও খুড়িমা, আপনার ভাই চলে গিয়েচে? উনি বল্লেন, সে তো সেদিনই গিয়েচে। আমিও যাব। এদেশেআবার মানুষ বাস করে? বল্লুম, কেন, এদেশের ওপর হঠাৎ অত চটে গেলেন যে? কোথায়যাবেন? বল্লেন, ভাইয়েদের কাছে চলে যাব। তারপর ওঁর ভাইদের গুণকাহিনী আমার কাছেসবিস্তারে বলতে লাগলেন। আমি তার হাত এড়িয়ে খানিকটা এসে দেখি পথের ধারেপাতাল-কেঁড়ে হয়ে আছে। আদাড়ির নাতি মধুকে ডাকলুম, সেও বল্লে— এগুলোপাতাল-কেঁড়ে। তারপর ভেদ্‌লা ঘাসের শয্যায় মাঠের মধ্যে গামছা পেতে কতক্ষণ শুয়ে রইলুম। বেশ লাগে। স্নান করে বড় আনন্দ পেলুম আজ—নদীর জল যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি যেনকাকের চোখের মতো স্বচ্ছ! বাড়ি এসে শুনি এগুলো নাকি পাতাল-কেঁড়ে নয়।

সকালে ভাণ্ডারখোলা গেলুম, কাকার মেয়ে শৈলর সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে গেলগুটকে। রাস্তা বেজায় খারাপ—যাবার সময় রোদ ছিল খুব—পাল্লা ছাড়িয়ে বড় মাঠ— গাছপালা কম—কেবল একটা বড় বটগাছ আছে—হরিশপুরের মধ্যেও গাছ নেই— ভাণ্ডারখোলা গিয়ে পৌঁছলুম বেলা তখন দশটা। ওদের চণ্ডীমণ্ডপে আগে একবার গিয়েছিলুম, দেবব্রতের কথা ভাবতুম তখন। শৈলর সঙ্গে দেখা হল—অনেক দুঃখ করলে সে। ভাইয়েরাদেখে না, নিয়ে যায় না। আসবার সময় বাড়ির বাইরে তেঁতুলতলার পথে দাঁড়িয়েরইল—প্রণাম করে বল্লে, আপনি এসেচেন বড় শান্তি হয়েচে আমার। আমি যদি মরেওযাই—আমার মেয়ে দুটোকে দেখবেন আপনারা। বড় কষ্ট হল মেয়েটাকে দেখে ভাল ঘরেই বিয়ে হয়েছিল, খুব অবস্থাপন্ন ঘরে। কিন্তু ওর কপালক্রমে অল্প বয়সে বিধবা হল—এখনভাসুর-দেওরেরা ওকে ফাঁকি দেবার চেষ্টায় আছে।

ফিরে আসবার সময় দেখি হরিশপুর ছাড়িয়েই কালো কাজল মেঘ বারাকপুরের দিকে উড়ে যাচ্চে—মাদেলার বিলের ওপর দিয়ে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! একটা বটগাছতলায় আশ্রয় নিলুম—কতক্ষণ বসে "War and Peace' পড়লুম গাছতলায়। ঝমঝম বৃষ্টি নামল।

রাস্তায় হয়ে গেল ভয়ানক কাদা। পথ হাঁটা যায় না—কেবল পা পিছলে যাচ্ছে।

কাউকে পাড়ায় বলে যাইনি। এসে রোয়াকে বসেচি—খুকুন'দিদিদের ঘরে কলের গানবাজিয়ে পাড়ার মেয়েদের শোনাচ্ছিল—নন্দর মার মুখে শুনলে আমি এসেচি, বার হয়ে এসেচুপিচুপি বললে—কোথায় গিয়েছিলেন?

—ভাণ্ডারখোলা।

ও গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর খুড়িমা ঘাটে গেলে, ও এসে অনেকক্ষণ রইল। বল্লে,—মাকে পঞ্চাশবারজিগ্যেস করেচি, মা, বিভূতিদা গেল কোথায়? একবার ভাবলুম বনগাঁ। কিন্তু বলে যেতেনতাহলে।

এই দিনইখুকুরাত্রে প্রস্তাব করলে কোথাও বেড়ানো যায় কি না। বল্লে, নৌকোয় করে বনগাঁ ওরা যাবে ৫ই আষাঢ়, তারপর সব ঠিক করা হবে। খুব উৎসাহ মনে।

একদিন সকালে পা মচ্‌কে গিয়ে ব্যথায় সারাদিন কষ্ট। কোথাও নড়তে-চড়তে পারিনি।রাত্রে গোপাল এসে ভাত দিয়ে গেল আমার বাড়ি।

এদিন নৌকো করে খুড়িমা, আমি এবং খুকুবনগাঁ এলুম সন্ধ্যার সময়। বনসিমতলার ঘাটথেকে বিকেলে আমরা বিদায় নিলাম। ও রেকর্ডের বাক্স বইছে, বল্লাম—রেকর্ডগুলো দে।

ও বল্লে—আচ্ছা, খোঁড়া পীর! থাক—আমিই বইচি!

গল্প করতে করতে আর কলের গান বাজাতে বাজাতে নদীর ওপর দিয়ে আসা গেল। এক একটা নৌকো আসে, আর বলি, খুকু, ভদ্রলোকের নৌকো আসচে—একটা ভাল গান দে।

ও ওমনি (এই পর্যন্ত লিখে রেখেছিলুম, তারপর তিনমাস বড় ঝঞ্ঝাটে কাটল বলেলিখতে পারিনি, আজ আবার লিখচি পুজোর ছুটির মধ্যে, আজ ১৪ই অক্টোবর) একখানা ভাল রেকর্ড দেয়। এমনি করে বনগাঁ এসে পৌঁছানো গেল। সেই রাত্রে লণ্ঠন ধরে আমি ঘাটে দাঁড়িয়েথাকি—আর কুলিতে জিনিস বয়ে নিয়ে যায়খুকুদের বাসায়।

তার পরদিনের পরের দিন আমরা এলুম কলকাতায়—সেখানে থেকে আসাম মেলে রওনা। পদ্মার পুল দেখেখুকুখুব খুশি। পার্বতীপুর স্টেশনে আমরা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে গেলুম। রাত্রিতেখুকুকেবল আমায় জাগায় আর বলে—দেখুন দেখুন—কত বড় নদী চলে গেল!

সকালে নেমে গৌহাটি। তখনই মোটর বাসে বশিষ্ঠ আশ্রম। ঘন জঙ্গলের মধ্যে। সেখানে থেকে দুপুরে পাহাড়ে উঠি। সেইদিনই আমরা রওনা হই। বিকেলে পাণ্ডুঘাটে একটা খাবারেরদোকানে খাওয়ার সময় খুকু বল্লে—দাঁড়ান, দাঁড়ান, ওরা বিল দেবে তো! কথাটা আমার বড় ভাল লাগল। এরা আবার খাবার দোকানে বিল দেয় নাকি!

সকালে পার্বতীপুরে আবার চা খেলুম সকলে। সেইদিনই বৈকালের ট্রেনে বনগাঁ।

খুকুর বিয়ে হল এই দিনে। আমি বিকেলের গাড়িতে বনগাঁ গেলুম। আমার হাতে ছিলএকখানা 'লিপিকা', আমার কাগজ নতুন বার হয়েচে। সেখানা ওর হাতে নিয়ে গিয়ে দিলুম। ওএল বাইরের ঘরে। বল্লে—এত দেরিতে এলেন যে বড়! বিবাহ চুকে গেলে রাত তিনটেরমেলে কলকাতা এলুম।

এদিন পাবনা গেলুম সভাপতিত্ব করতে। আর বছর এই দিনে নাগপঞ্চমীর দিন বাড়িগিয়েছিলুম—খুকুর বাড়ি খেয়েছিলুম সেকথা মনে পড়ল। সৎসঙ্গ আশ্রমে গিয়ে নতুন মেজবউদিদির সঙ্গে আলাপ হয়। মেজ বউদিদির দুই বোন গান করলে বেশ।

খুকুর পত্র পেলুম মানকুণ্ডথেকে। ও লিখেচে যেতে। বিকেলের গাড়িতে মানকুণ্ডুগেলুম। আমি, দেবু ও খুকু বেড়াতে গেলুম খাঁ-দের বাগানে। খুকু যত্ন করলে। অনেক কথাবল্লে। তার পরদিন চলে এলাম।

পূজার ছুটি প্রায় শেষ হয়ে এল। বনগাঁতেই ছিলুম সারা ছুটি। খুকুও আছে বনগাঁয়ে।ওদের বাড়ি প্রায়ই দু'বেলা বেড়াতে যাই। একদিন যাইনি, সেদিন সপ্তমী পুজোর দিন, হাজারীরবাড়ি গোপালনগর গেলুম বেড়াতে। অল্পদিন হল বর্ষা থেমেচে, শ্যামলী লতায় ফুল ধরেচে, আরো নানা বনফুলের সুগন্ধ সকালের বাতাসে। আকাশ নীল, গাছপালা ঘন সবুজ। হাজারীওখানে খেতে বল্লে। সুধীরদা, জিতেন, আমি, বিজন—সবাই মিলে খুব আড্ডা দেওয়া গেল। গত

গ্রীষ্মের ছুটিতে একদিন রাত্রে বারাকপুরের বাড়িতে যে লোকটি আমায় কবিতা শুনিয়েছিল, সেইকুণ্ডুমশায়, আমাকে নিভৃতে ডেকে তার নতুন লেখা কবিতা শোনালে। গৌর কলুর দোকানে বসে অল্পক্ষণ গল্প করি। এসব জায়গায় আসিনি আজ চার মাস—সেই জ্যৈষ্ঠ মাসেরছুটির পর আর আসিনি। এসব জায়গায় যেন বারাকপুরের জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমের ছুটিরআবহাওয়া মাখানো, খুকুমাখানো, বকুলতলা মাখানো—আমার হাট করে নিয়ে যাওয়া, "ওখুকু হাট নিয়ে যা, খুড়িমা কোথায়?" সেই সব দিনের শত স্মৃতি জড়ানো গৌর কলুর দোকানেরসঙ্গে। ফিরবার পথে গাজিতলায় ভাঙনের ধারে গিয়ে কতক্ষণ বসে রইলুম। ওই দূরেবনসিমতলার ঘাট, কে একটি ছোট মেয়ে যেন এখনো স্নান করে ভিজে চুলে ভিজে কাপড়েবনসিমতলায় ঝোপের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একবার চকিত নয়নে পিছন দিকে চাইলে।বনগাঁয়ে ফিরে সার্বজনীন পূজার আরতি দেখতে গিয়েচি প্রফুল্লদের বাড়ি। আজ দুবেলাই খুকুদের বাড়ি যাইনি। একটু করে ভিড়ের মধ্যে খুকুএসে দাঁড়াল, চারিদিকে চেয়ে দেখলে—তারপর চৌকির ওপর উঠে দেখতে লাগল আর মাঝে মাঝে এদিকে চাইচে। বেজায় রাগ করেচে আজসারাদিন যাইনি বলে। পরদিন সকালে ভয়ানক অনুযোগ ও অভিমানের পালা।

তারপর একদিন নকফুলে হরিপদ চক্রবর্তীর বাড়ি নৌকো করে নিমন্ত্রণ খেতেগেলুম—আমি, মন্মথদা, বিভূতি। আমাদের ঘাটে নেমে গুটকেকে ডাকতে গেলুম আমি বিভূতিও মন্মথদা। গুটকে ইন্দুর ছেলে, গরিব বাপ, ভাবলুম নিয়ে যাই, ভাল-মন্দটা খেতে পাবে এখন। গিয়ে শুনি তার জ্বর।

সন্ধ্যার সময় নকফুল থেকে যখন ফিরচি, তখন দেখি দেবু একখানা নৌকো থেকেবলছে—ও বিভূতিদা!...দু'জনেই বেড়াতে বার হয়েচে মহাষ্টমীর দিনটা।

বনগাঁতেই ছিলুম। খয়রামারির মাঠে বেড়াতে যেতুম। একদিন গিয়েছিলুম চালকী। নরেনদা এসে নিমন্ত্রণ করেছিল। অজস্র বন-তারার ফুল ফুটেচে বনে ঝোপে, ছাতিম ফুল ফুটেছে—বৃষ্টিথেমে যাওয়ার দরুন পথঘাট খটখট করচে শুকনো, বেশ লাগল। চালকীতে খেয়েদেয়ে গেলুমবারাকপুর। আমার রোয়াকে চেয়ার পেতে বসলুম সেই জ্যৈষ্ঠ মাসের পরে। মনে হল এক্ষুনি খুকু যেন আঁচল উড়িয়ে আসচে পাশের বাড়ির শিউলিতলা থেকে। আর তার সঙ্গে ওভাবে জীবনেকখনই হয়তো দেখা হবে না। আর কোনোদিন সে আঁচল উড়িয়ে পাশের উঠোনের পথটি বেয়েআসবে না আগের মতো। মনে পড়ল ওদের উঠোনের ওই বড় শিউলি গাছটার ফুল ফুটত এইপুজোর সময়—আমি বসে বসে এইখানে 'আইভ্যানহো'র অনুবাদ করতুম, আমার কাছে রোজসন্ধেবেলা আসাই চাই ওর—ভোরের গাড়িতে নানা ছুতো করে আমার বনগাঁ থেকেআসা—সেসব দিনের কথা কোনোদিন ভোলা যাবে না। তারপর ঘাটের ধারে গুটকের সঙ্গে মাছধরা দেখতে গেলুম। সতুকাকা, ইন্দু, শ্যামাচরণদা মাছ ধরচে। ইন্দু গল্প করতে করতে পাকা রাস্তায় এল। বেলা তিনটে পর্যন্ত বাড়িতে শুয়ে থেকে মন্মথদার বাড়ি এসে চা খেলুম।

তারপর ক্রমে ক্রমে ওখানে খুব আচ্ছা হত। সন্ধ্যাবেলা খুকুদের বাড়ি যেতুম—ওগ্রামোফোন বাজালে একদিন। আমার জন্যে জরদার কৌটো এনে বল্লে—পারতি খাবেন, পারতি ?

তারপর গত শনিবারে বনগাঁ থেকে চলে এলুম কলকাতা এবং সেইরাত্রেই ঘাটশিলা রওনা হই। ঘাটশিলার বাড়িটা বেশ হয়েচে। কমল খুব যত্ন করলে। যেদিন সকালে গেলুমঘাটশিলা—সেদিনই দুপুরের গাড়িতে গালুডি গেলুম নীরদবাবুদের বাড়ি। শ্যামবাবুর সঙ্গেগেলুম আর বছর যে ঘরে জ্বর হয়ে পড়ে থাকতুম, সেই ঘরটা দেখতে। চিত্তবাবুর বাড়িতেপার্টি হল খুব। মেয়েরা যথেষ্ট যত্ন করে খাওয়ালেন, অটোগ্রাফ খাতায় সই করিয়ে নিলেন।

সন্ধ্যার ছায়ায় কালাঝোর ও সিদ্ধেশ্বর ডুংরি গম্ভীর দেখাচ্ছে। পশুপতিবাবু ও কমল বেড়াতে এল আমার বাসায়। আমি রোজ সুবর্ণরেখার তীরের চারা শাল ও কেঁদবনের মধ্যেরাঙামাটির ওপর দুপুর রোদে চুপ করে বসে থাকতুম। এই বেড়ানোর আনন্দটা যেখানে নেইসেখানে আমার ভাল লাগে না। গালুডি আগে এমনি ছিল, আজকাল সেখানে না আছে বন, না আছে নির্জনতা।

পশুপতিবাবু, নুটুও আমি কমলদের বাড়ির সামনে শালবনেতে বসে অনেক গল্প করি। পেছনের শালবনেও গিয়েছিলুম—আমি একটা গাছে উঠে বসলুম—কমল হাসতে লাগল।বৈকালে সুবর্ণরেখার তীরে একটা বড় শিলার ওপর সবাই মিলে গিয়ে বসলুম। দুটি মেয়ে বেড়াতে গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে—একটি কোথাকার স্কুলের মাস্টারনী, বেশ গান গাইলে।

পরদিন আবার গেলুম গালুডি। মহুলিয়ার হাট, সোমবার সেদিন, মহুলিয়ার হাট দেখতেগেলুম। নানা গ্রাম থেকে সাঁওতাল মেয়েরা সব জড়ো হয়েচে, মাথার চুলে ফুল গুঁজেচে, দিব্যিনিটোল কালো চেহারা, বেশ লাগে দেখতে। আমি মুক্ত শিলায় বসে বসে ভাবছিলুম অনেক দূরের একটি মেয়ের কথা। যখন শ্যামবাবুর বাড়িতে সেই কোণের ঘরটাতে বসে চা খাই, তখনো মনে হয়েছে অনেকদিন পরে কার্তিক মাসে চূড়ামণি যোগের দিন ওদের বাড়ি গেলুম। যেখানে বন্যায় ছিল একবুক জল—সেখানে এখন শুকনো খটখটে। ও চা দিতে গিয়ে বলেছিল—এই কাপ না এই ভাঁড়?

অনেক রাত্রের গাড়িতে নেমে ঘাটশিলার বাংলোতে একা আসচি। তারাভরা অন্ধকার আকাশ–শালবনের মাথায় বৃহস্পতি জ্বলচে। অনেক দূরে এক নদীর ধারের দোতলাবাড়ি ছিলএকটা, বহুদিন আগের কথা। হয়তো এখন সেখানে কেউ থাকে না।...গৌরী— অনেকদিন পরেওর কথা মনে হল।

ভাবলুম কাল আবার এই কাঁকর মাটি ছেড়ে বাড়ি যাব। বনময় সেই ফুলের সুগন্ধ ওশ্যামলীলতার ফুলের গন্ধ পাব। কলকাতা এলুম—আমার সঙ্গে চন্দননগরের সেই মেয়ে দুটি।কাল যাব বনগাঁ। ভাবচি হাজারীর বাড়ি যাব। কালীপুজোর দিনটা। বেশ কাটল পুজোর ছুটিটা। ওবেলা মাধব বলেচে রেকর্ড দেবে খুকুর জন্যে। ওর জন্যে কিছু টিপও নিতে হবে।

আবার এই ক'দিনের জন্যে দেশে গিয়েছিলুম। খুকু ওখানেই আছে। রোজই যেতুম ওর ওখানে। আসবার দিন অনেক কথা বল্লে। আজ মন্মথদের বাড়িতে কার্তিক পুজোর নিমন্ত্রণে গিয়েছিলুম প্রতি বৎসরের মতো। সেখানে অরুণ বল্লে, এলাহাবাদে ঊষার সঙ্গে ওদের দেখাহয়েছিল—আমার নাম করেচে ঊষা। বনগাঁয়ে ভূপেনের সঙ্গে একদিন বিভূতি ও আমিরাজনগরের বটতলায় বেড়াতে গিয়েছিলুম।

ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেল—গত ডায়েরি লেখবার পরে। বনগাঁর বাসা উঠিয়েদিয়েচি—এখন ঘাটশিলাতেই আমার বাড়ি। সেখানেনুটু, বউমা, খোকা, খুকি সকলেই রয়েচে। ষোড়শীবাবু বলে বনগাঁয়ের একজন আবগারি বিভাগের ইন্সপেক্টর এসেছেন—অতি ভদ্রলোক। ওঁর পরিবারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট হৃদ্যতা হয়ে গিয়েচে। কানু বলে সে-বাড়ির একটি ছেলে ঘাটশিলা যাবার সময় আমায় যথেষ্ট সাহায্য করেচে।

সুপ্রভা এসেছিল। তার পত্র পেয়ে গত সপ্তাহে দেওঘর যাই। কি যত্নই করলে ও। জামারহাতাটা ছিঁড়ে গিয়েছিল—কাছে বসে বসে সেলাই করলে, ওর এ রকম সেবাযত্ন পাওয়ারসুযোগ কখনো ঘটেনি জীবনে।

তারপর ওর কথা বড় মনে হচ্ছে। ক'দিন মনে হচ্ছে। কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে ওর কথাভেবেচি। খুকুর সঙ্গে দেখা হয়নি সেই পুজোর ছুটির পর থেকে—বোধ হয় আর দেখা হবেওনা, কারণ বনগাঁর সঙ্গে আমার কোনো যোগই তো আর রইল না!

এক মাসে আরো কি পরিবর্তন! সুপ্রভাকে কি দুঃখই দিলুম! আজও সে একখানা চিঠি পেয়েচে আমার। তার কথা সর্বদাই মনে হচ্চে। শিলং একবার যেতে হবে শীগ্‌গির। গতসরস্বতী পুজোর দিন ঘাটশিলা গিয়ে তিনু, শান্ত, অমরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে উঠলুমসুবর্ণরেখা পার হয়ে।

ভোরে ডাকলে এসে হরবাবু। তারপর মোটরে আমরা অর্থাৎ বুদ্ধদেব, আমি, রমাপ্রসন্নতিনু বা বাসু গেলুম বনগাঁ। অজিতবাবুর বাড়ি চা খাবার সময়ে S.D.O. ও মুন্সেফ এবং মনোজবসু সেখানে, তারপর ঘেঁটুফুল ফোটা

পথের মধ্যে দিয়ে আমরা বনগাঁ গেলুম। একবার মনে হলআমার বাসা আছে এখানে—জাহ্নবী রান্না করচে, স্নান করে গিয়েই খাব।

বারাকপুর এলুম। পঞ্চবটীতলায় গাড়ি দাঁড়াতেই ফণীকাকা, খাঁদু, হরিপদদা এল। এদের দেখে কষ্ট হয়। কি সংকীর্ণ ক্ষেত্রেই পড়ে রয়েচে! পূর্ণতর জীবন অনুভব করলে না! ফণীকাকা বল্লে—আজ গোপালনগরে বড় মারামারি হবে ভোট নিয়ে—দেখতে যাবে না? As ifIcare for votes! আমার বাড়ি গিয়ে ওরা বসল—তারপর নদীর ধারে যেতে ওরা সব মায়েরকড়াখানা দেখলে। সত্য কি শুভক্ষণে কড়াখানা কেনা হয়েছিল! আজ কত বছর হয়েগেল—কত লোক দেখে গেল ওখানা!

বনসিমতলায় ওরা বসল, আমি ও রমাপ্রসন্ন বনের মধ্যে তেঁতুলতলায় বসলুম। সুপ্রভারপত্রখানা পড়লুম-ইস্টারে শিলং যেতে লিখেচে। সত্যি, কি ভাল মেয়ে ও !

ভূষণ মাঝি ঘাটে নাইচে। স্নানের সময় সাঁতার দিয়ে ওপারে গেলুম। তারপর এলুমবাড়ি, খুকুদের বাড়ির মধ্যে গিয়ে একবার দাঁড়াই। কতবার এমনি ঘেঁটুফুলফোটা চৈত্রদিনে বনগাঁথেকে দুপুর রোদে বারাকপুরে হেঁটে এসে ওকে ডেকেচি ওদের রান্নাঘরে গিয়ে আজ কোথায়কে, সব শূন্য!

ইন্দু এসে গল্প করলে, আমাদের সঙ্গে নদীর ধার পর্যন্ত গেল। তারপর আমরা মোটরে গোপালনগরে এসে দুর্গা ময়রার দোকানে লুচি ভাজিয়ে খেলুম। আজ হাটবার, তবে ভোটের জন্যে অমৃত কাকা, চালকীর বিভূতি সবাই যাচ্ছে। হরিহর সিং তার দোকানে ডাকলে। মনেপড়ল গত জ্যৈষ্ঠ মাসে ভাণ্ডারকোলা থেকে ফিরবার দিনে ওর দোকানে বসেছিলাম, আর বসলুম এই।

তখন বনগাঁ—সেখান থেকে বেনাপোল হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ি। এই ছ'ঘরেরপথেও এই চৈত্র মাসে এই তিনটের সময় কত গিয়েচি। পাটবাড়িতে কতক্ষণ বসে আবারবনগাঁ।

মন্মথবাবুর বাড়ি সেই বিকেলে সেই রকম বসে সুপ্রভাদের গল্প করি। সুপ্রভার প্রশংসাশতমুখে করেও আমি যেন ফুরোতে পারিনে।

পথে বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা রাণাঘাট গেটের কাছে—আমি ডাকলুম, তিনি চাইলেন, কথা হল না। মুন্সেফ সস্ত্রীক মোটরে ফিরে যাচ্চে—চেয়ে হাসলে।

সুপ্রভার পত্রখানা কাল রাত্রে লিখেছিলুম—বনগাঁ থেকে টিকিট কিনে সকালে পোস্টকরেচি ওবেলা।

কাল ইউনিভার্সিটি থেকে কাগজ আনব। সেদিন ইউনিভার্সিটি মিটিং-এ অজয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ হল। প্রমথ, বিজয়, পরিমল, গোপাল হালদার আমরা সব একসঙ্গে বেরিয়ে একটা চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিতে দিতে চা খাই। সেই দিনই রাত ন'টায় কমলরানির নিমন্ত্রণে ওদের সঙ্গে 'বিশ বছর আগে' দেখে এলুম রঙমহলে। মন্মথ রায়ও একদিন 'কুমকুম' দেখবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েচে এই দেড় মাসের মধ্যে। সুপ্রভার সঙ্গে দেখা করতে ইস্টারে শিলং গেলুম। সেখানে জর্জিনা ও সেবা প্রথমে বল্লে, সুপ্রভা ছুটিতে মিরালী চলে গিয়েচে।তারপর হাসতে হাসতে সুপ্রভা এল। ক'দিন খুব বেড়ানো গেল। ওখান থেকে চলে আসারকিছুদিন পরে ঘাটশিলা গেলুম—এবং সেখান থেকে এসে ঢাকা গেলুম রেডিওতে বক্তৃতা দিতে। রত্না দেবীর বাবার বাড়ি গিয়ে উঠলুম। বেশ কাটল সেখানে। ইতিমধ্যে সুপ্রভার বিবাহ হয়ে গেল গত ১৫ই বৈশাখ। আমি গত শনিবারের সাহিত্যবাসর উপলক্ষে মুন্সেফবাবুরবাড়িতে গেলুম। মায়া ও কল্যাণী ছাড়লে —ওদের বাড়িতে রইলুম। রাত্রে ওদের ছাদে গল্প।পরদিন আমাদের পুরোনো বাসায় গেলুম। সেই জানলার ধারে দাঁড়াই। পাঁচী এসেচে, দেখাহল।

আজ দেশ থেকে ফিরলুম। ঘাটশিলা যাব, গ্রীষ্মের ছুটি প্রায় শেষ হয়ে গেল। খুকু বনগাঁয়ে এসেছিল অনেকদিন পরে, ওর সঙ্গে দেখা হল দু'তিনদিনের জন্যে। কল্যাণী খুবসেবাযত্ন করেছিল। গ্রীষ্মের ছুটিটা এবার কি আনন্দেই কাটল! রোজ নদীজলে নাইতে নেমে সেকি আনন্দ! বিশেষ করে একদিন অনেক রাত্রে বনগাঁখুকুদের বাড়ি থেকে ফিরে। আর একদিনকুঠীর মাঠের আঘাটার পাশে নেমে। সেই রকম আম কুড়ুচ্চে পাগলার মা, হাজারী—আজও দেখে এসেচি। এখনো খুব আম। এবার আদৌ বৃষ্টি হয়নি। আজ আষাঢ় মাস, দেশের পথেসর্বত্র ধুলো, খানা-ডোবা সব শুকনো, ভীষণ গরম, এমন কখনো দেখিনি। সুপ্রভা লুকিয়ে পত্রলিখেছিল, বেলেডাঙ্গার আইনদ্দির বাড়ির পিছনে বসে তা পড়েছিলুম—আর চিঠি লিখেছিলজর্জিনা। কাল ন'দি চলে গেল গোপালনগর স্টেশনে কলকাতার গাড়িতে, খুকুর সঙ্গে ওরা যাবেমানকুণ্ডু। কালখুকুও চলে গেল বনগাঁ থেকে। পরশু সাবডেপুটি অজিত বসু, মুন্সেফ হরিবাবু, সবাই গিয়েছিলেন আমার বাড়িতে। আমাদের ভিটেতে গিয়ে মায়ের কড়াখানা দেখলে। তেঁতুল গাছের ওপর আমায় বসিয়ে ফটো নিলে। বাবার স্মৃতিস্তম্ভ সম্বন্ধে কথাবার্তা হল।

কাল সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নালোক বেলেডাঙ্গা থেকে বেড়িয়ে আসবার পর কুঠীর মাঠেরআঘাটায় স্নান করে ফিরচি, আমাদের বাড়ির পেছনের বাঁশবনে কোথাও জ্যোৎস্না, কোথাওজোনাকির ঝাঁক জ্বলচে—থমকে দাঁড়িয়ে রইলুম কতক্ষণ। এক অদৃষ্ট অনুভূতি। আবার যেন আমি বালক হয়ে গিয়েচি, এইমাত্র ভরতদের সঙ্গে সলতেখাগী আমতলাটার ময়না গাছেরধারে আম কুড়িয়ে ফিরচি—সারা গা আমার শৈশবের পরিবেশ অনুযায়ী বদলেচে-জেঠাইমা, সইমা, হরিকাকা—সেই সময়ের মনোভাব—সংকীর্ণতা, দারিদ্র্য, অথচ কি মহার্ঘ্য আনন্দ...তাবর্ণনা করা যায় না—সে এক জগৎ—যেমন এবার আমি বিলবিলের ধারে বসে বসে কত মেয়েদের জলে ওঠা-নামা করতে দেখতুম, ওরা কাপড় কাচছে, বাসন মাজচে, পরস্পরের সঙ্গেগল্প করচে—ওদের এই এক জগৎ...the little pool in the woods-বেশ নামটি দিয়েচিওই বিলবিলের ডোবাটার। ও নিয়ে একটা গল্প লিখব। এরা এই ক্ষুদ্র জগতে সবাই কিন্তু যথেষ্ট সন্তুষ্ট আছে—এর বেশি এরা চায়ও না, বোঝেও না কিছু। পাগলার মা আম কুড়িয়ে সন্তুষ্ট, নেলির মা থালা থালা আমসত্ত্ব দিয়ে সন্তুষ্ট, হরিপদদা গাঁয়ের মোড়লী করে সন্তুষ্ট। এর বেশি এরা কিছু চায় না।

গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হয়ে গেল। কাল ঘাটশিলা থেকে ফিরচি। সঙ্গে ছিল হরিবোলার ছেলে মাদার। ও ফিরে গেল দেশে। ঘাটশিলায় বড় গরম পড়েছিল, দু'দিন কেবল বৃষ্টি হয়েছিল। রোজ বিকেলে বেড়াতে যেতুম গালুডি রোডে সেই শালবনটার মধ্যে, সেখান থেকে বনমাটির পথ যেখান দিয়ে পার হয়ে গেল সেই উঁচু জায়গায়। দূরের দিক্‌চক্রবালে নীল শৈলশ্রেণী মুক্তভূপৃষ্ঠের আভাস এনে মনকে বন্ধনশূন্য করে দিত অপরাহ্ণের ছায়াভরা আকাশতলে, সেখানেবসে বসে সুপ্রভার চিঠি, খুকুর চিঠি পড়তুম। কোথায় রায়গড়, কোথায় মিরালী, সে এখন হয়তো এই বিকেলে বসে চুল বাঁধছে, এমনি সব কত ছবি মনে পড়ত। একদিন খুব ঝড়বৃষ্টিএল, রাস্তার ধারের ছোট্ট সাঁকোর মধ্যে ঢুকে অতি কষ্টে বৃষ্টির ধারা থেকে নিজেকে রক্ষা করি।একে একে দুটি একটি করে কত তারা উঠল অন্ধকার আকাশে—আমি যেন বিরহী তরুণ দেবতা, যুগান্তরের পর্বতশিখরে বসে কত জন্মের প্রণয়িনীর কথা ভাবচি।

কোথায় এক ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর তীরে বনসিমতলার ঘাট, সেখানে যে বালিকা ছিল, সেআর সেভাবে কখনো ও ঘাটে থাকবে না—কত বছর চলে যাবে, বালিকার দেহে নামবে জরা, কতকাল পরে বৃদ্ধা যখন একা একা ঘটি হাতে ঘাটের পাড় বেয়ে উঠবে, তখন সে কি ভাববেতার অতীত কৈশোরের কথা—কত প্রণয়-লীলার স্থান—বনসিমতলার ঘাটটার কথা!

গৌরীর কথা মনে হল। অনেক দূরে আর এক গ্রাম্য নদী, তার ধারে একটা দোতলাবাড়ি—কতকাল আগে সেখানে যে মেয়েটি ছিল, তার দেহের নশ্বর রেণু হয়তো ওইনদীতীরের মৃত্তিকাতেই মিশিয়ে আছে এই কুড়ি বছর। সে জীবনে কিছুই পায়নি—সে বঞ্চিতারকথা আজ এই সন্ধ্যায় বিশেষ করে মনে এল।

আর এক বঞ্চিতা হতভাগী মিনতি। ওকে কখনো চোখে দেখিনি, কিন্তু ওর নাম শুনেচি।ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ওর দুঃখ দূর হোক।

কিন্তু সুপ্রভার দুঃখ কে দূর করবে? তার মন তো সাধারণ মেয়ের মন নয়—সে যেচিরজীবন কাঁদবে, তার কি উপায় করব? ওর জন্যে মন যে কি ব্যাকুল হয়েচে আজ ক'দিনই। নির্জনে বসলেই ওর কথা সারা মন জুড়ে থাকে। ওর সঙ্গে দেখা করাই চাই, মন বড় ব্যাকুলহয়েচে দেখবার জন্যে।

কাল বনগাঁ থেকে এলাম। অজিতবাবুর বদলি উপলক্ষে সাহিত্যসভা ছিল। অজিতবাবুলিখেছিলেন, যাবার সময়ে আসবেন। ক'দিন বেশ কাটল। এবার ওদের পাড়াসুদ্ধ সকলে ডেকে ডেকে আনন্দ করলে, গল্প করলে, সুনীতিদিদি, শুকুর মা সবাই। বাস্তবিক মেয়েরা কি ভাল তাইভাবি! ওদের মধ্যে খারাপও আছে জানি, নিজেই তার অনেক পরিচয় অনেক জায়গায় পাইনিকি আর! কিন্তু ভাল যখন হয় ওরা তখন তার তুলনা পুরুষদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।গৌরী, সুপ্রভা, খুকু, কল্যাণী, অন্নপূর্ণা—এদের প্রত্যেককে আমি জেনেচি—এরা দেবীর মতো।

কি যত্ন-আদর করত সুপ্রভা! তার কথা আজকাল সর্বদা মনে আসে। ভোলা কি যায়? নাতা সম্ভব? এই তো জীবন!

কল্যাণী ছোট মেয়ে অবিশ্যি। কিন্তু সে এরই মধ্যে মেয়েদের স্বাভাবিক সেবা-প্রবৃত্তি আয়ত্ত করে নিয়েছে। ক'দিন বড় যত্ন করলে। বাইরের ঘরটাতে টেবিল-ঢাকা পেতে পরিপাটিকরে পান সেজে, বিছানা করে কেমন করে রাখত! কাছে বসে গল্প শুনতে চাইত। একদিন হঠাৎ'চম্পক জাগো জাগো'গানটার এক কলি গাইতেই আমার শিলং-এর কথা মনে পড়ল। সেই ইস্টারের ছুটি, শিলং, কলেজের হোস্টেলে আমায় নিমন্ত্রণ করেচে—সুপ্রভার অসুখ, তবুও সেউঠে এল, আমি আমার রেডিওর নাটকটা পড়ব জর্জিনা ঘন ঘন ঘরে ঢুকচে, বারহচ্চে—এমন সময় ওরা গ্রামোফোনে রেকর্ড চাপালে, আমার মনের মধ্যে সত্যি কি যেন হয়েগিয়েছিল গানের প্রথম কলিটা শুনেই—'চম্পক জাগো জাগো'। কল্যাণীকে বল্লুম—গানটাশোনাও না। গানটা সে গাইল। আমি বসে বহুদূরের কোন্ পাইনবনের স্বপ্ন দেখতে লাগলুম। সুপ্রভা—পাইনবন, লুম শিলং-এর মেঘাবৃত শিখরদেশ।

কল্যাণী ছেলেমানুষ কিনা, বলচে—আপনি চলে গেলে আমি বিছানা বাইরের ঘর থেকে উঠিয়ে ফেলব। মন কেমন করে, আপনার জায়গায় সেবার ছোট মামাকেও শুতে দিইনি—বলি, ছোট মামা ওঠ, অন্য জায়গায় গিয়ে শোও—এসব আমি তুলব। এই সময় গৌরীকে এনেছিলুমবারাকপুরে ১৯১৮ সালে। কতকাল আগে। সেই বাঁশ-বাগানে নিভৃত সন্ধ্যা নামত, বর্ষার দিনেটিপটিপ বৃষ্টি পড়ত, বেশ মনে আছে। বানের জলে দেশ ভেসেচে, 'রাখাল ছেলে তুই কোথা' গানটা করতুম ইছামতী থেকে স্নান করে উঠে সকালে।

সময়ের দীর্ঘ বীথিপথ বেয়ে কত এল কত গেল! গৌরী...১৯১৮ সালের আষাঢ় মাসেরশেষে তাকে নিয়ে এলুম বারাকপুর। রজনী মামার সঙ্গে বসে তাসখেলা হরিপদ দাসের চণ্ডীমণ্ডপে। "বানের জলে দেশ ভেসেচে রাখাল ছেলে তুই কোথা, রাঘব বোয়াল মাছের সাথেসুখ-দুঃখের কই কথা"—এই গানটা ছিল দিনরাত আমার মুখে। আমাদের পাড়ার ঘাট থেকেসকাল বেলা বর্ষা-স্নাত ঝোপঝাপের পাশ দিয়ে আসতে (যে ঝোপ থেকে এ বছর সুপ্রভারচিঠির জন্যে কত বনমল্লিকা তুলেচি এবং যে ঘাটটার নাম অনেক দিন পরে হয়েছিল বনসিমতলার ঘাট) ওই গানটা গাইতুম।

তারপর সে সব দিন চলে গেল। অনেক মাস কেটে গেল। তারপর আবার বহু লোকেরভিড় গেল লেগে।

কত লোক এল, তাদের কথা মনে হয় আজ। এসেচে, কিন্তু ওদের মধ্যে চলে যায়নিকেউ—আছে সবাই। অন্নপূর্ণা আছে, সুপ্রভা আছে, খুকুআছে। অদ্ভুতভাবে এরা সব এসেছিল।যায়নি কেউই—মন থেকে নয়, বার থেকেও নয়।

১৯৪০ সালে তাই আজ ১৯১৮ সালের কথা ভাবচি। আজ সুপ্রভার পত্র পেলাম। কত ভাল মেয়ে সে, আজও মনে রেখেচে। আর বছরে এ সময়ে মনে বড় কষ্ট ছিল।

জীবনের মাঝে মাঝে এমন কতকগুলি হর্ষোজ্জ্বল, হাসি-অশ্রু-ছলছল দিন আসে, যাদের কথা চিরকাল মনে তো থাকেই, এমন কি একটু নির্জনে একমনে ভাবলে সেদিনের অনুভূতিগুলো পর্যন্ত এমনি আবার যেন আসে—অতি সুস্পষ্টভাবে মনে আসে, যেমনসেদিনের বিস্মৃত গন্ধরাজি আবার আঘ্রাণ করি, আবার সে সব দিনের জীবনের কুশীলবদেরচোখের সামনে দেখতে পাই।

এই রকম দিন আমার জীবনে যেগুলি এসেচে—তা চিন্তা করে দেখলুম কাল বসে।গোলমালে ওদের কথা মনে না থাকলেও দু'দশ বছর অন্তর মনে আসে হঠাৎ। সে সব দিনেরআর একটা মজা আছে, তারা মস্ত বড় আশার বাণী, অজানার আনন্দ নিয়ে আসে—একটা কিছু যেন ঘটবে, দিনগুলি বৃথায় যাবে না—একটা এমন কিছু ঘটবে, যা জীবনে কখনো ঘটেনি—মনে হয়।

তারপর দেখা যায় কিছুই ঘটল না—দিনগুলো চলে গেল, কিন্তু আনন্দ রেখে গেল, স্মৃতিরেখে গেল।

যেমন প্রথম যাত্রার দল আমাদের গায়ে এসেছিল আমার বাল্যকালে, নলে নাপিতেরবাড়ি সন্ধ্যাবেলায় আমায় বলেছিল 'তুমি যাবে খোকা?' সেই সন্ধ্যা, সেই সুশ্রী যাত্রাদলের নটের দল—সে কথা জীবনে আর কখনো ভুললাম না। ভুললাম না মানে ভুলেই তো থাকি, কিন্তুবিশেষ বিশেষ অবস্থায় একমনে বসে ভাবলেই মনে হয়।...

সুরেনের যখন পৈতে হয়, দুধুমামা থাকত, আমি দণ্ডীঘরে গিয়ে সন্ধ্যাসেবাকরতুম—সেই একদিন যুগলকাকাদের বাড়িতে বাল্যে এমন ক'দিন কেটেচে বেশ মনেহয়—সুবাসিনীর সামনে যখন আমি অকারণে ছুটোছুটি করে বেড়াতুম বাল্যে, বকুলতলায় খেলা করতুম, নাগপঞ্চমীর দিন ভরত ও আমি মনসাতলায় গিয়েছিলুম।

তারপর বহুকাল কেটে গেল। আর তেমন কোনো দিনের কথা আমার মনে হয় না। এলগৌরী, ওকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে প্রথম যখন বারাকপুরে আনলুম, আষাঢ় ও প্রথমশ্রাবণের সেই দিনগুলির কথা...রজনীকাকার সঙ্গে তাস খেলতে খেলতে সেই অধীর ভাবেসন্ধ্যার প্রতীক্ষা, টিপটিপ বৃষ্টি পড়চে বাঁশবনে, মাটির প্রদীপের আলোয় আমি ও গৌরী, তখনসে মাত্র চৌদ্দ বছরের বালিকা—এই ছবিটি, দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি, চিরদিন—চিরদিন মনেথাকবে।

সে গেল চলে। দিনগুলি নিরানন্দময় হয়ে গেল, আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই। প্রহরগুলি মৃত।

আনন্দ পেলাম চাটগাঁয় মণিদের বাড়ি গিয়ে। মণির সঙ্গে বসে গল্প করতুম, চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বেড়াতে গেলুম, ওই দিনগুলি।

ওখান থেকে গিয়ে এসে বিভূতিদের বাড়ি এলাম। ও দিনগুলোর মধ্যে আমার মনে আছে, আমার জ্বর হল, কামাই করলাম দিনকতক, গেলাম না—বিভূতিকে ফোন করলাম, ওই একদিন।

ভাগলপুরে এমন অনেকদিন গিয়েচে ইসমাইলপুর দ্বিরায়। পুরোনো কথা ভাবতাম শ্রাবণ মাসে রাসের সময় বড় বাসায় বসে, রঘুনাথবাবুর ঠাকুরবাড়িতে হেমেন রায় এসে নিয়ে গেল, আমি Keith -এর প্রাচীন দিনের মানুষ সম্বন্ধে বইখানা পড়তুম—কিংবা আমি Astronomy পড়তুম ভাদ্র মাসে বাইরের ঘরে শুয়ে, বীরভূমের সেই পণ্ডিতটা এসে গল্প করত—সেই সবদিন ভারি চমৎকার কেটেচে।

একখানা বই হয় এসব দিনের আনন্দের কথা লিখলে—নতুন টেকনিকে, নতুন ভাবে লিখতে হয়—একখানা ভাল উপন্যাস হয়।

তারপর এল খুকু। তার সাহচর্যে যে দিন কেটেচে তার মধ্যে যখন আমি 'আইভ্যানহো' অনুবাদ করছিলুম, শিউলি গাছে ফুল ফুটত—সেই দিনগুলি আর বনগাঁয়ে ছাদে বেড়ানোর দিনটি, আর গত বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে বারাকপুরে গ্রামোফোন নিয়ে কাটানোর দিনগুলির কথাভুললে চলবে না। চিরকাল মনে থাকবে এগুলিও।

সুপ্রভার সঙ্গেও এমন অনেকদিন আনন্দে কেটেচে। বিশেষ করে এবার দেওঘরে ওইস্টারের ছুটিতে শিলং-এ বেড়াতে যাওয়ার দিনগুলি। অনেক দিনের কথা, হয়তো ভুলেযাব—কিন্তু শিলং-এ যাপিত গত ইস্টারের ছুটির দিনগুলোর কথা চিরদিন মনে থাকবে।

আর সর্বশেষে এবার যে অজিতবাবু বনগাঁ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন— কল্যাণীদের বাড়ি রইলাম আমি—কল্যাণীর সেবাযত্ন আমার বড় ভাল লেগেচে, সুপ্রভা ছাড়াঅন্য কোনো মেয়ের মধ্যে এ ধরনের সেবা করার প্রবৃত্তি দেখিনি আমি। কল্যাণী যখনশচীনবাবুদের বাড়ির সামনেপুকুরঘাটে বসে রইল—সে কথাই আমার মনে পড়ে এখনো।

এই তো সবে সেদিন। আর এক সপ্তাহ পুরল। এই দিনটি আবার কতকাল আগেরকার বলে মনে হবে একদিন। একদিনের ডায়েরিটা পড়ে অবাক হয়ে ভাবব সেইদিনের সুপ্রভা, সেদিনের কল্যাণী, সেদিনের খুকু-কতকালের হয়ে গেচে!

বাসা বদলে বহু বছর পরে আবার ৪১, মীর্জাপুর স্ট্রীটের এদিকটাতে এলুম। অনেকদিনআগে এদিকটাতেই ছিলাম—আবার সেদিকেই এলুম। মন কেমন বড় খারাপ হয়ে গেলবিকেলে, অনেক পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে কত পুরোনো কথা সব মনে পড়ল। বাবারজন্য মন যেন কেমন করে উঠল, আর করে উঠল সুপ্রভার জন্যে। বারবেলা ক্লাবে যাবার আগেএই কথা কতবার মনে হল, সুপ্রভা আজ এতক্ষণ আমার চিঠি পেয়েচে।

বনগাঁ থেকে আজই এলুম। এই শ্রাবণ মাস, আজ ১লা, মটরলতা দোলানো খয়রামারিরমাঠের সেই ঝোপটায় অন্য অন্য বছরের মতো কালও বেড়াতে গেলুম। এ বছর সব বদলে গিয়েচে। সুপ্রভা নেই, খুকু নেই, জাহ্নবী নেই, বনগাঁর বাসা নেই, ৪১নং মীর্জাপুর স্ট্রীটের সেমেস নেই।

নাগপঞ্চমীর ছুটিতে সেই শ্রাবণ মাসে বারাকপুর যাওয়া, খুকুদের দাওয়ায় বসে নলেনাপিতের ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণ খাওয়া, খুকুর কত কথাবার্তা—The apple tree, the singing and the gold!—কোথায় কি চলে গিয়েচে!

এবারও কল্যাণী বড় আনন্দ দিয়েচে। দেখ, অদৃষ্টে কি অদ্ভুত যোগাযোগ, এ স্নেহশীলা মেয়েটি আবার কোথা থেকে এসে জুটল বল তো! কোথায় ছিল ও আর বছর এমন সময় ? অথচ এ বছর ওদের বাড়ির সঙ্গে কেমন একটা আত্মীয়তা হয়ে গিয়েচে যেন কতকালেরআলাপ! আমি কলকাতায় আসি-না-আসি তাতে কল্যাণীর কি? অথচ সে আমায় আসতেদেবে না—এই মধুর শাসনটুকুকরত সুপ্রভা, করতখুকু—আবার এ এল কোথা থেকে কেবলবে!

কাল (২৯শে জুলাই) আবার বনগাঁ থেকে এলুম। এবারও ওদের ওখানেই ছিলুম গিয়ে।কল্যাণীর যত্ন সমানই। কাল কিছুতেই আসতে দেবে না কলকাতায়—সোমবার থাকব, মঙ্গলবার থাকতে হবে। বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবার জো নেই—মন্মথদা কিংবা মুন্সেফের বাড়িগিয়ে যে একটু গল্প করব, তাতে ঘোর আপত্তি ওঠাবে।

—গা ছুঁয়ে বলে যান ঠিক সাতটার সময় আসবেন! যদি না আসেন তবে আমি কিন্তুমরে যাব! তাতেই বা কি, আমি মরে গেলেজগতের কার কি ক্ষতি!

মুন্সেফবাবুর বাড়ি গিয়ে দু'বেলা আড্ডা দিই। বার্ণিয়ার সম্বন্ধে অনেক রকম কথা হল।

আবার ১১ই আগস্ট বনগাঁ থেকে এলুম। বেলুর জন্মদিনে নিমন্ত্রণ ছিল, তা ছাড়া ছিলমাসিক সাহিত্য-বাসর। মায়াও ছিল এবার, গল্পে-গুজবে বেশ কাটল। নদীতে ঘোলা এসেচে, এদিন যখন স্নান করতে গেলুম জল খুব ঘোলা।

কল্যাণীর আসবার কথা বলে এলুম কলকাতায়।

কাল শনিবার বারাকপুরে গিয়েছিলুম। আর বছর তো সারা বর্ষাকাল ও শরৎকাল দেশে যাইনি। গোপালনগরের বাজারে প্রথমেই গুটকের সঙ্গে দেখা। শ্যামাচরণদাদা দেখি বাজারেআসচে, তার মুখে শুনলুম কালী এসেচে। ভাদ্র মাসের বৈকাল,শুকনো পথ-ঘাট, বৃষ্টি নেই এবার, আকাশ নীল, গাছপালা ঘন সবুজ। বাড়ি গিয়ে দেখি বলা বোষ্টম আমার ঘরে আশ্রয়নিয়েচে। আমি ইছামতীর ধার গিয়ে কতক্ষণ বসে রইলাম, ঘোলা জল ঘাসভরা মাঠ ছুঁয়েচে।ওপারের মাঠে ষাঁড়া ঝোপে সন্ধ্যার ছায়া নামল, আকাশে কত রকম রঙিন রঙের খেলা দেখাগেল, আমি জলে নেমে স্নান করলাম।

আমাদের বাড়ির পেছনে বাঁশবনে অন্ধকার হয়ে গিয়েচে—পাকা তালের গন্ধ পাওয়াযাচ্চে শ্যামাচরণদাদাদের বাগান থেকে। একটা ভাল পড়ার শব্দ পেলুম। বাড়ি এসে খানিকটাবসে আছি, মনে হচ্চেখুকুযেন এবার এল বিলবিলের ধারের পথটা দিয়ে। এবার ওদিকে বড় বন। সন্ধ্যার পরে খুব জ্যোৎস্না উঠল। এমন পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না শুধু কোজাগরী পূর্ণিমারকথা মনে এনে দেয়, আর মনে আনে খুকুর কথা, ন'দিদিদের বাড়ি থেকে এসে আমার উঠোনে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে গল্প করত। কালী এসেচে। ওদের কথা অনেক কিছু জিগ্যেসকরল।

আজ রবিবার সকালে কালী ও আমি প্রথমে গিয়ে বসলুম বাঁওড়ের ধারে ছুতোরঘাটারবটতলায়। কলকাতা থেকে অনেকদিন পরে গ্রামে গিয়ে বনঝোপ দেখে বাঁচলাম। এ সব নাদেখে আমি থাকতে পারিনে—সকালের বাতাসে নাটাকাঁটা ফুলের, সুগন্ধ, বনটিয়া ডাকচে, কলামোচা পাখি ঝোপের মাথায় খেলা করচে। সইমা যাচ্ছেন নাইতে, আমায় বল্লেন—কবেএলে বিভূতি? তার সঙ্গে গল্প হল খানিকক্ষণ। তারপর আমি আর কালী বেলেডাঙা হয়েমরগাঙের ধারে বাবলাতলায় কতক্ষণ বসলুম, কালী ঘোঙা কুড়োলে, কুঠীর মাঠের জলার ধারেএকটা নিবিড় ঝোপে দু'জনে বসলুম। আর সব জায়গাতেই কলার সঙ্গে সুপ্রভার বিষয়ে অনেকগল্প করলুম। সুপ্রভার বিষয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করলে। সুপ্রভার পত্রখানা পড়চি। একবার, দু'বার, কতবার যে পড়া হল! দুজনে আবার আমাদের ঘাটে নাইতে এলুম, কালী সিট্‌কি জালেচিংড়ি মাছের বাচ্চা ধরলে। আমি যখন রোয়াকে বসে থাকি, তখন যেন আবার মনে হল খুকুআসচে...এখুনি তেলাকুচো ঝোপের আড়ালে গিয়ে শাড়ির আঁচল উড়িয়ে সে আসবে।...

ঘুমিয়ে উঠে বিকেলে কালীর বাড়ি গেলুম। ওরা হাটে গেল, আমি আমাদের ঘাটে এসেবসলুম—ওখান থেকে নৌকো করে কুঠীর মাঠে এসে ঘাসের ওপর বনসিম ঝোপের ছায়ায়বসে সুপ্রভার পত্রখানা আবার পড়ি। সুপ্রভা কোথায় কতদূরে আজ।

কল্যাণী...ওর কথাও মনে হয়। এরা সব চলে গেল, তাই ভগবান যেন এই স্নেহময়ীমেয়েটিকে পাঠিয়ে দিয়েচেন। আবার দু'শনিবার পরে তবে ওর সঙ্গে দেখা হবে। জন্মাষ্টমীরছুটিতে ঘাটশিলা যাব। সুপ্রভাকে লিখেচি সেদিন সেখানে পত্র দিতে।

সন্ধ্যার ট্রেনে চলে আসব। হাট থেকে বৃদ্ধ মুসলমানেরা ফিরচে আমাদের গাঁয়ে। কারোমাথায় ধামা, কারা মাথায় ঝুড়ি। সবাই জিগ্যেস করে—বাবু কবে আলেন? আরামডাঙার আবদুল, নুটুর সয়া—সবাই। গোপালনগর স্টেশনে অনেকক্ষণ বসলুম। কত নক্ষত্র উঠচে—আজ সারাদিন পরিপূর্ণ শরতের রৌদ্র। বনগাঁয়ের কাছে ট্রেন আসতেই কল্যাণীর কথা মনে হল। একবার মনে হল নেমে ওর সঙ্গে দেখা করে কাল ট্রেনে যাব। মেসে এসে সেবার পত্র পেলুম।

এবার ভাল লেগেচে বাঁওড়ের ধারের বটতলায় বসা, কুঠীর মাঠে ছায়াস্নিগ্ধ ঝোপটি, মরগাঙের ধার, এবেলায় বনসিম ঝোপের ছায়ায় ঘাসের মাঠে বসা, সুপ্রভার চিঠি পড়া, কল্যাণীও খুকুর চিন্তা। আর কালকার রাত্রের সেই ফুটফুটে জ্যোৎস্না। কাল কত রাত পর্যন্ত চড়কতলারমাঠে ছিলাম; ফণিকাকা, গজেন, কালো, পাঁচু, ফকিরচাঁদ সবাই গল্প করলুম। কাল রাত্রে জেলেপাড়ায় কৃষ্ণ-যাত্রা হবার কথা ছিল, সকলে জিগ্যেস করচে—কখন বসবে যাত্রা? ক্ষুদ্র জগতের ক্ষুদ্র আমোদ-প্রমোদ। খুব রাত্রে নাকি যাত্রা হয়েছিল—দেখতে পেলে না বলে আজসকালে পিসিমা ও ন'দিদির কি দুঃখ!

খুকুর স্মৃতি সারা বারাকপুরকে, তার মাঠ, ঘাট, নদীর তীর সব আচ্ছন্ন করে রেখেচে—এবার গিয়ে বুঝলুম। নদীর ধারে সুপ্রভার, কারণ চিরকাল নদীর ধারে বসে সুপ্রভারপত্র পড়া আমার অভ্যাস।

অনেকদিন পরে ভাদ্র মাসে বাড়ি গিয়েছিলুম। ভারি আনন্দ নিয়ে ফিরলুম। কালী এসেচে, তাই আরো আনন্দ। সুপ্রভার অমন সুন্দর পত্রখানা সে আনন্দ আরো বাড়িয়ে দিলে। যেপৃথিবীতে সুপ্রভা আছে, সেখানে আমার ভাবনা কি? তারপর কল্যাণী যেখানে আছে, সেখানেইবা ভাবনা কি?

আমি যেটাকে মটরলতা বলতুম, কাল বেলেডাঙা যেতে বটতলার পথে কালী ওটাকেবল্লে—বড় গোয়ালে লতা। কিন্তু বড় গোয়ালে লতার ফল হয় সাদা, আর এক রকমের লতাআছে, খাঁজকাটা আঙুরের পাতার মতো দেখতে, আঙুরের মতোই থোলো বাঁধে।

আমাদের বাড়ির পেছনে বাঁশবাগানটার পথে কাল বিকেলে ঘুম ভেঙে উঠে যাচ্চি, তখনমনে কি এক অদ্ভুত অনুভূতি হল! যেন কি সব শেষ হয়ে গেচে, কি যাচ্চে, এই ধরনের একটাউদাস মনোভাব। প্রতিবারই এই স্থানটি আমাদের মনে অদ্ভুত ভাব জাগায়। বঙ্গবাসীর কথা, বাবার কথা, চীন ভ্রমণের কথা, কত কি মনে আনে। দরিদ্র সংসারে তালের বড়া খাওয়ার দিনসে কি উৎসব...সেও এই ভাদ্র মাসে। পিসিমা কাল তালের বড়া খাইয়েছিলেন কিন্তু।

১৯৩৭ সালেও ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমীতে বাড়ি গিয়েছিলুম, তখনোখুকুগ্রামে ছিল না।

আমাদের গ্রামের ক্ষুদ্র জগৎটাতে ওরা বেশ আছে, কৃষ্ণ-যাত্রা শুনচে, দলাদলি করছে, গোপালনগরে হাট করচে, নদীতে ছিপ নিয়ে মাছ ধরচে, চড়কতলায় বসে রাত্রে আড্ডাদিচ্চে—বেশ আছে।

জন্মাষ্টমীর ছুটিতে ঘাটশিলার বাড়িতে এসেচি। বাড়ি এসেই সুপ্রভার চিঠি পেলাম। কিভাল মেয়ে ও, তাই ভাবি। Always a loyal friend—ভারি আনন্দ হয়েচে ওর চিঠি পেয়ে।পরদিন সকালে উঠে কমলদের বাড়ি গেলুম—কমল মাছের সিঙাড়া ও চা খাওয়ালে। বৈকালেবাঁধের পেছনে শালবনে দিব্যি সবুজ ঘাসের ওপর গিয়ে বসলুম। ঘাসের ফুল ফুটেচে সাদাসাদা—রোদ রাঙা হয়ে আসছে, মিষ্টি শরতের রোদ—মনে পড়ল সুপ্রভার কথা...কত দূরেআছে শিলংএ, কি করচে এখন তাই ভাবি। সুবর্ণরেখার ওপারকার পাহাড়শ্রেণী বড় চমৎকার দেখাচ্চে। আর মনে হল খুকুর কথা, কল্যাণীর কথা। যাদের যাদের ভালবাসি, এ অপূর্বঅপরাহ্ণে সকলের কথাই মনে পড়ে।

রাত্রে ভট্চাজ সাহেবের বাড়ি সভা হল—বউমা, উমা ওরাও গেল। অনেক রাত্রে আবারমোটরেই ফিরে এলুম।

গত রবিবারে ঠিক এই বৈকালবেলা বারাকপুরে—নদীর ধারে বনসিমতলার ঝোপেরছায়ায় বসে সুপ্রভার চিঠি পড়চি, কালীও এসেচে অনেকদিন পরে—ওর সঙ্গে গল্প করচি—সেকথা মনে পড়ল। পরদিন সকালে উঠে আমি বাসাডেরা ম্যাঙ্গানিজ কোম্পানির পথটা দিয়েফুলডুংরির পেছন দিয়ে দূরের পাহাড়শ্রেণীর দিকে চললুম। মেঘান্ধকার সকাল, সজল হাওয়া বইছে, দু'ধারের বন সবুজ হয়ে উঠেছে বর্ষায়, পাথরগুলো কালো দেখাচ্চে গাছপালার তলায়। সেবার যেখানে ভিক্টোরিয়া দত্ত, আমি, নীরদবাবু, সুবর্ণদেবী চা খেয়েছিলুম, সেই উঁচু পাহাড়ের কাটিংটা দিয়ে বড় বড় গাছের তলা দিয়ে সোজা চললুম— দু'ধারে কি নিবিড় বন, পাথরের স্তূপছড়ানো, বড় একটা বটগাছ। এটা

যেখানে নীচু হয়ে গেল, তার বাঁ দিকে একটা নিবিড় কুঞ্জবন ওলতাবিতান—বসবার ইচ্ছে থাকলেও বসতে পারলুম না, বেলা হয়ে গেল। একটা পাহাড়ি ঝরনাপার হয়ে (দু'ধারে কি শোভা সেখানে!) ওপারে গেলুম। বাঁ দিকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটাসুঁড়িপথ ধরে কিছুদূর গিয়েই দেখি সেই ঝরনাটা রাস্তা আটকেচে। আর না গিয়ে সেই ঝরনারধারে যেখান দিয়ে খুব তোড়ে জলটা বইচে কুলুকুল শব্দে—সেখানে জলে পা ডুবিয়ে বসে রইলুম।সুপ্রভার ও কল্যাণীর চিঠি দু'খানা সেই ঘন বনের মধ্যে ঝরনার ধারে জনহীন অরণ্যপ্রকৃতির নীরবতার মধ্যে বসে কতবার পড়ি। হাতির ভয় করছিল বড়। এ সময় বুনো হাতির সময়।

বৃষ্টি এল—একটা পথিক লোক কাছে এসে বসল। ও বল্লে—এখানে হাতির ভয় নেই—তবে সকাল সকাল চলে যান বাবু।

বুরুডির পথ দিয়ে ঘুরে আবার সেই ঝরনাটা পার হয়ে চলে এলুম। একটা ছোট ফর্সামেয়ে কপালে সিঁদুর দিয়েচে—আমি যেমন বললুম "তোর নাম কি খুকি?" অমনি ছুটে পালাল।

আমি কত কি গাছপালার মধ্যে দিয়ে গ্রাম পার হয়ে এসে ম্যাঙ্গানিজ কোম্পানির পথটাধরলুম। বড় বৃষ্টি পড়চে—ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘ ঘুরে ঘুরে উড়ছে পাহাড়ের চূড়ায় নীল বনরেখাকেবেষ্টন করে। বেলা দুটোর সময় ঘাটশিলায় পৌঁছলুম—বউমা ভাত নিয়ে বসে আছেন। আমি তাড়াতাড়ি বাঁধের জলে স্নান সেরে এসে খেয়ে সকলকে উদ্ধার করলুম।

দুপুরে খুব ঘুমোই। তুলসীবাবু মোটর নিয়ে এসে ফিরে গেল। রাত্রে দ্বিজুবাবুর বাড়িনিমন্ত্রণ। অমরবাবু ও বাসার চাকর বিনোদ রাত ১২টায় নাগপুর প্যাসেঞ্জারে উঠিয়ে দিয়েগেল।

অনেককাল আগে এই সময় আমি আজমাবাদের কাছারিতে ছিলুম ভাগলপুরে।

জন্মাষ্টমীর ঠিক তেমনি মেঘান্ধকার সন্ধ্যা—অনেক বছর আগে বারাকপুরের বাড়িতে যে রকম ছিল ১২ ভাদ্র, জন্মাষ্টমীর দিন। মণি চালে প্রদীপ দেখাচ্ছিল, গৌরী আমায় বললে—এসো, এসো, ও কিছু না—কোথায় আজ ওরা সব?

আজ ১২ই ভাদ্র। কতকাল আগে এমনি বেলাটিতে আমি কত আগ্রহের সঙ্গে বাড়িগিয়েছিলুম সে কথা মনে পড়ল। আবার এই সময়ে এমন বর্ষার দিনে আমি আজমাবাদকাছারিতেও ছিলুম। ওই সময় আমি এক পয়সার খড়িমাটি কিনে কত আগ্রহ নিয়ে ট্রেনে চলেচি।

পুজোর ছুটি এসে গেল। মধ্যে G.B.Association থেকে আমায় একটা অভিনন্দনদিলে—পশুপতিবাবু, জ্যোৎস্না, বউমা, শৈলদা, তারাশঙ্কর—আরো অনেকের উপস্থিতিতেঅনুষ্ঠানটি আনন্দময় হয়ে উঠেছিল। এবার বড় লিখবার তাগিদ, কাল রাত্রে একটা গল্প লেখাশেষ হয়েচে—আজ থেকে লেখা বন্ধ। এবার রাঁচি হতে সাহিত্য-সম্মিলনীতে সভাপতিত্বকরবার তাগিদ এসেচে। একবার চাটগাঁ যাবার ইচ্ছেও আছে।

আজকাল শরতের বৈকালে স্কুলের ছাদ থেকে কিংবা পথে যাবার সময়ে দূর আকাশেরদিকে চেয়ে চেয়ে বহুদিন আগেকার বারাকপুরে যাপিত বাল্যদিনগুলির কথা—বিশেষত পুজোরসময়কার কথা মনে পড়ে। বাবার এই সময়ে প্রতি বৎসর জ্বর হত—ঘরে ধুনোর গন্ধ বেরুতোসন্ধ্যার সময়, বাবা জ্বরের ঘোরে অস্ফুট কাতর শব্দ করত—আর আমরা ছেলেমানুষ তখন, ভাবতুম—এবার পুজোর সময়ে আমাদের কাপড় হল না (বালক-বালিকারা বড় স্বার্থপর হয়) মায়ের হাতে একদম টাকাপয়সা থাকত না— ১৯১৩ সালের পুজোর সময় বাবা কলকাতা না কোথায় ছিলেন, এক পয়সাও পাঠাননি, আমাদের সে কি কষ্ট, মা আমাকে তক্তপোশখানার কাছে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাবেলায় কি কথা বলেছিলেন সংসার ও বাবা সম্বন্ধে—সে-সব কথা মনেআসে কেবলই।

সুপ্রভার চিঠি আজও আসেনি, মন সেজন্যে ব্যস্ত আছে। এরকম তো কখনো হয় না !

খুকুর জন্যেও গত এক মাস রোজই ভাবি—হয়তো পুজোর সময় দেখা হবে, নয়তো হবে না—কত ভাবে ওর কথা যে মনে হয়! বারবেলা ক্লাবে অভিনন্দনের দিন গভীর রাত্রেজ্যোৎস্না-মগ্ন ছাদে ওর মুখখানি মনে হয়ে মন কি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারপর মনেহয়েছিল সুপ্রভার কথা—কল্যাণীর কথা।

কি জানি কারো সঙ্গে দেখা হবে কি না! রেণু লিখেচে অবিশ্যি করে যাবার জন্যে এবার।দেখি কি হয়!

পুজো ফুরিয়ে গেল। ঘাটশিলাতে ছিলুম সপ্তমী পর্যন্ত। সেখানে গিয়েই সুপ্রভার হাতের একখানা রুমাল পেলুম। ক'দিন বেশ আনন্দ উপভোগ করা গেল ঘাটশিলায়। তুলসীবাবুর গাড়িতে সপ্তমীর দিন বউমা, নীরদবাবু, রেখা, সুবর্ণদেবী সবাই মিলে মৌভাণ্ডারে আরতিদেখতে যাওয়া গেল। বেশ শীত পড়েছিল সেখানে। বাঁধের পাশে শালবনে বেড়াতেযেতুম—কি চমৎকার লাগত। মহাষ্টমীর দিন দুপুরের গাড়িতে আমি আর কমল কলকাতায়এলুম। গত পূজার কত কথা মনে হয়। জাহ্নবী নেই এ বছর। আর বছর কত প্রসাদ খাওয়া বনগাঁয়ে, ভেবে কি কষ্ট হয়। খুকুর কথাও মনে হয়েছিল সপ্তমীর আরতির সময়—সেদিন দুপুরে গালুডিতে নীরদবাবুর বাড়ির বটতলায় পাথরে ঠেস দিয়ে বসে কেবল সুপ্রভা, সুপ্রভা—ও, কি ভাবেই ওর কথা মনে হয়েছিল সেদিন! সেই দুপুরের রোদে কালাজোরপাহাড়ের দিকে চেয়ে সুপ্রভা-খুকু—এদের কথাই ভেবেচি।

বনগাঁয়ে এসে খুব আমোদ করা গেল। আর বছরের মতো এবারও প্রফুল্লদের বাড়িতেসার্বজনীন পুজো দেখলুম। একদিন বারাকপুরে গেলুম কল্যাণী ও নবু—ওদের নিয়ে। বনসিমতলার ঘাটে ওরা সবাই বনসিমের ফুল তুললে—গান করলে আমার বাড়ি বসে ন'দিদি, মেজখুড়িমার সামনে। তারপর ওরা হরিপদদার বাড়ি গেল। ফিরে এসেই সেদিন আবার বিজয়াসম্মেলন গেল প্রফুল্লর বাড়ি। আজ বনগাঁ থেকে এলুম—রাত্রে চাটগাঁ যাব ময়মনসিং হয়ে। কতকাল ধরে পশ্চিম যাইনি—বারো-তেরো বছর আগে। কেবলই যাচ্চি, অথচ পূর্ব দিকে।

খুকু আসেনি, যদিও আসবার কথা ছিল।

এইমাত্র সকালের ট্রেনে চাটগাঁ থেকে এলাম। ১৯৩৭ সালের পরে আর যাইনি।রত্নাদেবীর স্বামী সমরবাবু ওখানে মুন্সেফ। রেণুরা হয়তো শহরের বাড়িতে নেই ভেবে ওঁরওখানে গিয়ে উঠলুম। প্রকাণ্ড সাততলা বাড়ি—অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায় সাততলার ওপরথেকে-কর্ণফুলির দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। পরদিন সকালে রেণুদের বাড়ি গিয়ে দেখা করলুম। রেণু বল্লে—এইমাত্র আপনার কথা হচ্ছিল। আমার হাতের নখ কেটে দিলে বসে বসে। কতক্ষণধরে কত গল্প হল। সুপ্রভার কথা উঠল—খুকুর কথা উঠল। আসবার দিন ভৈরববাজারে মেঘনানদী পার হবার সময়ে ট্রেনে সুপ্রভার কথা আমার কি ভীষণ ভাবেই মনে এসেছিল। যাবার দিনসব গ্রামের ছায়ায় সুপুরি বনের ছায়ায় কল্যাণীকে কতবার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম। পূর্ববঙ্গেরমেয়েদের সঙ্গে আমার আলাপ কতকাল থেকে—সুপ্রভা, সেবা, রেণু, কল্যাণী, মায়া—সবাই পূর্ববঙ্গের মেয়ে। ওদের টানেই কতবার এখানে এলুম। সারাদিন কল্যাণী আর কল্যাণী...কতগ্রামে ওকে কল্পনা করলুম— বিদ্যাময়ী কলেজের হোস্টেল দেখে মনে হল এখানে ওরা ছিল। রত্নাদেবীর সাততলায় একদিন গানের আসর হল—কোজাগরী পূর্ণিমা সেদিন। গোপালবাবুগান গাইলে—কবীরের ও মীরার ভজন। আমারমনে হল তাদের কথা, যারা আনন্দ চেয়েওপায়নি—কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ পেয়ে তাতেই খুশি হয়ে জীবন কাটিয়ে গেল। জাহ্নবীনবদ্বীপে গিয়েছিল গঙ্গাস্নান করতে, সেকথা—খুকুডাকবাংলোর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল— কল্যাণীরা সেদিন ঘোড়ার গাড়ি করে বারাকপুর বেড়াতে গিয়েছিল—সে সব কথা। চোখে যেনজল এসে পড়ে। আমি ছোটবেলা থেকে কত আনন্দই পেলুম—কিন্তু আমার পরিবারের আরকেউ অত আনন্দ কোনোদিন কল্পনাও করলে না। কক্সবাজারের তরুণী বধূ গাড়িতে যেচে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। আমি তাকে 'মা' বলে ডাকলুম। পূর্ববঙ্গের মেয়ে ভিন্ন এখানে কেউ আলাপ করত না।

রেণু, কল্যাণীওখুকুরসঙ্গে একদিন চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বেড়াতে গেলুম। ওদের সীতাকুণ্ড গ্রামে যে বাড়ি আছে, সেখানে গিয়ে উঠলুম। মধুর মা বলে একজন ব্রাহ্মণ বিধবাআমাদের আদর-যত্ন করলেন। সুপুরির গুঁড়ির সাঁকো

দিয়ে পার হয়ে রেণু ও আমি অতি কষ্টেমধুর মা'র বাড়ি গিয়ে পৌঁছুই। আমি তামাক খাচ্চি হুঁকোয় (মধুর মা সেজে দিল) দেখে রেণু তো হেসেই অস্থির। বুদ্ধু তার ক্যামেরাতে সেই অবস্থায় আমার ফটো নিলে। আরো অনেকফটো নেওয়া হল পাহাড়ে উঠবার পথে। রেণু কেবল বলে—আপনার জন্যে আমার ভয়।আমি বলি—আর কোনো ভয় নেই—চল উঠে। কি সুন্দর দৃশ্য, কি শ্যামল বনানী, বিরাট বনস্পতিদের ভিড়। শম্ভুনাথের মন্দিরের কাছে রেণু, কল্যাণী ওরফে চঞ্চু জল খেয়ে নিল।যেমন আমি বলি চঞ্চু, রেণু অমনি বলে 'বাহির হইল! চঞ্চলা বাহির হইল!' অর্থাৎ আমারগ্রাম্য-জীবনের লেখক হবার সেই আশ্চর্য ঘটনাটির কথা। একটা গাছের ফটো নিতে গিয়েওদের জোঁকে ধরলে। জোঁক অবশ্যি আমাকেও ধরেছিল। আসবার পথে ওরা তেঁতুল পাড়লেএকটা গাছ থেকে—তারপর ওদের বাড়ি এসে সবাই ভাত খাওয়া গেল সন্ধ্যাবেলা। রেণুবল্লে—আপনার সঙ্গে এ সম্পর্ক আর কখনো জীবনে পাব না। কত গল্প করতে করতে রাত্রিন'টার সময় চাটগাঁ এলুম। রত্নাদেবী খাবার করে নিয়ে বসে আছেন—ভাগ্যে আজ সীতাকুণ্ডেথাকিনি!

তার পরদিন। সকালে উঠে কেশব জিনিস নিয়ে স্টেশনে এল। রেণুর বই কেশবেরহাতে দিয়ে দিলুম। চন্দ্রনাথের পাহাড় ধুম স্টেশন থেকে বেঁকে উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে গিয়েচেএকেবারে হিমালয় পর্যন্ত। কি নিবিড় ঘন বনানী পাহাড়ের মাথায়। ওই একটা ভিন্ন জগৎ যেন।ব্রাহ্মণবেড়িয়া স্টেশনে আসবার সময় মনে হল অনেক আগে একবার এ পথে গিয়েছিলুমতখন আমার কি ছিল? এখন কত কে আছে—সুপ্রভা আছে, কল্যাণী আছে, খুকু আছে।ময়মনসিং স্টেশনে আসবার আগে এল বৃষ্টি। আজ কিন্তু ময়মনসিং স্টেশন ছাড়তেই গারো পাহাড় বেশ দেখা গেল—বিদ্যাগঞ্জ বলে একটা স্টেশন থেকে চমৎকার দেখা গেল। স্টিমারেযখন পার হচ্চি, ময়মনসিং জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার পিংনা বলে একটা স্টেশনে এসে স্টিমারদাঁড়াল। আমি কল্পনা করলুম সন্ধ্যায় নেমে আমি অনেকদিন পরে যেন কল্যাণীদের বাড়ি ওরসঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

হরেন ঘোষ আমার সঙ্গে ময়মনসিং স্টেশনে দেখা করলে। আবার বিদ্যাময়ী হোস্টেলটাভাল করে দেখলুম। মায়া ও কল্যাণী এখানে পড়ত। হরেন ঘোষকে রত্নাদেবীর দেওয়া খাবারখাওয়ালুম। সিরাজগঞ্জে ট্রেনে উঠেই শুয়ে পড়লুম। ঘুম ভেঙে একেবারে দেখি ঈশ্বরদি।তারপরই ঘুমিয়ে পড়লুম—দেখি রাণাঘাট। ভোর হবার দেরি নেই। আবার ঘুমিয়ে পড়লুম— দেখি নৈহাটি। দেশে এসে গিয়েচি। স্টিমারে এঞ্জিনের কল প্রতিবারই দেখি—এবারও দেখলুম। পুজোতে খুব বেড়ানো গেল এবার। ঘাটশিলা, বনগাঁ, বারাকপুর, চাঁটগাঁ, ময়মনসিং—বহুজায়গা। কলকাতায় নেমে দেখি শ্রাবণ মাসের মতো মেঘাচ্ছন্ন দিনটা। বৃষ্টিও বেশ নামল দুপুরে।আজই বনগাঁ হয়ে বারাকপুর যাব।

আনন্দের বিষয় এই যে, ১৯১২ সালের ব্রাহ্মণবেড়িয়া হয়ে চাটগাঁ থেকে যখনকলকাতায় ফিরি, তখন আমি ৪১ নং মির্জাপুরের যে দিকের মেসটায় থাকতুম—এবারেওসেইখানে এসে উঠেচি।

আজ স্কুল খুলেচে। বনগাঁ থেকে এলুম। আগের লেখাটা লিখবার পরে বারাকপুরে দু'দিনছিলুম। আমার উঠোনের গাছে খুব শিউলিফুল ফুটেচে। খুকুর কথা কেবলই মনে হল সেখানেগিয়ে। কুঠীর মাঠে যেখানে বসে 'আরণ্যক' লিখতুম, সেখানটাতে বেশ কতক্ষণ কাটালুম।নৌকো করে বিকেলে খুকুর মা'র সঙ্গে বনগাঁ আসবার সময় মনে পড়ল— ১৯৩৯ সালেরআষাঢ় মাসেখুকুর মা, খুকুএবং আমি বনগাঁয়ে এসেছিলুম। কল্যাণীর সঙ্গে দু'দিন কাটিয়েগেলুম ঘাটশিলা। সেখানে এল বিভূতি মুখুজ্যে। তাকে নিয়ে ভট্চাজ সাহেবের মোটরে গালুডি। প্রোফেসর বিশ্বাসের বাড়িতে মেয়েদের পার্টিতে আমাদের নিমন্ত্রণ হল। সেই রাত্রেই রাঁচী রওনা হই বিভূতিকে নিয়ে। মুরী জংশন থেকে রাঁচী যাওয়ার রেলপথের দু'ধারে আরণ্যসৌন্দর্যের তুলনা হয় না। পরদিন রাঁচী থেকে অনেকগুলি মেয়ে ও কলেজের ছেলেদের সঙ্গে হুড্রু ও জোনা জলপ্রপাত দেখতে গেলুম। জোনাতে সন্ধ্যার আগে একখানা পাথরে বসে কতকি ভাবলুম। হুডরুর চেয়ে জোনা ভাল লাগল। কি জনহীন নিস্তব্ধতা চারিদিকের! মেয়েদেরআসতে

দেরি হতে লাগল, আমি ও বিভূতি ঘাসের উপর শতরঞ্চি পেতে শুয়ে রইলুমকতক্ষণ। সুপ্রভা, খুকু,কল্যাণী, গৌরী—সবার কথাই মনে হয়। ওদের সবাইকে আমার প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করি মনে মনে। সুপ্রভার চিঠি পেয়েচি রাঁচী এসেই। জোনাতে সে চিঠিখানা আমার পকেটে। জঙ্গলের মধ্যে বসে কতবার পড়ি। কল্যাণীর চিঠিখানাও। রাঁচী শহরটি বেশসুন্দর। সুনির্মল বসু ওখানে বেড়াতে গিয়েচে, তার সঙ্গে একদিন মাঠের ধারে বেড়াতে গেলুম। রাঁচী থেকে ফিরে ঘাটশিলা এসে দেখি ছোটমামা এবং নুটুর শ্বশুর সেখানে। কমল একদিনবেড়াতে এল। চলে এলুম কলকাতা। সেইদিন ছিল সকালে হাওড়ার পুল খোলা।স্টিমারে গঙ্গা পার হই। ন'টার ট্রেনে মানকুণ্ডু। খুকুআমাকে দেখে কি খুশি। কত গল্প, কত কথা। বাইরেরদরজায় খিল দিয়ে এসে বসল। এতদিন পরে ও স্বীকার করলে, ছাদ থেকে রাঙা গামছা ও-ইউড়িয়েছিল। চেহারা খারাপ হয়ে গেচে। দেখে কষ্ট হল বড়। আসবার সময় বল্লে—চেয়ে দেখলে দেখতে পাবেন আমি জানালায় দাঁড়িয়ে আছি। সত্যি দাঁড়িয়েই রইল। সুপ্রভার কথা কত হল। কল্যাণীর কথাও বল্লুম। সেই দিনই রাত সাড়ে আটটার ট্রেনে বনগাঁ। 'বঙ্গশ্রী'র সুধাংশুযাচ্ছিল, তাকে ডেকে আমার গাড়িতে তুলে নিয়ে গল্প করি আমার ভ্রমণের। বনগাঁ পৌঁছেসুন্দর জ্যোৎস্নার মধ্যে হেঁটে চললুম। বাড়ির সব দরজা বন্ধ করে ওরা ঘুম দিচ্ছে। সুনীতিদেরবাড়ি এসে বসলুম। সুধীরবাবু গিয়ে ডেকে তুল্লে। পরে একদিন কল্যাণীদের সঙ্গে নৌকো করেবারাকপুরে গেলুম পিকনিক করতে। আমাদের পাড়ার ঘাটে বনসিমতলায় কল্যাণী রান্না করলে।গ্রামে ঝি-বউয়েরা আলাপ করতে এল। ওরা আমার বাড়িতে বসে গান করলে। সব এলশুনতে। ইন্দু রায়ের বাড়ি গেল সবাই মিলে। জ্যোৎস্না রাত্রি, বাঁশবনের মাথায় আমাদের বাড়িরপিছনে বৃহস্পতি ও শনি জ্যোৎস্নাভরা আকাশেও যেন জ্বলজ্বল করচে। নৌকো ছাড়লুম। কল্যাণী আমার সঙ্গে বসে গল্প করলে নৌকোর বাইরে বসে। ঘাটবাঁওড়ের এপারেজ্যোৎস্নাভরা মাঠের মধ্যে চা করলে। কি চমৎকার লাগছিল! একটা বড় উল্কা সে সময় বেগনিও নীল রংয়ের আলো জ্বালিয়ে আকাশের জ্যোৎস্নাজাল চিরে প্রজ্বলন্ত হাউইবাজির মতোজ্বলতে জ্বলতে মিলিয়ে গেল!

সুন্দর কাটল এবার পুজোর ছুটি। গাড়িতে গাড়িতে কাটল সারা ছুটিটা। কোথায় চাটগাঁ, কোথায় রাঁচী, আজ ফিরেচি কলকাতায় বরিশাল এক্সপ্রেসে বনগাঁ থেকে।

জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল ওপরের ওটা লিখবার পরে। গত অগ্রহায়ণ মাসে আমি বিবাহ করেচি। সম্প্রতি স্ত্রীকে নিয়ে ঘাটশিলা গিয়েছিলুম। একদিন সুবর্ণরেখা পার হয়েপাহাড়-জঙ্গলের পথে চললুম ওকে নিয়ে। বনের মধ্যে একটা ঝরনা আছে, তার ধারে বড় বড় পাথর পড়ে আছে—এক ধরনের কি ঘাস গজিয়েচে। গোলাপি ফুল (Coclo sperma Govriplum) ফুটেচে তামাপাহাড়ে। দু'জনে একটা পাহাড় ডিঙিয়ে ছোট পাথরে বসলুম ছায়ায়।তারপর ঝরনার জল খেয়ে চললুম পাহাড়ের দিকে। ওপরে যখন উঠেচি, তখন বেলা দুটো। ও গোলগোলি ফুল নিয়ে খোঁপায় পরলে। আমরা নেমে এলুম, তখন বেলা তিনটে।

তারপর শিবরাত্রির ছুটিতে ওকে আনতে গিয়ে বৈকালে দুজনে গেলুম ফুলডুংরিতে।

চারিধারের পাহাড়ের শোভা এই বৈকালে অপূর্ব হয়েচে। অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকার পরেফিরে এলুম।

গত মঙ্গলবারে ওকে নিয়ে বারাকপুরে গিয়েছিলুম। ও মায়ের ভাঙা কড়াখানার ওপরেফুল দিলে, বড় ভাল লাগল আমার। বেশ মেয়ে কল্যাণী।

আমরা কুঠীর মাঠে গিয়ে কুল পাড়লুম সবাই মিলে। গুটকে, ইন্দু রায়, সত্য সবাই ছিল।

সন্ধ্যার সময় চলে এলাম।

কাল ছিল স্কুলের ছুটি। সকাল বেলা বনগাঁ থেকে বেরুলাম আমি, কল্যাণী, বেণু ও বাদু।বসন্তে ঘেঁটুফুল দেখব এই ছিল আশা, প্রথমে গেলুম চাঁপাবেড়ের রাস্তার ধারের পুকুরপাড়ে। সেখান থেকে শুকনো পুকুরটার মধ্যে দিয়ে

আমরা এলাম—গেলুম ওপারে। তারপর গ্রামের পথে একটা তিত্তিরাজ গাছের তলায় ঘেঁটুবনের ধারে চাদর পেতে বসলুম। তিত্তিরাজের ফল পেকে ফেটে আছে গাছে—কেমন গন্ধ।

যেতে যেতে চড়তকলার বনের একটা অংশের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। বেতগাছ ও কয়েকপ্রকার নতুন ধরনের গাছপালা দেখলুম। বাঙালিদের বাড়ি একটা কুল পেড়ে খেলাম। তামাক সেজে দিলে।

তখন বেলা প্রায় ১১টা। ওখান থেকে সোজা হেঁটে এলুম চালকী। পথে কত ঘেঁটুবনেরশোভা—উঁচু পুকুরের পাড়টাতে চালকীতে ছেলেবেলায় যেখানে বসে কলের গান শুনেছিলুম, সেই দালানটা ভাঙা অবস্থায় দেখলুম। মিতেদের বাড়ির ওপর দিয়ে জাহ্নবীর বাড়ি এলুম। জাহ্নবীর ঘরে এসে কল্যাণীকে নিয়ে দাঁড়ালুম। কতদিন পরে আবার দাঁড়ালুম এসে জাহ্নবীরঘরে।

ওরা ডাব খাওয়ালে, ভাত খাওয়ালে। দুপুরের পরে সকলে হেঁটে চলে এলুম বনগাঁ।চাঁপাবেড়ের পথে এল বৃষ্টি। একটা গাছের খোড়লে সবাই ঢুকে বসি। বৃষ্টি গেল কেটে খানিকটাপরে।

বেলা চারটেতে বনগাঁ ফিরি।

কাল জাহ্নবীর বনগাঁর বাসায় গিয়েচি, পাঁচী ডেকে নিয়ে গিয়ে চা করে দিলে, পায়েসখাওয়ালে। অনেকদিন পরে ওদের বাড়িতে গেলুম।

তার আগে মানকুণ্ডু খুকুর সঙ্গে গিয়েছিলুম একদিন। খুকু পুকুরের ধার দিয়ে আমাকেআসতে দেখেই ছুটে এল। ছাড়তে চাইলে না—তখুনি চা করে, খাবার করে খাওয়ালে।

গত রবিবারে বনগ্রাম সাহিত্য-সম্মেলন হয়ে গেল। তার আগের দিন আমি, কল্যাণী, কানু, বেণু সব বেরিয়ে চাঁপবেড়েতে ঘেঁটুফুল দেখতে গেলুম—ওরা সব খাবার তৈরি করেনিয়ে গেল। কি সুন্দর ঘেঁটুফুল ফুটেচে চাঁপাবেড়ের ঘন জঙ্গলের মধ্যে মাঠের ধারে। বিকেল বেলা, আমরা বিলের মধ্যে দিয়ে মাঠের বনের ছায়ায় বসলুম। সবাই মিলে চা ও খাবার খেলুম। ওরা সব ছুটোছুটি করলে। কোকিল ডাকচে বনে, নীল আকাশ, ভারী আনন্দ পেলুমসেদিন। সাহিত্য-সম্মেলন হল তার পরদিন। গজেন, হরিপদদা ও খুকু এল—ওদের চা ও খাবার খেতে দিলুম।

নববর্ষের আজ প্রথম দিন। গত বর্ষে অনেক নতুন ঘটনা ঘটে গেল। সুপ্রভার বিবাহ ওআমার বিবাহ তাদের মধ্যে দুটি প্রধান ঘটনা। পূর্বের জীবন একেবারে বদলে গিয়েচে।

আজ বনগাঁ থেকে এলুম রাত ন'টার ট্রেনে। কাল বারাকপুরে চড়ক দেখতে গিয়েছিলুমঅনেক দিন পরে। আমি, গুটকে ও নদু—তিনজনে যাই। অনেকদিন আগের মতো চড়কতলায় কাদামাটি দেখলুম। শিবের জন্যে ধান ছড়ানো। বাড়ির পেছনে বাঁশতলায় বেড়াতে গিয়ে তেমনি শুকনো ফলের বীজের গন্ধ, পাখির ডাক। তেমনি কোকিল ডাকচে—যেন গোটা জীবনটা সামনে পড়ে আছে মনে হল। বাবা ও মাও যেন আছেন।

বার্নপুরে সাহিত্য-সম্মেলনে ও-সপ্তাহে কল্যাণীকে নিয়ে গিয়েছিলুম। সেখানে একদিনওরা মোটর নিয়ে রতিবাটি কয়লার খাদ দেখাতে নিয়ে গেল আমাদের। জীবনে এই প্রথমকয়লার খাদ দেখা হল; বিভূতি মুখুয্যেও সঙ্গে ছিল।

১লা বৈশাখ খুব ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেল আজ বনগাঁয়ে। দু'টি লোক হাটে গাছচাপা পড়েমারা গেল।

কচা মারা গিয়েচে, বারাকপুরে গিয়ে সকলের মুখে সে বিবরণ শুনলাম। বড়ই শোচনীয়মৃত্যু।

কতদিন পরে আবার দেখলুম চড়ক—সেই কথাই বার বার মনে হচ্চে—এমন ধরনেরলাঠি খেলা সেই দেখতুম বাল্যকালে, আবার কতকাল পরে যেন মনে হলে দেশে আমাদের ঘরবাড়ি ঠিক তেমনি আছে, তেমনি পক্ষী-কাকলী-

মুখরিত, শুকনো ফলের বীজের গন্ধামোদিতআমার বাল্য-দিনগুলি। বাবা যেন এখনো বসে গান গাইচেন আমাদের ঘরের দাওয়ায়—আবারকবে যাত্রা বসবে—সেই আনন্দে দিনরাত চোখে নেই ঘুম।

তার অনেকদিন পরে, মনে আছে যেবার আমি ম্যাট্রিক দিই—সেই শেষবার কাদামাটির সময় চড়কতলার রৌদ্রে ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে থাকি, পরের বছর আসিনি—থার্ড ইয়ারেএসেছিলুম, কিন্তু সে কথা মনে নেই। আজ কত বছর পরে আবার এলুম সেই কাদামাটিদেখতে।

গ্রীষ্মের ছুটির পরে স্কুল খুলেচে। অনেক কিছু ঘটে গেল গ্রীষ্মের ছুটিতে। দার্জিলিংগিয়েছিলুম কল্যাণীকে নিয়ে সেখানে অবজারভেটরি হিল থেকে নামচি—সুপ্রভা ও সেবার সঙ্গে দেখা। সুপ্রভার বাবাও ছিলেন। একদিন ওদের হোটেল গিয়ে চা খাওয়া গেল। তারপর সেদিনই ঘুম থেকে আমি হেঁটে আসচি জলাপাহাড় রোড হয়ে—দেখি নীচে থেকে কেডাকাডাকি করচে। চেয়ে দেখি সেবা ও বিপুল দাঁড়িয়ে। নেমে এলুম। কালিম্পং রোডের মোড়েগাড়ির মধ্যে সুপ্রভা বসে আছে। পান দিলে খেতে। গল্প করে তখনি জলাপাহাড় রোড ধরে চলে এলুম দার্জিলিং-এ। পথের দৃশ্য অপূর্ব। কি হিমারণ্যের শোভা! কত কি ফুল ফুটে রয়েচে!অনেক ফুল তুলে আনলুম কল্যাণীর জন্যে। M.S.M.আপিসে একটি ছেলের সঙ্গে দেখা করলুম, সেদিন ট্রেনে যে সন্দেশ দিয়েছিল কড়াপাকের। কল্যাণী ধর্মশালায় শুয়ে আছে—তাকে নিয়েগিয়ে উঠলুম অকল্যান্ড রোডে। সেখান থেকে দার্জিলিং-এর দৃশ্য কি সুন্দর দেখা যায় বিশেষকরে আলো জ্বলবার দৃশ্য। নামবার দিন তরাই-এর ঘন অন্ধকার অরণ্য ও অসংখ্য জলপ্রপাতআমার মনে পূর্ব-দৃষ্ট কত দৃশ্যকেতুচ্ছ করে দিলে। বনগাঁ এসে একদিন বারাকপুর গিয়েছিলুম। ইন্দুর সঙ্গে নদীর ধারে বসে গল্প করলুম, হাজারি সিংয়ের দোকানে বসে রেজিনা গুহের গল্প হল। হাজারি সিং বল্লে—সে দেখনি তোমরা, সাক্ষাৎ সরস্বতী! অথচ ও কখনো নিজেই দেখেনি। হাডাক্ জিঙ্কের গল্পও হল—যেমনি আজ গত ১৫/১৬ বছর কি তারও বেশি হয়েআসচে। গাড়ি পাঠিয়ে ওঁরা জামাইষষ্ঠীতে নিয়ে গেলেন। তারপর ষষ্ঠীর দিন হঠাৎ প্রশান্ত মহলানবীশ, কাননবালা ও মিসেস মহলানবীশ গেলেন বনগাঁয়ে। সেখান থেকে গেলেনবারাকপুরে। আমার রোয়াকে গিয়ে বসলেন। শ্যামাচরণদা চা ও খাবারের ব্যবস্থা করলে।

আমি আষাঢ় মাসে একদিন গেলুম পাটসিমলে। পথে ভীষণ কাদা—বলদে-ঘোড়ামারিরএক গ্রাম্য পাঠশালায় বসে মৌলবী সাহেবের সঙ্গে গল্প করি। সেখানে জল খেয়ে আবার রওনাহই। একটা বটগাছের তলায় বসি। তারপর আসসিংড়ি গ্রাম ছাড়িয়ে জামদা বিলের আগড়েরসেই শিকড়-তোলা বটগাছটার তলায় গিয়ে বসলুম। পাটসিমলে পৌঁছে পিসিমার মুখে কত পুরোনো কথা শুনি। পেছনের বাঁওড়ে বর্ষার দিনে হিজল গাছের ঘাটে কত তৃপ্তি। সন্ধ্যাবেলা ডাঙা-উঁচু বনের মধ্যে দিয়ে প্যাটাঙির দিকে হাজরাতলার ধারে বেড়াতে গেলুম। সেই জামগাছের শেকড়টাতে বসলুম। তার পরদিন আবার সেই পথেই ফিরি।

ঘাটশিলাতেও গিয়েছিলুম দ্বিজুবাবুর ওখানে, সন্ধ্যায় বসে রোজ গল্প হত। একদিন খুববর্ষা। সন্ধ্যার আগে আমি সুনীলদের বাড়িতে এক স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। ফিরবারসময়ে নদীর ধারের পথ হয়েই ফিরলুম। এক জায়গায় নাবাল জমিতে অনেকখানি জল বেধেছিল। বউমা ও উমাকে নিয়ে একদিন ফুলডুংরির পেছনকার শালবনে বেড়াতেগিয়েছিলাম। কি সুন্দর কুরচি ফুল ফুটেছে বনে। একটা ঝরনা বর্ষার জলে ভরপুর, এঁকেবেঁকেচলেচে বনের মধ্যে দিয়ে। ফুলডুংরি পাহাড়ে প্রায়ই সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতুম। একদিন ঘন বর্ষায় সন্ধ্যার সময় একা কতক্ষণ পাহাড়ের ওপর বসে বসে ভাবলুম। এ ফুলডুংরি কতদিনের। পলাশীর যুদ্ধের দিনেও এমনি ছিল, আকবর যেদিন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখনো এমনিছিল, বুদ্ধদেব যে রাত্রে গৃহত্যাগ করেন তখনো এমনি ছিল, যখন মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পারসভ্যতা বর্তমান, যেদিন সম্রাট তুতেনখামেনের মৃতদেহ সাড়ম্বরে সমাধিস্থ করা হয়েছিল—সেদিনও এই ফুলডুংরি এমনই ছিল, আজ যার ওপর ধলভূম রাজার পার্ক তৈরিহচ্চে।

বনগাঁয়ে এবার খুকুছিল অনেকদিন। সেই ১৯৩৯ সালেরখুকুআর নেই। প্রায়ই সন্ধ্যায়কল্যাণীকে নিয়ে বেড়াতে যেতুম। ও গেল ৪ঠা আষাঢ়, সেদিন কল্যাণীকে সঙ্গে করে ওদেরছাদে বসে গল্পগুজব করা গেল। সন্তুও ছিল, রামদাসের মেয়ে।

খয়রামারি শ্মশানের পাশে মন্মথদা, যতীনদা, বিভূতিকে নিয়ে বিকেলে বেড়াতে যেতুম। ওটা নতুন আবিষ্কার। ইছামতীর জলে স্নান করে কি তৃপ্তিই পেতুম। এবারে কি ভীষণ গরম গেল। নেয়ে তৃপ্তি নেই ঘাটশিলায়। ইছামতীতে সন্ধ্যার সময়েও নাইতুম। শরীর যেন জুড়িয়ে যেত ঘাটশিলার পরে দেশে এসে। ঘাটশিলাতে নাইবার কি কষ্টই গেল ক'দিন। একে গরম, তাতে ভাল করে স্নান করবার মতো পুকুর নেই। দ্বিজুবাবুর পুকুরের ঘোলা জলে একদিন নেয়েছিলুম।

যতীনদাকে গ্রহ-নক্ষত্রের কথা খুব বলতাম। Jean's ও Eddington-এর Astronomy-টা এ ছুটিতে খুব পড়া গিয়েচে ও আলোচনা করাও গিয়েচে। রোজ তিনটের সময় কল্যাণীকে লুকিয়ে ও তার বকুনি সহ্য করেও ওদের আড্ডায় চলে যেতুম। যতীনদা দেখতুম বসে আছে। দু'জনে আরম্ভ করতুম গ্রহ-নক্ষত্রের গল্প। কল্যাণী সন্ধ্যার সময় পারতপক্ষে বেরুতে দিত না। অন্ধকারে পালালে ছুটে গিয়ে ধরে আনত। ছাদে শুতাম প্রায়ইগরমে। মাঝরাত্রিতে দু'জনে নেমে আসতাম। সকালেখুকুর বাড়ি যেতামই।

ভাল কথা, রেণুর সঙ্গেও দেখা হয়েচিল এই ছুটিতে। যেদিন ঘাটশিলা যাই, তার আগের রাত্রে। বিভূতি মুখুজ্যে, মনোজ এবং আমি বনগাঁ এলুম। গোপাল নিয়োগীর বাসায় যেতেফুলির ছেলের সঙ্গে দেখা, সে নিয়ে গেল ওদের বাসায়। সেখানে ফুলির মা'র কাছে রেণুরঠিকানা নিয়ে চলে গেলুম ক্যাম্বেলের সামনে দেখা করতে। রেণুই এসে দোর খুলে দিলে। খুব খুশি আমায় দেখে। সিঁড়ির নীচে পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে গেল। একখানি চিঠিও দিয়েছিল পুরী থেকে—নটু নিয়ে গিয়েছিল ঘাটশিলাতে—বউমা ছিলেন।

চমৎকার গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হল।

দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর বাড়ি আড্ডা দিতে গেলুম সজনী, মোহিতদা, বিভূতি মুখুয্যে ওআমি। কলকাতার রাস্তা-ঘাট অন্ধকার। অনেক রাত পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া করে ফিরলুম। ২৪ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট হিউজেস সাহেবও সেদিন সেখানে ছিল।

আজ একটা স্মরণীয় দিন। বহুকাল পরে আজ আমার বহুকালের পরিচিত আবাস ৪১, মির্জাপুর স্ট্রীটের মেস ছেড়েচি। সেই হরিনাভি স্কুলের থেকে আজ পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯২৩ সাল থেকে ওই মেসটাতে ছিলাম। এতকাল পরে আজ ছেড়ে অন্যত্র আসতে হল, কারণ মেসটা গেল উঠে। বিভূতি, দেবব্রত, খুকু, সুপ্রভা, রেণু—কত লোকের সঙ্গে ও-মেসের স্মৃতি সুখে-দুঃখে ছিল জড়ানো।

গত রবিবার ৬ই জুলাই নড়াইল সাহিত্য-সম্মেলনে আমি ছিলুম সভাপতি—বনগাঁথেকে যতীনদা, মন্মথদা, মিতে এদের নিয়ে গিয়েছিলুম। সিঙ্গে স্টেশনে নেমে একটা দোকানে খাবার তৈরি করতে বলে আমরা ভৈরবের ওপরে কাঠের পুলে গিয়ে বসলুম। জ্যোৎস্না রাত্রি। বাঞ্ছানিধি বলে জনৈক উড়িয়া ওপারে জঙ্গলবাধাল গ্রামে থাকে—সে তার মনিবের কত নিন্দেকরলে। তারপর ময়রার দোকানে এসে লুচি-সন্দেশ খেয়ে একখানা এক ঘোড়ার গাড়িতে এলুমআফ্রার ঘাটে। সেখান থেকে নৌকো করে ক'বন্ধুতে বসে গল্প করতে করতে জ্যোৎস্নারাত্রি ভাল করেই উপভোগ করা গেল। মিতে ও আমি নৌকোর ছই-এর ওপর গিয়ে বসে যতীনদাকে বার বার ডেকে ও ছইয়ের ঘা মেরে তার ঘুমের ব্যাঘাত করছিলাম। ভোরেপিয়ারের খালের ধারে নৌকো লাগল। সেখান থেকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলুমরতনগঞ্জ। একটা দোকানে খেলুম খাবার। তারপর টাকুরে নৌকোতে উঠে, নড়াইল গিয়েঅজিতবাবুর বাসায় হাজির হই বেলা সাড়ে-আটটার মধ্যে। বৈকালে সভা সেরে চা-পার্টিতেস্থানীয় S.D.O. মুন্সেফ প্রভৃতির সঙ্গে গল্প। একটা নাটকাভিনয় দেখতে গেলুম টাউনহলে—তারপর অনেক রাত্রে খেয়ে গোরুর

গাড়িতে রওনা। বেশ জ্যোৎস্নারাত্রি। খুব ঘন ঘনবন, বেতঝোপ পথের ধারে। আবার পিয়েরের খালে নৌকোয় উঠলুম। যতীনদাকে সবাই মিলে উত্ত্যক্ত করে তোলা গেল, কেন অজিতবাবুর সামনে ভাড়া চেয়েছিল, এই কথা বলে। রাত্রেনৌকো থেকে পড়ে যাবার মতো হয়েছিল যতীনদা। ভোরে আফ্রার ঘাট থেকে হেঁটে সিঙ্গে স্টেশন। ওয়েটিংরুমে জিনিসপত্র রেখে স্নান করে নিয়ে চা ও সন্দেশ খাওয়া গেল। বরিশাল এক্সপ্রেসে বনগাঁ এসে নামলাম। কল্যাণী খুব খুশি। আহা, আসবার সময় রসমুণ্ডি নিয়ে আমারহয়ে ঝগড়া করে বকুনি খেলো রেণুখুকুর কাছে। আমায় বল্লে—আমার মরা মুখ দেখবেন, আজযদি যাবেন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব'র মতো চলেই তো আসতে হল!

সামনের রবিবারে নীরদবাবু, সুবর্ণ দেবী, পশুপতিবাবু যাবে মোটরে বনগাঁ picnic করতে—সম্ভবত চালকী বিভূতিদের বাড়ি হবে রান্নাবান্না।

জীবনে আবার কিভাবে কোনদিক থেকে পরিবর্তন হয়ে গেল তাই ভাবি। ৪১, মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে সেই পুরোনো ঘর আমার জন্যে রেখে দিয়ে ওরা আমায় সেখানে নিয়ে যাবারজন্যে ডাকলে—কিন্তু আমার যেতে ইচ্ছে হল না। মেসের মায়া এবার কাটাতে হবে—কল্যাণী খুব ধরেচে এবার ওকে নিয়ে বাসা করতে হবেই। ভেবেচি কলকাতা ছেড়ে বারাকপুরে থাকব। গ্রামের জীবন, ইছামতীর ঘোলা জল, মটরলতার দুলুনি—কতকাল ভোগ করিনি। জীবনেকোনোদিনই গৃহস্থ হয়ে বারাকপুরে থাকিনি। এবার গার্হস্থ্য জীবনযাপন করবার বড় আগ্রহহয়েচে। জীবনে যা কখনো হয়নি—এবার তা করেই দেখি না কেন! মুক্ত ও স্বাধীন জীবনদু'দিন দেখি কাটিয়ে!

কাল রবিবারে নীরদবাবু ও সুবর্ণদেবীরা এলেন বনগাঁ। আমি, কল্যাণী, মায়াদি, বেলুসবাই মোটরে চালকী বিভূতির বাড়ি গিয়ে বসা গেল। ডাব খেলাম। তারপর সুধাংশুদের বাড়ির রান্নাঘরে খিচুড়ি রান্না হল। ইতিমধ্যে যূথিকাদেবী ও পশুপতিবাবু গিয়ে হাজির। সবাইমিলে আনন্দ করে খাওয়া ও গল্প করা গেল। জাহ্নবীর ঘরে ওদের নিয়ে গেলাম—বেচারিজাহ্নবী যদি আজ থাকত! ওর অদৃষ্ট নিয়ে ও এসেছিল—চলে গেল নিজের অদৃষ্ট নিয়েই।

গোপালনগরের হাটে সবার সঙ্গে দেখা। কল্যাণী, মায়াদি, সুবর্ণদেবী সবাই হাট করচে। গজেন, ফণীকাকা, নলে নাপিত, গুটকে, শ্যামাচরণদা সবাই দেখলে। শ্যামাচরণদা সুবর্ণদেবীদেরহাট করে দিলে। আমরা আবার ফিরে এলুম বনগাঁ। সেখান থেকে চা খেয়ে ওরা চলে এল। কল্যাণীকে আজকাল বড় ভাল লাগচে। মঙ্গলবার পর্যন্ত ছাড়ে না—যেমন এসেচি কলকাতায়অমনি এক চিঠি—এ শনিবারে না এলে মরে যাব। বড় ভালবাসে।

আজ একটি মহা স্মরণীয় দিন বাঙালির। সকালে উঠে লেখাপড়া করচি, বিশ্ব বিশ্বাস এসে বল্লে, রবীন্দ্রনাথ আর নেই। শুনেই তখনি রবীন্দ্রনাথের বাড়ি চলে গেলুম। বেজায়ভিড়—ঢোকা যায় না! সেখানে গিয়ে শোনা গেল রবীন্দ্রনাথ মারা যাননি, তবে অবস্থাটাখারাপ। ওখান থেকে এসে স্কুলে গেলুম। স্কুলে শুনলাম তিনি মারা গিয়েছেন ১২টা ১৩ মিনিটের সময়। স্কুল তখুনি বন্ধ হল। আমি ও অবনীবাবু, ক্ষেত্রবাবু, স্কুলের ছেলের দল কলেজস্কোয়ার দিয়ে হেঁটে গিরিশ পার্কের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। কিছুক্ষণ পরে বিরাট শবযাত্রার জনতা আমাদের ঠেলে চলল চিত্তরঞ্জন এভিনিউ বেয়ে। রমেশ সেনের ভাই সুরেশের সঙ্গে আগের দিন প্রমোদবাবুদের বাড়ি দেখা হয়েচিল—আমরা হাওড়া স্টেশনে তুলে দিয়ে যাই নীরদবাবুকে। সে আর আমি কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের মধ্যে দিয়ে সেনেটের সামনে এসে আবারপুষ্পমাল্য শোভিত শবাধারের দর্শন পেলুম। পরলোকগত মহামানবের মুখখানি একবার মাত্রদেখবার সুযোগ পেলুম সেনেটের সামনে। তারপর ট্রেনে চলে এলুম বনগাঁ। শ্রাবণের মেঘনির্মুক্ত নীল আকাশ ও ঘন সবুজ দিগন্তবিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেতের শোভা দেখতে দেখতেকেবলই মনে হচ্ছিল—

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি

নব প্রাতে জাগে নবীন জনম লভি—

অনেক আগে ঠিক এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' পড়তে পড়তে বারাকপুরে ফিরেছিলুম—মায়ের হাতের তালের বড়া খেয়েছিলুম, সে কথা মনে পড়ল।

কল্যাণীকে শবাধারের শ্বেত-পদ্ম দিলুম, সে শুনে খুব দুঃখিত হল। তারপর হরিদারমেয়ের বিয়েতে গেলুম তাঁর বাড়ি। খেতে বসে খুব বৃষ্টি এল।

তারপর ক'দিন ছিলাম বনগাঁ।খুকুএল অসুস্থ অবস্থায়। রাত্রে কল্যাণীকে নিয়ে দেখা করতে গেলুম ওর সঙ্গে। আবার পরদিন নিশিদার বাড়িতে বউভাত তার ছেলের। সেখানেওগেলুম—যাবার আগে খুকুদের বাড়ি গিয়ে গল্প করলুম।

কিন্তু মনে কেমন যেন একটা শূন্যতা—রবীন্দ্রনাথ নেই! একথা যেন ভাবতেও পারাযাচ্ছে না।

গত জন্মাষ্টমীর দিন বিকেলে এখানে এল বিভূতি, মন্মথদা। ওদের নিয়ে প্রথমে গেলাম শিবপুর লাইব্রেরিতে—তারপর রাত ন'টার ট্রেনে রওনা হয়ে নামলাম গালুডিতে। ভোরেরদিকে সুবর্ণরেখার পুল পার হয়ে শাল-জঙ্গলের পথে উঠলুম এসে কারখানার চিমনিটার কাছে।কতকালের পরিত্যক্ত তামার কারখানা—লোকও নেই, জনও নেই। গুররা নদীতে স্নান সেরেসবাই মিলে পিয়ালতলার শিলাখণ্ডে বসে জলযোগ সম্পন্ন করলুম। তারপর তামাপাহাড় পারহয়ে নীলঝরনায় নামলুম। সেখান দিয়ে আসবার পথে একটা ঝরনার জল পান করে আমরা একটা ছোট্ট দোকানে কিছু চিঁড়ে ও চা কিনি। একটি ছোট্ট মেয়ে দোকানে ছিল, সে চা'র জল গরম করে দিলে। তারপর ঘন বনের পথে হেঁটে পাটকিটা গ্রামে পৌঁছে গেলুম। গ্রামের বাইরেযে ছোট্ট ঝরনাটি, সেখানে বসে আমরা কিছু খেয়ে নিলাম। তারপর আবার হেঁটে রানিঝরনারপাহাড় পার হয়ে ওপরে উঠলুম—দূরে সুবর্ণরেখা আবার দেখা যাচ্চে—বেলা তখন তিনটে। মুশাবনী রোডে নেমে কেঁদাড়ি গ্রামে পল্লীকবি বিষ্ণুদাসের বাড়ি এলুম। তারপর চা খেয়েতিনুঝরনা পার হয়ে আমরা সুবর্ণরেখার খেয়াঘাটে ডোঙায় নদী পার হলাম। ভট্টাচার্য সাহেবেরবাংলোয় বসে গল্প করে ঘাটশিলার বাড়ি এলুম।রাত্রে সেখানে বিধায়ক, কমল, অমর প্রভৃতিরসঙ্গে বসে খাওয়া গেল।

পরদিন সকালের ট্রেনে চলে আসি কলকাতায় ও রাত সাড়ে-আটটার ট্রেনে বনগাঁ।কল্যাণীর সঙ্গে ভ্রমণের গল্প করি। খুকুএখানে এসেচে, তার সঙ্গে গিয়ে গল্প করি একদিনকল্যাণীকে নিয়ে ছাদে বসে।

এবার পুজোর ছুটি কাছে এসেচে। কি ভীষণ পরিশ্রম গিয়েচে—গ্রীষ্মের ছুটির পরে এইক'টা মাস—বিশেষ করে গত এক মাস। সর্বদা লেখা আর লেখা!...খেয়ে সুখ নেই বসে সুখনেই। রোজ ভোরে উঠে কলঘরে যাই স্নান করতে, তখন ভাল করে অন্ধকার কাটে না, পাশের বাড়ির আলো জ্বলে—এসে সেই যে লিখতে বসি—একবারে বেলা দশটা। আর তিনটি দিনপরে ছুটি—কালদুপুরের পর থেকে খাটুনির অবসান হয়েচে। সব লেখা দিয়ে দিয়েচি—হাতেআর কোনো কাজ নেই। আজ তো একেবারেই ছুটি। ওবেলা বিদ্যাসাগর কলেজে Study Circle-এ এক বক্তৃতা আছে—তাহলেই হয়ে গেল।

পুজোর পরে ছেড়েই দেব স্কুল। অবকাশ ও অবসরে ভাল ভাবে লেখা যাবে।জীবনটাকে উপভোগ করতে চাই। ঘড়ি-ধরা সময় অনন্তকে কি করেই আটকেচে! বিশ্বেরভাণ্ডারে লক্ষ লক্ষ বৎসরের সময় অতি তুচ্ছ—কিছুই না—আমার মেসের ছোট্ট ঘরটিতেসাড়ে ন'টা যেই বাজল আমার হাতঘড়িতে—অমনি সময় গেল ফুরিয়ে। আমি জীবনে অবকাশভোগ করতে চাই এবার—আর চাই বারাকপুরে ছেলেবেলার মতো বাস করতে দু'দিন। দেখি এসব সম্ভব হয়ে উঠবে কিনা।

বনগাঁ যাইনি অনেকদিন। ও শুক্রবারে যশোরে পূর্ণিমা-সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের শোকসভা ছিল। মনোজ, মহীতোষদা, আমি ও নীরদবাবু গিয়েছিলুম। আমি ও সুরেন ডাক্তারউঠেছিলুম অবিশ্যি বনগাঁ থেকে। সভাতে কল্যাণীর যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার জ্বর হয়েছিলবলে নিয়ে যেতে পারিনি। সভার পরে মণি মুজমদারের বাড়ি

আমরা আহারাদি করলুম ওগিরীনদার সঙ্গে দেখা করে রাত্রের মেলে কলকাতা ফিরি—তারপর আর বনগাঁ যাওয়া ঘটেনি।

পুজো এসে গিয়েচে। কলকাতা থেকে শুক্রবার বনগাঁ থাকি মহালয়ার ছুটিতে—পরেরসোমবারে স্কুল হয়ে পুজোর ছুটি হয়ে যাবে। কল্যাণীকে নিয়ে ঘাটশিলা যাবার ইচ্ছে আছে।

মনে আজ কেমন আনন্দ, এমন ধরনের অপূর্ব আনন্দের দিন জীবনে ক'টাই বা আসে? আজ পুজোর আগে মহালয়ার ছুটি। সোমবার একেবারে ছুটি হচ্ছে পুজোর। অনেকদিন বনগাঁ যাইনি—আজ ও-বেলা যেতে পারব ভেবে অত্যন্ত আনন্দ হচ্চে। গতকাল সকালে যশোর থেকে এসেচি সাহিত্য-সম্মেলন করে—বনগাঁ যখনই ট্রেনখানা গেল তখনই যেন মনে হল নেমে পড়ি। অনেকদিন পরে ইছামতী দেখলুম সেদিন। এমন আনন্দের দিনে পেছনে যদি বহুনিরানন্দপূর্ণ দিন না থাকে, তবে এমন দিন কখনই হতে পারে না। নিরানন্দের কঠিন, ধূসরমরুভূমি পার না হয়ে এলে আনন্দের মরুদ্বীপে পৌঁছুনো যায় না—দস্যুবৃত্তি করে যে আনন্দ লুটতে আসবে—রোজ যারা আনন্দ খুঁজে বেড়ায়... আনন্দ খুঁজে বেড়ানোই যাদেরপেশা—তারা সত্যকার আনন্দ কি বস্তু—তার সন্ধান রাখে না। আনন্দের পেছনে আছে সংযম, ভোগের অভাব, আনন্দের দৈন্য—এসব অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলে এসে তবে প্রকৃত আনন্দরসের সন্ধান মেলে। আমি জীবনে অনেকবার এ ধরনের আনন্দভরা দিনের আস্বাদ করেচি—যেমন একদিন জাঙ্গিপাড়ায়—যখন বিজয় জ্যোৎস্নারাত্রে একটা হেনাফুলের ডালহাতে নিয়ে দেখা করলে—তারপর ইসমাইলপুরে সেই অপূর্ব আনন্দের দিন—অনেককাল পরেযখন কলকাতায় আসব সদরের হুকুম পেলুম—সেই বাঁকে সিং, সেই দিগন্তবিস্তীর্ণ কাশবনেরপ্রান্তে আমাদের খড়ের কাছারি ঘর!

এখনো চোখের সামনে দেখচি।

অবকাশ পেলে ইসমাইলপুর অঞ্চলে একবার যেতে হবে—এ বছরই যাব ভেবেচি।

পুজোর ছুটি হল আজ—আজই বনগাঁ থেকে এসেচি-কল্যাণীর মনে দুঃখ হয়েচে হয়তো। কাল সে বলেছিল, যাবেন না খয়রামারি বেড়াতে বিকেলে, কিছুতেই যাবেন না। 'যেতেনাহি দিব'—কিন্তু ও বলে ছোট মেয়ের মতো জোর করে, আমি ওর কোনো কথাই রাখিনে, ওর কথা ঠেলে জোর করে চলে যাই। ও আবার বলে তবুও, বোঝে না যে ওর কথা রাখচিনে—অন্য মেয়ে হলে অভিমান করে আর বলে না। কিন্তু রোজই বলে, রোজই কথা অবহেলা করি—অথচ ও বলতে ছাড়ে না একদিনও—সেই পুরোনো সুরে 'যেতে নাহি দিব'-ও বড় সরলা! অমন সরলা মেয়ে আমি কোথাও দেখিনি।

আজ ছুটি হলে শুনলুম স্কুলে শারদীয় উৎসব হবে। কিন্তু সে উৎসবে আমি থাকতে পারিনি—বড় দেরি হয়ে গেল বলে যোগ দিতে পারলুম না।

এলুম এম. সি. সরকার, মিত্র ও ঘোষ, 'দেশ' আপিস, ফুলুর মায়ের বাড়ি, ক্ষিতীশভট্চাজের 'মাসপয়লা' আপিস ও তারপর বাসা।

কল্যাণীর কথা কিন্তু বড় মনে হচ্ছে আজ সারাদিন। তার চোখে জল দেখে এসেচি ভোরবেলা।

বারাকপুরে গ্রাম্যজীবন কিছুদিনের জন্যে যাপন করবার বড় ইচ্ছে—কতদিন যে এ ধরনের জীবন কাটাইনি—মাটির সঙ্গে যোগ রেখে...গ্রাম্য গৃহস্থ সেজে। আবার সেই শৈশবের জগৎটা আবিষ্কার করব—এই মনে আকাঙ্ক্ষা। আমাদের বাড়ির পেছনে বাঁশবনে, এইশরৎকালের দুপুরে গাছপালায়, ঘুঘুর ডাকে কি যেন মায়া মেশানো ছিল—বনভূমি যেন স্বপ্নমাখা, ১৯৩৪ সালের দোলের সময়েও আমি তেমনি স্বপ্নমাখা দেখেচি বনভূমিকে—মাত্রসাত বছর আগে। কিন্তু শহরের কলকোলাহলময় ব্যস্তসমস্ত জীবনযাত্রার মধ্যে যে স্মৃতি আমারমনে ক্ষীণ হয়ে আসচে, যে

জীবনকে ভুলে যাচ্ছি, আবার সে জীবনকে আস্বাদ করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়েচি—অন্তত কিছুদিনের জন্যও আমায় তা করতে হবে। অন্য লোকে সে কথা কিবুঝবে?

কল্যাণী কাল বলছিল আর বছরের মতো—আমার গা ছুঁয়ে বলে যান, আধ ঘণ্টার মধ্যেআসবেন!

তা এলুম না। ওর মনে দুঃখ হল। গা ছুঁয়ে বল্লে তাই যদি না করা যায়, তবে মানুষ মরেযায়, জানেন? এও আপনি করলেন! লোকের জীবন-মরণটাও দেখলেন না? এই সন্ধ্যায় সেকথাভেবে মনে কষ্ট হচ্ছে—ওর কথাটা শুনলেই হোত ছাই! মিথ্যে ওর মনে কেন কষ্ট দেওয়া ?

ওর তরুণ মনের স্নেহ ও আগ্রহকে বার বার করে ঠেলে গেলাম অবহেলায়—তবুও ওবোঝে না, মনে কিছু ভাবে না—আবার সেই রকমই বলে।

কাছের মসজিদে আজান দিচ্ছে। ক'দিন খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে আজানের শব্দ শুনে ভাবলুম—এবার রাত ভোর হয়ে এসেচে। আর সে কি আনন্দ! সেই নীচের কলতলায় গিয়েস্নান করে আসব।

পুজোর ছুটি আজ শেষ হয়ে স্কুল খুলেচে। আজ এসেচি বনগাঁ থেকে। পরশু ঘাটশিলা থেকে যাই বারাকপুরে। মহাষ্টমীর দিন কল্যাণীকে নিয়ে ঘাটশিলা যাব পূর্ব থেকেই ঠিক ছিল—সপ্তমীর দিন নকফুলে জয়গোপাল চক্রবর্তীর বাড়ি নিমন্ত্রণ খেয়ে এসে পরদিন সকালেইরওনা। শেষরাত্রে ঘাটশিলা পৌঁছব। মেসে ওকে নিয়ে এসে দেখি দার্জিলিং-এ দেখা সেইছেলেটি ও স্কুলের দু'টি ছাত্র উপস্থিত। ওদের সাথে গল্পগুজব করে কেটে গেল সময়টা। তারপর রমাপ্রসন্নের বাড়ি নিয়ে গেলুম। তারা জলটল খাওয়ালে। ফিরেই হাওড়া স্টেশনে গিয়েখানিকটা অপেক্ষা করার পরে নাগপুর প্যাসেঞ্জার ধরলুম। মিতে আছে ওখানে—শেষরাত্রেআমরা ঘাটশিলা পৌঁছুতেই সে তামাক সেজে নিয়ে এল। তারপর ভোর হতেই বেড়াতে বেরুইআমরা।

গালুডিতে দ্বিজুবাবুর সঙ্গে হেঁটে যাবার দিন যথেষ্ট আমোদ পেয়েছিলাম—আর আমোদ পেয়েছিলাম নোয়ামুণ্ডি লাইনে বেড়াতে যাবার দিন। গালুডিতে কোজাগরী পূর্ণিমার দিন নীরদবাবু, মিস্ দাস, প্রোফেসর বিশ্বাস সবাই মিলে রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' অভিনয় হল। তারপর ঘাটশিলার ভট্চাজ সাহেবের বাড়িতে একদিন পার্টি উপলক্ষে আমরা নিমন্ত্রিত ছিলাম—সেদিনও খুব আনন্দ করা গেল।

নোয়ামুণ্ডি যাবার দিন ভোররাত্রে নাগপুর প্যাসেঞ্জার ধরে মিতে ও আমি ঘাটশিলা থেকেপ্রথমে যাই টাটা। সেখান থেকে একখানা Special Train ধরে চাঁইবাসা। চাঁইবাসা বেশ সুন্দরজায়গা—অনেক এ্যাকাসিয়া গাছ রাস্তার দু'ধারে। বাজারে বড় বড় আতা বিক্রি হচ্ছে, আমরা দু'তিন পয়সার আতা কিনে রাস্তার সাঁকোতে বসে পেট ভরে খেলুম—তারপর রেল লাইন ধরেস্টেশনে হাজির। ঝিনকিপানি স্টেশনে থৈ থৈ করচে মুক্ত দিগন্ত—অমনমুক্তরূপা ভূমিশ্রী আমি বড় ভালবাসি—বেশি দেখিনি অমন দৃশ্য—এটা নিশ্চয়ই। কেন্দপোসি ছাড়িয়ে দু'ধারে বিজন অরণ্যভূমি, বনে সহস্র টগর (micalia champak) ফুলের গাছ—আর শেফালী—কিএকটা ফুলের ঘন সুগন্ধে ত্রিশ মাইল দীর্ঘ রাস্তার প্রতি মুহূর্তটি রেলের কামরা আমোদ করে রেখেচে। নোয়ামুণ্ডি ছাড়িয়ে বন আরো বেশি— সত্যিই সে বনের শোভা ও গাম্ভীর্য মনে অন্য ভাব জাগায়—তা শুধু কমনীয় সৌন্দর্যের ভাব নয়—যা জাগায় বাংলাদেশের বনঝোপ, সে যেন চৌতালের ধ্রুপদ—মনে গম্ভীর ভাব জাগায়। ফিল্মের অভিনেত্রীর হালকা প্রেমের মিষ্টি সুরের গান নয়—ফৈয়াজ খাঁর মালকোষ কিংবা পুরিয়া। গাম্ভীর্য আছে, উদাত্ত ভাব জাগায়—অথচ মিষ্টত্ব বলতে সাধারণত লোকে যা বোঝে তা কম।

যখন ফিরি তখন চারিধারে লৌহ-প্রস্তরের ছড়াছড়ি দেখে ভগবান সম্বন্ধে বড় একটাঅদ্ভুত ভাব মনে এসেচিল—পদার্থ, নক্ষত্রজগৎ, বিশ্বের বিরাটত্ব প্রভৃতি নিয়ে। জঙ্গলেরমাথায় পশ্চিম আকাশে শুকতারা, মাঝ-আকাশে বৃহস্পতি। রাত ১২টার ট্রেনে ঘাটশিলা এসে নামলুম।

তারপর আর একদিন গালুডি যেতে হল নীরদবাবুর গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে। সেদিন মিতে, মিতের স্ত্রী, বউমা, কল্যাণী সবাই গিয়েছিল। পশুপতিবাবুর স্ত্রীকে সেখানে দেখলাম। খুবখাওয়া-দাওয়া হল।

আসবার আগের দিন সৌরীনমুখুয্যের ভাইপো এসে বল্লে—ধারাগিরি আমরা যাবকিনা। আমি ফুলডুংরি পাহাড়ের কোলে গালুডি রোডের ধারে যে আম গাছ, ওখানে বসে রইলুম—ছেলেটি এসে আমায় খবর দিলে। গাড়ি ঠিক হয়ে গেল। পরদিন সকালে আমরাতিনখানা গাড়ি করে সবাই মিলে (বউমা ওনুটুতখন ওখানে নেই) রওনা হই। ধারাগিরির পথের শোভা, বিশেষত পাশটার শোভা দেখে আমার দার্জিলিং অকল্যান্ড রোডের কথা মনেপড়ল। তবে অকল্যান্ড রোড শহরের মধ্যে—আর এর চারিধারে শ্বাপদ অধ্যুষিত বিজনঅরণ্যভূমি—এই যা পার্থক্য। সেখানে ঝরনার ধারে বসে কল্যাণী যখন রান্না করছে তখনআমি 'পথের দাবী' পড়চি। ভাবতে আশ্চর্য লাগল যে গত ১৯২৬ সালে ভাগলপুরে থাকতেসুরেন গাঙ্গুলীর পল্লীভবনে বসে আমি প্রথম 'পথের দাবী' পড়ি। সেও বিহারে, এবারওপড়লাম বিহারে। তখন এও জানতুম না আমায় আবার বিয়ে করতে হবে। জীবনের জটিলরহস্যের সন্ধান কে কবে দিতে পেরেচে?

খাওয়া-দাওয়ার পরে কল্যাণী, উমা, আমি ও সৌরীনবাবুর ভাইপো পাহাড়ে উঠেধারাগিরি ঝরনার ওপরের অংশে গিয়ে কতক্ষণ বসলুম। ফিরবার পথে শালবনে কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠল!

গত সোমবারে ওখান থেকে দুপুরের ট্রেনে রওনা হয়ে মেসে এলুম সন্ধ্যার সময়।নাকি জগদ্ধাত্রী পূজার দু'দিন বন্ধ। সময় নষ্ট করি কেন? তখুনি ট্রেনের খোঁজে শেয়ালদ' গিয়ে দেখি সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ছাড়ছে। তাতে উঠে চলে গেলুম রাণাঘাট—খিনুদের বাড়ি গিয়েউঠি। তারা চা খাওয়ালে। খিনু অনেকক্ষণ গল্প করলে। পরদিন ভোরের ট্রেনে গোপালনগরেএসে নামলুম—নিজের দেশের মাটিতে পা দিতেই যেন শরীর শিউরে উঠল। সেই আবাল্যপরিচিত প্রথম কার্তিকের বনঝোপের সুগন্ধ, বনমরচে লতায় থোকা থোকা ফুল ফোটা, সেই স্নিগ্ধ হেমন্তের ছায়া। গোপালনগর বাজারে রায়সাহেব হাজারি প্রথমে ডাক দিলে, তারপরপাঁচু পরামাণিকের দোকানে সেই কুণ্ডুমশায়—যুগল ময়রার দোকানে বসে টাটকা তেলেভাজা, কচুরী কিনে খেলুম—বিষ্ণু জল দিলে খেতে। বাড়ি আসতে আটটা বেজে গেল। বুড়ি পিসিমার বাড়ি ন'দি বসে গল্প করছে—ওদের দাওয়ায় গিয়ে বসি—ঘাটশিলা ও কল্যাণীরপাহাড়ে ওঠার গল্প হয়। নদীতে স্নান করতে গিয়ে স্নিগ্ধ নদীজলের স্নেহস্পর্শে যেন সারাশরীর জুড়িয়ে গেল। নদীর তীরে বনঝোপের কি মায়া, বনসিমতলার ঝোপের কি ঘন ছায়া, থোকা থোকা বেগুনি রংয়ের বনসিমলতার ফুল ফুটেচে—বনমরচে ফুলের সুবাস সর্বত্র। মনভরে গেল আনন্দে, এমন আনন্দ আর কোথাও পাইনি মুক্তকণ্ঠে তা স্বীকার করি। বাল্যেরকত স্মৃতি মিশিয়ে আছে এই সুবাসের সঙ্গে—তা কত গভীর, কত করুণ! জিতেন কামারেরবাড়িতে সুরপতি মিস্ত্রী রোয়াক গাঁথচে—সেখানে ইন্দু রায় নিয়ে গিয়ে বসালে পরদিনসকালে। মুচকুন্দ চাঁপার তলায় পতিত, গজেন, মনো রায়, ফণিকাকা মিটিং বসিয়েছে।সেখানে এল হাজারি ঘোষের জামাই লালমোহন। তার সঙ্গে ওরা স্কুলের মাস্টার বরখাস্ত করা নিয়ে বাধালে ঝগড়া। আমি সরে পড়লুম বেগতিক দেখে। বৈকালে নৌকোয় গুটকে ও আমি বনগাঁ এলুম—যেন জাহ্নবীর বাসা এখনো আছে—ছুটির পরে সেখানে যাচ্ছি।লিচুতলায় এসে মনোজ, জয়কৃষ্ণ, যতীনদার সঙ্গে বসে ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনা করি। বিকেলেশুধু ছিলুম সরোজ ও আমি, মন্মথদাও। 'সন্ধ্যাবেলায়' গোপালদা, যতীনদা, জয়কৃষ্ণ, মনোজ, মন্মথদা ও বিনয়দা। খুব জ্যোৎস্না। কাল গেল জগদ্ধাত্রী পূজা। আজ সকালে বরিশালএক্সপ্রেসে কলকাতা এসেচি। আজ বৃহস্পতিবার, এইমাত্র বারবেলা থেকে এলুম—আর কেউছিল না, রাম, বুদ্ধদেববাবু ও আমি।

এইমাত্র ঘাটশিলা থেকে এলুম ফিরে। গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে বারাকপুরগিয়েছিলুম আবার।ফুচুস্টেশনে এসেচিল—ছ'টা ডিম নিয়ে রাঁধতে দিলুম মানুকে বাড়ি পৌঁছে। খুব জ্যোৎস্না। পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

কুঠীর মাঠে বেড়িয়ে এসে ন'দির সঙ্গে একটু বসে গল্প করি। শিউলি ফুলের সুবাসেরসঙ্গে বনমরচে ফুলের গন্ধ মিশিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রি মধুর করে তুলেচে শত অতীত স্মৃতির পুনরুদ্বোধনে। ফণী রায়ের পরিবারবর্গ থাকে বন্ধুদের বাড়ি। কতদিন পরে ওদের বাড়ি বসে চাখেলুম। তারপর গদা কামারের বাড়ি গিয়ে ইন্দু, গজেন, অমূল্য কামার প্রভৃতির সঙ্গে গান করিও শুনি। পরদিন সকালে হয়তো বনগাঁ থেকে সবাই পিকনিক করতে আসবে। ন'দি ও বুড়িপিসিমার সঙ্গে গল্প করি মানুদের দাওয়ায়। পরদিন সকালে এল খোকা ও সুরেন। স্নান সেরে বনমরচে ফুলের সুগন্ধের মধ্যে রইলুম বসে কতক্ষণ। তারপর চলে আসি বনগাঁ।

শুক্রবার মন্মথদার বাড়িতে আড্ডা।

আজ ফিরচি ঘাটশিলা থেকে এইমাত্র। গত রবিবারে আবার ধারাগিরি গিয়েছিলুমমিতেরা ও আমরা। এবার pass-এর নীচে সেই খরস্রোতার খাদ থেকে কুলুকুলুনদীজলেরসঙ্গীত আমাদের কানে মধু বর্ষণ করলে। বন্য পিটুলিরা, শিউলি—আরো কত কি বন্য ফুল ফুটেচে বনে। ধারাগিরি যাওয়ার পথে গ্রাম ঝরনার কাছে আমরা চা খাচ্চি বসে—এমন সময় নুটু আর সুরেশ সাইকেলে করে এসে যোগ দিলে আমাদের সঙ্গে। তারপর ধারাগিরি পৌঁছে কল্যাণী, মিতের বউ ওরা চড়ালে খিচুড়ি—আমরা উঠলুম পাহাড়ে—মিতে ও আমি। ওপরেরসেই দুরারোহ পথ ধরে আমরা গেলুম ধারাগিরির স্রোত ধরে আরো নিবিড় বনের মধ্যে। বড় বড় শাল, আম ও মোটা মোটা লতা-বন্য বিহঙ্গের কাকলি এখানে অপূর্ব। মিতে একমনেশুনতে লাগল। কত বন্য কুসুমের সৌরভ—আর সর্বোপরি অসীম নিস্তব্ধতা। সোরু-ঝরনার শিখা-নৃত্য—জ্যোৎস্নারাত্রে শিলাখণ্ডে ময়ুর-ময়ূরীর নৃত্যের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বনদেবীরাবাস করেন এ বনে। এসে খিচুড়ি খাওয়ার পূর্বে ঝরনায় স্নান সমাপন করি। তারপর খাওয়া সেরে গরুর গাড়িতে রওনা। আবার সেই ঘাটটা সন্ধ্যার ছায়ায় অতিক্রম করি। ঘন বন নীচে, হাতি তাড়াবার জন্যে স্থানে স্থানে গাছের ওপরে মাচা। ভাত রেঁধে খাচ্চে বনের মধ্যে। আমরাআগে আগে—মিতেদের গাড়ি পিছনে। মিতে সকলের পেছনে হেঁটে আসচে। কল্যাণীর সঙ্গেআমি আসচি। নুটু ও সুরেশ সাইকেলে সবার পেছনে। দ্বিতীয় ঝরনা পার হতে সন্ধ্যা হয়েগেল। ক্রমে নক্ষত্র উঠল—ছায়াপথ জম্‌জম্‌ করতে লাগল। এখানে ওখানে উল্কা খসে পড়তেলাগল। রাত ন'টায় আমরা বাড়ি ফিরে ওবেলার রান্না খিচুড়ি খাই। উমা ও শান্ত এবার যায়নি।

মধ্যে আবার ঘাটশিলা গিয়েছিলুম। সাদা পাথরের স্তূপটার ওপর বসে কল্যাণীকে নিয়েগল্প করেছিলুম জ্যোৎস্নারাত্রে। তবে এবার বিশেষ দূর কোথাও বেড়ানো হয়নি মিতের সঙ্গে ফুলডুংরির নীচের বনটায় একদিন সন্ধ্যাবেলা গিয়ে বসেছিলুম। গত সপ্তাহে গিয়েছিলুমবনগাঁ, বাড়ি বদল করে আমরা গিয়েচি বিনয়দার শ্বশুর নুটুমুন্সেফ যে বাসায় থাকত—সেইবাসাটায়।

কাল রাত্রে শৈলজার 'নন্দিনী' বইখানা দেখে এলাম। বাঙালির মনে যে কান্নার ফোয়ারা যোগাতে পারবে, সেই হাততালি পাবে। এ ছবিখানাতেও অনেকদিন পরে পুনর্মিলনের প্যাঁচকষে দর্শকের চোখে জল আনার যথেষ্ট সুব্যবস্থা। তবে অনেকটা স্বাভাবিক হয়েচে ছবিখানা, এটা বলতেই হবে। কথাবার্তাও স্বাভাবিক। সুকৃতি ও আমি গিয়েছিলাম 'রূপবাণীতে', শৈলজা আমাদের ফার্স্ট ক্লাসে বসিয়ে দিলে, গল্প করলে অনেকক্ষণ কাছে বসে। ছবি ভাঙলে বাসেচলে এলুম। মিতে কাল বিকেলে এসেছিল, আজ ঘাটশিলা এতক্ষণ গিয়ে পৌঁছেচে।

আজ কোনো কাজ ছিল না, ওবেলা বসে বসে পরীক্ষার কাগজগুলো দেখলুম স্কুলের (Class) ছেলেদের—তারপর রমাপ্রসন্নের বাড়ি বসে খুব আড্ডা দেওয়া গেল গৌর পালেরসঙ্গে। স্কুল ও কলকাতা দুইই ছাড়ব শিগ্‌গির। যেখানে যা আগে আগে করতাম তা আর একবার ঝালিয়ে নিচ্ছি। যেমন, আজ এবেলা গেলুম সাঁতরাগাছি ননীর বাড়ি, জতু নেই, তার মা'র সঙ্গে বার হয়ে গিয়েচে। ননীর কাছে বসে বসে ঘাটশিলা ও কল্যাণীর গল্প করলুম, ধারাগিরির বর্ণনা করলুম—মাস্টারমশাইও ছিলেন। তিনি আবার কোথায় যাত্রা হচ্ছে বলেউঠেচলে গেলেন—আমরা

বসে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করি, কল্যাণীর চিঠি ওকে পড়িয়েশোনাতে হল। ননী বড় প্রকৃতিরসিক, বল্লে—আমি ঘাটশিলা যাব বেড়াতে। আমি ওকে যেতে বলেচি।

একটা নতুন জীবনের শুরু। এখনো চাকরিতে আছি, কিন্তু ১লা জানুয়ারি ১৯৪২থেকে চাকরি ছেড়ে দেব। সেটা কাগজেকলমে অবিশ্যি, আসলে ছেড়েই দিয়েচি। বেশ স্বাধীনজীবনের আস্বাদ এখন থেকেই পাচ্চি। ঘাটশিলাতে এসেচি—কলকাতা থেকে আসবার সময়জাপানী বোমার ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়নরত জনতার ভিড়ের মধ্যে অতি কষ্টে ইন্টার ক্লাসেএকটু জায়গা করে নিলাম। প্রথমটা মনে হয়েছিল জায়গা পাব না— সেকেন্ড ক্লাসের টিকিটকাটব।

অনেক পরে মেস্ ছেড়ে দিলুম এবার। রাত্রে আমার এক ছাত্র এসে মেসেই শুয়েরইল—শেষরাত্রে উঠে ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারের মধ্যেই দু'খানা রিক্শা করে ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছানো গেল। ১৯২৩ সালে কলকাতায় মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে ঢুকেছিলাম—সেই থেকে ওই একই মেসে, একই অঞ্চলে কাটিয়েচি। কতকাল পরে মেসেরজীবন ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম। বহুদিনের পুরোনো কাগজপত্র বিক্রি করে ফেললাম। বোঝাবাড়িয়ে লাভ কি! পুরোনো কাগজপত্রের ওপর মায়াবশতই তাদের এতদিন ছাড়তে পারিনি—আজ জাপানী বোমার হিড়িকে যে সেগুলো ছেড়ে এলুম তা নয়—আনবার জায়গা নেই—এনে ঘাটশিলায় এই ছোট বাড়িতে রাখি কোথায় ?

রোজ সকালে শালবনে এসে বসে লেখাপড়া করি। মিতেরা এখানে ছিল, ভয় পেয়েচলে গিয়েচে। দিব্যি জ্যোৎস্না উঠেচে, দিগন্তনীল শৈলশ্রেণী ও প্রান্তরে অপূর্ব শোভা। এই সবপরিপূর্ণ অবকাশের মধ্যে দিয়ে চমৎকার ভাবে উপভোগ করি—অবশ্য অবকাশের সময় এখনো ঠিক আসেনি—কারণ, এ সময় তো বড়দিনের ছুটি আছেই—চাকরি যে ছেড়ে দিয়েচি—সেজ্ঞানটা এখনো এসে পৌঁছোয়নি মনে। ওপর জাপানী বোমার ভয়। মৌভাণ্ডারে কারখানাকাছে—সবাই বলচে, এখানে বোমা না পড়ে যায়!

অনেকদিন পরে আমার রিপন কলেজের সহপাঠী বন্ধু কল্যাণের সঙ্গে সেদিন দেখা হল নদীর ধারে স্বামীজীর আশ্রমে। তাকে বাড়ি নিয়ে এসে চা খাইয়ে দিলাম। তার পরদিন বিকেলে ওকে নিয়ে বেড়িয়ে এলাম 'বিজয় কুটির' পর্যন্ত ওনুটুর ডাক্তারখানা।

দেশে এসে বহুদিন পরে বারাকপুরে বাড়ি সারিয়ে বাস করচি। বৈশাখ মাসের প্রথমে এখানে এলুম—এর আগে চালকীতে ছিলাম। বেশ লাগচে—গোপালনগরের স্কুলে মাস্টারি করি। রোজ মর্নিং স্কুল থেকে ফিরে নদীতে স্নান করে আসি। বেশ লাগে।

আজ সকালে প্রায় দু'মাস পরে এই ডায়েরি লিখচি। ক'দিন খুব বর্ষা গেল—আজপরিষ্কার আকাশে ঝলমলে রোদ। আকাশের কি অপূর্ব নীল রং! আমি রোয়াকের ঠেস্বেঞ্চিটাতে বসে লিখচি। সবুজ গাছপালার ডালের ওপরে অয়স্কান্ত মণিরমতো উজ্জ্বল নীলআকাশ। আজ 'অনুবর্তন' বইখানা লেখা শেষ করে কপি পাঠিয়ে দিলাম।

গত গ্রীষ্মের ছুটিতে ঘাটশিলায় গিয়েছিলাম দিন দশ-বারো। রোজ ফুলডুংরিতে বেড়াতে যেতুম। একদিন শালবনের মধ্যেও বেড়াতে গিয়েছিলাম। সুবোধবাবু একদিন এসে রাখামাইনস পর্যন্ত নিয়ে গেল।—সুবর্ণরেখা পার হয়ে ধনঝরি পাহাড়ের দিকে চোখ রেখে বসলুম, কি অদ্ভুতশোভা! হেঁটে গালুডি এলুম, প্রোফেসার বিশ্বাসের বাড়ি খেয়ে চলে এলুম বাড়ি।

বারাকপুরে কল্যাণী ও আমি রোজ নদীর ঘাটে নাইতে যাই দু'বেলা। ওপারে মাধবপুরেরচরের দৃশ্য বড় সুন্দর। অস্তদিগন্তের নানা রঙে রঙিন মেঘস্তূপ ভরা আকাশ যখন মাধবপুরের চরের ওপর ঝুঁকে থাকে, তখন সত্যই অদ্ভুত শোভা হয়।

এ সময় এখানে আর এক দৃশ্য। বিলবিলের জলে সকালে ন'দিদি কাপড় কাচছে, খয়েরখাগী গাছের কাঁটাল পাড়া হচ্চে খুড়িমাদের, সাদা সাদা তেলাকুচো ফুল ফুটেচে খুকুদের লেবু গাছটায়, আমার ঠেস্ বেঞ্চির পাশে—বেশ পরিচিত দৃশ্য। তবে এ সময় আষাঢ় মাসের২১শে পর্যন্ত কখনো বারাকপুরে আসিনি। ৭/৮ই আষাঢ় চলে যাই ফি-বছর। ১৯২৮ সালেকেবল ছিলাম—তারপর আর থাকিনি। যে বছর বোর্ডিংয়ে যাই, তার আগের বছর ছিলাম। বারাকপুরে বর্ষা-দিন যাপনের সৌভাগ্য এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কখনো হয়নি।

গৌরীর কথা কাল রাত্রে মনে পড়ল। কল্যাণীর কাছে গৌরীর কথা বল্লুম। এই সময়আমরা কি করতাম, কাল ছিল সেই দিন, যেদিন বহুকাল আগে আমি মাঝের গাঁ থেকে হেঁটে এসেছিলুম, গৌরীকে প্রথম নিয়ে এসেছিলুম এই গাঁয়ে।

কল্যাণীকে কোলাঘাটে নিয়ে যাব সামনের শনিবারে। ও এখন চার-পাঁচ মাস সেখানেথাকবে।

অনেকদিন পরে আকাঙ্ক্ষিত বারাকপুরের জীবনকে আবার ফিরিয়ে পেয়েচি। বাল্যদিনের পরে এই আবার। এখানে সংসার করচি বহু দিন পরে। নতুন সংসার নতুন ঘরকন্না। এই চেয়ে এসেছিলুম বহুদিন থেকে। এখন আমি জীবনে দর্শক মাত্র নই, জনৈক অভিনেতাওবটে।

ওগো সখি, ওগো মোর প্রিয়া, তব স্মৃতিখানি

মধুমাখা আঁকা রবে মম হৃদিতলে।

চিরদিন। বহু প্রীতি ভালবাসা দিয়ে

এ জীবনে রাঙাইলে স্বপ্নমাধুরিমা,

ভুলিবার নহে যাহা কভু। নিশীথের মর্মর

বাতাসে, অবিশ্রান্ত বিহগ-কূজনসনে—

কত নিশা, কত জ্যোছনা-যামিনী,

শরতের শান্ত সন্ধ্যা—পউষের স্বর্ণরাঙা মধুর বৈকাল

আমারে হেরিয়া প্রীতিপূর্ণ হাসিমাখা ডাগর নয়নে

সিঞ্চিয়াছ স্বর্গের অমৃত। কত ঢিল

ফেলা অতর্কিতে মোর ঘরে, কিশোরীর

কত চঞ্চলতা মাঝে মন মম

ঘুরিয়া ফিরিবে। বকুলের তলে কত গল্প

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে। যবে ঘাট

থেকে সিক্তদেহে, আসিতে উঠিয়া—

আমি কত ছল করি লোভাতুর

দৃষ্টি মেলে রহিতাম চাহি—

বলিতাম—বড় ভাল দেখি তোরে স্নানার্দ্র বসনে।

তুমি হেসে শাসনের ছলে তর্জনী

তুলিয়া চলে যেতে দ্রুতপদে। সিক্ত
চরণের দুটি চিহ্ন বহু যুগ ধরি
আঁকা রবে সে ঘাটের মৃত্তিকার পথে।